১৩১৩ সালের "কোহিনুর" পত্রের

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
বৈশাখ, ১৩১৩।

কোহিনূর।

আবাহন।

নববর্ষ!

এস, এস ধীরে আজ!

ধীরে, ধীরে—সাধকের সুপ্ত চিতে জাগাইয়া প্রাণ
এস তুমি নববর্ষ জয়ে-গর্ব্বে অরুণায়মান!
তোমার তরুণ রশ্মি পুণ্যদীপ্ত পূত স্বর্ণ শিখা—
এ আলোকে লোক ভালে চিরোজ্জ্বল দাও ললাটিকা।
তবালোকে অবগাহি' ললাটে লইয়া জ্যোতিরাজ
হ'ক সিদ্ধ, হ'ক পূর্ণ, হ'ক পুণ্য শতধন্য সাধকের কাজ!

এস; এস তুমি সুধীর চরণ!—

পুরাতন দিয়ে গেছে হর্ষ আশা চির অবিলীন,
তুমি দাও নবালোকে উজলিয়া উদ্যম নবীন।
তোমার নূতন রাজ্যে হ'ক সব হ'ক সত্য, হ'ক কর্ম্মময়;
চিতে চিতে দাও শক্তি, দাও বল, সংযম, অভয়।
নিষ্কলঙ্ক হ'ক প্রেম, হ'ক হেম ভ্রাতৃসম্মিলন;—
উদগ্র সাধনে হ'ক তব মাঝে ব্রত উদ্‌যাপন।
তব পূজা, বর্ষরাজ! হ'ক রক্তে অথবা চন্দনে—
সুমহা বিজয়ে, কিংবা উল্লসিত শত প্রাণদানে।
মহানন্দ মৃত্যু যাচি' জয়কারে তব আবাহন
হ'ক হ'ক,—নববর্ষ, এস, এস সুধীরচরণ!

দ্রুত, দ্রুত তুমি এস বর্ষমণি !
মায়ের রোদন ধ্বনি ক্ষীণ হ'তে ক্রমে ক্ষীণতর—
একি তব সুপ্রভাত ! একি তব আশা অগোচর !
তুমি ধন্য—শত ধন্য ! তোমা হ'তে ভুবনে আবার
কৌমুদী উঠিবে হাসি',—অপগত অমার আঁধার !
এস, এস,—ওই শোন, জননীর বীণে সপ্তস্বর
আজি যেন ঝঙ্কারিয়া গ্রামে গ্রামে ছুটিতেছে দূর !
একি ভাগ্য !-হ'ক হ'ক তবাগমে পূর্ণ উদ্‌যাপিত
বিগতের মহাব্রত, হও তুমি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।
তব রাজ্যে তব নামে দশ দিকে হ'ক জয়ধ্বনি—
এস, এস, জননীরে নম তুমি পূত বর্ষমণি !
এস, এস তুমি বর্ষ সঞ্জীবন !
প্রাচীনের লুপ্ত জীর্ণ কোটি কোটি অগণ্য কঙ্কাল
জাগুক অমৃত-সিক্ত তবস্পর্শে ছিঁড়ি' মৃত্যুজাল !
ভাবী-ভূত-বর্ত্তমান সকলেরে এক কেন্দ্র করি'
ধর দণ্ড, মহানৃপ ! তুমি আজি তাহার উপরি।
কোটি কোটি যুগান্তরে কোটি যুগে জাগাইয়া তুলি'
অপূর্ব্ব বিরাট যুগ বিশ্ববুকে তুমি লহ খুলি'।
তব রাজ্যে মৃত্যু হ'ক মহানন্দ অমর জীবন ;
জয় হোক—বিশ্বোজ্জ্বলা জননীর সুমহা-অর্চ্চন !
বোধন অক্ষয় হ'ক, বিসর্জ্জন অর্জ্জন-নিদান ;
মায়ের বন্দনাগীতি হ'ক তব বিজয়-নিশান।
অতুল মুকুট তব মহাদীপ্ত মহামণিচূড়—
কোটি মৃত-অমরেতে সে কীরিটে কোটি কোহিনুর !
কর্ম্মান্বিত কোটি প্রাণ—নৃপ ! তব নক্ষত্র-ভূষণ,—
সূর্য্য-চন্দ্ররূপে তুমি এস, এস বর্ষ সঞ্জীবন !!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

আত্ম-নিবেদন।

পরম করুণাময়ের অপার করুণায় 'কোহিনুরে'র আর একটি বৎসর অগাধ কাল-সাগরের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে! এত আধি-ব্যাধি-দুঃখ-দুর্দ্দৈবের দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া 'কোহিনুর' আজ ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৭ম বর্ষের দ্বারদেশে সমুপস্থিত! দুর্ব্বলপ্রাণ 'কোহিনুর' উদ্দিষ্ট পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে কি না, জানি না; কিন্তু বিধাতার কৃপা বলে 'কোহিনুর' যে আজ অন্ততঃ আপন গন্তব্যের অভিমুখীও হইতে পারিয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয়। যাঁহার অসীম করুণায় এই চরাচর জগৎ নিয়ন্ত্রিত,—গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে সতত নিরত এবং যাঁহার অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া দীনাতিদীন 'কোহিনুর' আজ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, 'কোহিনুর' আজও তাঁহারই ইচ্ছার উপর আত্ম সমর্পণ করিয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার পথ সম্পূর্ণরূপে কণ্টক বিমুক্ত হউক।

উত্থানের পর পতন, পতনের পর উত্থান,—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আমাদের 'কোহিনুর' পুনঃপুনঃ উত্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ পতিত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি ইহাতে যে তাহার আত্মমর্য্যাদার হানি হইয়াছে, আমরা সেরূপ মনে করি না। 'কোহিনুরে'র সুপরিচালন পক্ষে আমরা যত্নের ত্রুটী করি নাই; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য সাধন কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তার হস্তেই নিহিত রহিয়াছে। যে মৃত্তিকায় আছাড় খাইয়া পড়ি, সেই মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়াই আমরা পুনরায় উঠিয়া থাকি। আশা করি, 'কোহিনুরে'রও সেইরূপ চেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে সকল পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল ঘটনা পুঞ্জের ভিতর দিয়া 'কোহিনুর'কে এই পর্য্যন্ত আপন পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, তাহাদের নিষ্ঠুর কবলে পতিত হইলে বঙ্গের যে কোন সাহিত্য তরণীই বানচাল হইতে পারিত। নানাবিধ দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আমরা গত বৎসর প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিতে সক্ষম

হই নাই। একে ত দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অসাধ্য, তদুপরি মফঃস্বল হইতে পত্রিকা প্রচার করাও সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান বর্ষে আমরা জনৈক সহযোগী সম্পাদকের সহায়তা গ্রহণ করিব, স্থির হইয়া গিয়াছে। আশা করি অবস্থা বুঝিয়া সকলে আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। 'কোহিনূরে'র প্রতি অনুগ্রাহক-গ্রাহক, পাঠক ও লেখকবৃন্দের পূর্ব্ববৎ স্নেহদৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া আমরা পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

সমাজ-নীতি।

সমাজ-নীতি অতি জটিল বিজ্ঞান শাস্ত্র। সমাজ-বিজ্ঞান নামে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্র গঠিত হইতে পারে কি না, ইহা এখন পর্য্যন্ত অতর্কিতরূপে মীমাংসিত হয় নাই। আমরা যে কোন বিষয় চিন্তা করি, যে কোন কার্য্য করি, তৎসমস্তই যে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন ও সীমাবদ্ধ, ইহা গর্ব্বিত মানব সহজে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। মানব স্বাধীন, মানবের মন ও ইচ্ছা স্বাধীন ; সুতরাং মানব যখন যাহা ইচ্ছা মনে করিবেন, তাহাতে আবার পরাধীনতা কি ? মানবাত্মা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, পরমাত্মার অনুরূপ অংশ বিশেষ অথবা প্রতিবিম্ব মাত্র ; সুতরাং মানবের ইচ্ছা, মানবের কার্য্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইতে পারে না। এই প্রকার যুক্তি বলে অনেক দার্শনিকগণ মানবের জীবনগতিকে অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তির অধীন স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা দার্শনিক কূটতর্কের মধ্যে না যাইয়া সমাজ-বিজ্ঞানের সাধারণ স্বীকার্য্য স্থূল নীতিগুলির আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আদিম অবস্থা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অনেকেই বলিবেন যে, আদিতে এক অসীম অনন্ত পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না, জীবজন্তু ছিল না, নামরূপ কিছুই ছিল না ; অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসীমকে সসীম করা যায়, অনন্তকে সান্ত করা যায়, অনামিককে নামী করা যায়, অরূপকে রূপবান্ করা যায়, অচিন্ত্যকে চিন্তাধিগম্য কর

যায়, এরূপ কোন মায়া বা প্রকৃতি ছিল না। মায়া কি? (মীয়তে পরব্রহ্ম অনয়া ইতি মায়া)। যদ্দ্বারা সচ্চিদানন্দকে পরিমিত করা যায়। মায়া কোথা হইতে আসিলেন? মায়া বা প্রকৃতি পরব্রহ্মেই লীন ছিলেন। পরব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করিবার মনন করিলেন, তখন আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলেন। যৎপরিমিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, পরব্রহ্ম সেই পরিমিত প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া সৃষ্টিবীজ নিধান করিলেন। যে প্রকৃতিতে এই সৃষ্টিবীজ নিহিত হইল, সেই প্রকৃতিই সৃষ্টির তন্মাত্র (তস্য মাত্রা) হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। চক্ষু বহুদূরের পদার্থ দর্শন করিতে পারে না, কর্ণ বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, এইরূপ। এই স্থানেই অনন্ত ও অসীম-স্বাধীনতা ফুরাইল। তারপর? তারপর এই যে, পরমাত্মার সৎ-চিৎ-আনন্দ (সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী; অথবা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ) এই তিন গুণ প্রকৃতির গুণের সহিত মিলিত হইলেন,—অশেষ প্রকারে মিলিলেন। প্রকৃতি সতীর কি গুণ আছে? প্রকৃতিরও তিনটি গুণ আছে,—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং সত্ব-রজঃ-তমঃ অশেষ প্রকারে গুণের পরিমাণ ও তারতম্য অনুসারে পরস্পরের সহিত লীলাসাগরে সম্মিলিত হওয়ায় এই সৃষ্টি বৈচিত্র্য সংঘটিত হইল। ইহাই আত্মা ও প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রাসলীলা ও নিত্যলীলা। কিন্তু এই সৃষ্টির ব্যাপারে যতই বিচিত্রতা থাকুক না কেন, "তন্মাত্রের" বাহিরে ইহা যাইতে পারে না। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা খণ্ডিতও হইয়া থাকে।

এই সৃষ্টিরহস্যই নানা দার্শনিক, নানা কবি, নানা বিজ্ঞানবিদ্ নানা আকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আত্মা ও প্রকৃতির পূর্ণমিলনই সৃষ্টির পূর্ণতা। সেই পূর্ণতার অভিমুখেই আমরা প্রধাবিত হইতেছি। যখন পূর্ণ ভালবাসা হয়, তখন নায়ক ও নায়িকার স্ব স্ব অস্তিত্বের জ্ঞান থাকে না। তখন একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশিয়া যায়। প্রকৃতিকে আত্মাময়ী করিতে হইলে, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণময়ী (সেই তাহার আত্মা এই অর্থে 'ময়ট্') করিতে হইলে, উভয়কে সমভাবাপন্ন করিতে হইবে। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ন্যায়বান্, জ্ঞানবান্, সত্যস্বরূপ, আনন্দময় ও আনন্দদাতা। প্রকৃতিও যখন এইরূপ ঈশ্বরকে পূর্ণালিঙ্গন করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছেন, তখন মানবের জীবন গতি, সমাজের গতি, ন্যায়, জ্ঞান, সত্য ও বিশ্বপ্রেমের অভিমুখেই প্রধাবিত হইতেছে। এই গতি সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দ্বারা সাধিত হইতেছে,

কোথায়ও ভাঙ্গিতেছে, কোথায়ও বা সুন্দরতররূপে নূতন গড়ন হইতেছে। এই মিলন, এই প্রেম ভাঙ্গা গড়া সখীদেরই কার্য্য। সখীরা পুরাতন প্রেম ভালবাসেন না, তাহাতেই পুরাতন প্রেম ভাঙ্গিয়া নূতন প্রেম গড়িয়া থাকেন;—রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া মিলন করাইয়া থাকেন। তমোগুণের কার্য্য না থাকিলে রজোগুণের কার্য্য থাকিত না; মৃত্যু না থাকিলে সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিত না। এইবার নিকটে আসিয়াছি! সমাজের গতি ন্যায় ও সত্যের দিকে, জগতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপনের দিকে প্রধাবিত। যেমন লোহকে পুনঃ পুনঃ পোড়াইয়া তাহাতে চুম্বক শক্তি জন্মাইতে হয়, সেইরূপ সমাজকেও পুনঃ পুনঃ তমোগুণ প্রভাবে ধ্বংস করিয়া রজোগুণ প্রভাবে বর্দ্ধিত করিতে হয়। এইরূপে সমাজপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে,—সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ হইলে,—প্রকৃতি পুরুষের পূর্ণমিলন হয়। মানব জগৎ ও এই জগতের জীবজন্তু এখনও অসম্পূর্ণ। পৃথিবী অপেক্ষা শুক্রগ্রহে অনেক উন্নত মানব ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্ আছে। তত্ত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন, গোধুম শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকা শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। মধুমক্ষিকার ও পিপীলিকার সমাজবন্ধন এবং সমাজের সুশৃঙ্খলতা এত উন্নত যে, তাহা মানবগণের অনুকরণীয়। ইহা দ্বারাও দেখা যায় যে উৎকৃষ্ট সমাজবন্ধন প্রণালী যথেচ্ছাচারের উপর সংস্থাপিত নহে। সমাজের উন্নতি ও অবনতি আছে এবং এই উন্নতি ও অবনতি নির্দ্দিষ্ট কাল, দেশ ও নিয়মের উপর নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিকদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কেহ ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধান করেন; কেহ বিভিন্ন ঘটনাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিজ্ঞানের মত অনুসারে তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন; কেহ বিভিন্ন যুগের বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস সংগ্রহ করেন; কেহ বা মানসিক চিন্তার ক্রম এবং গবেষণার উপযুক্ত পন্থা নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হয়েন। যে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে না এবং যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী হইতে গণিত বিদ্যার সুদৃঢ় যুক্তি বলে নিরূপিত হয় না, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। বিজ্ঞানের উপাসকদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে একভাগ বৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করেন এবং অপর ভাগ তাহা হইতে ফল ও নিয়ম, তর্ক ও বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কৃত করেন। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই বিভাগ প্রযোজ্য। ইহার মধ্যে এক

বিভাগ ঐতিহাসিক ও অপর বিভাগ সমাজের নিয়ম আবিষ্কারকারী দার্শনিক। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নযুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানব সমাজের শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী, ধর্ম্মাচরণ ও উপাসনা, বিবাহ, জন্মমৃত্যু, এবং চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করেন; দার্শনিকগণ তাহার ফল ও নিয়ম অনুসন্ধান করেন।

নিয়ম কাহাকে বলে? দুই বিভিন্ন ঘটনার অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী সংঘটন,—যাহার বলে এক ঘটনা অপর ঘটনার উপর নির্ভর করে, এই অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধের নামই নিয়ম। মানবগণ মাত্র এই সম্বন্ধকে দেখিতে, শুনিতে ও অনুভব করিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে চিৎ (আত্মা) ও অচিৎ (জড় প্রকৃতি) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু প্রকৃতির সহযোগ ভিন্ন বিশুদ্ধ আত্মা, কিম্বা আত্মার সহযোগ ভিন্ন বিশুদ্ধ জড়ের অস্তিত্ব সম্ভবে না। আত্মা ও জড় পরস্পরের সহিত মেশামিশিভাবে (বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ জগতঃ পিতরৌ পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ) থাকেন। এই যে আত্মা ও জড়ের সম্বন্ধ, ইহাই তৃতীয় তত্ত্ব।

দুই ঘটনার যে অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ, তাহাই বিজ্ঞানের জন্মদাতা। দুই ঘটনা একত্র সংঘটিত হয় এবং একটি অপরটির সংঘটনের উপর নির্ভর করে। ইহার নাম অন্বয় ব্যতিরেক অর্থাৎ একের সত্তাতে অপরের সত্তা; একের অসত্তাতে অপরের অসত্তা। বিজ্ঞানের শিষ্য প্রথমে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও ব্যক্তি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তৎপর তিনি এক ঘটনার বা ব্যক্তির সহিত অপরের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। অবশেষে তিনি দুই ঘটনার অপরিবর্ত্তনীয় অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নিরূপিত করেন। এই সম্বন্ধ তিনপ্রকারে নির্ণীত হইয়া থাকে,—(১) বাহ্য বস্তুর পরস্পরের সহিত (২) মানব প্রকৃতির পরস্পরের সহিত (৩) বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ।

আদিম অবস্থায় প্রথমে মানবগণ প্রত্যেক ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন দেবপুরুষ কর্ত্তৃক সংঘটিত হওয়া মনে করিত; পরে প্রত্যেক ঘটনা বিভিন্ন শক্তি কর্ত্তৃক সংঘটিত হওয়া মনে করিত; পরে একই শক্তিকর্ত্তৃক সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়া নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। মানবের এই উন্নতিক্রমকে ইউরোপীয় দার্শনিক মতে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা,—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব (দৈবশক্তিতে বিশ্বাসের যুগ), দার্শনিক যুগ, এবং বৈজ্ঞানিক যুগ। এখানেই বলিয়া রাখা উচিত যে, হিন্দুদিগের কালবিভাগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও

কলিযুগ) সহিত এই বিভাগের কোন ঐক্য নাই। আর্য্যজাতির মধ্যেই প্রথমে এই যুগ বিভাগ হয়। তখন আর্য্যজাতি সভ্যতার চরমসীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসও বলেন যে, আর্য্যজাতি—পঞ্চম জাতীয় সভ্যশ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে প্রথম শাখা হিন্দুস্থানবাসী হিন্দু আর্য্যজাতি।

এক্ষণে দেখা যাউক, সমাজ-বিজ্ঞান কিরূপে গঠিত হইতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানের বিষয় মানবগণের প্রবৃত্তি ও কার্য্য। মানব প্রকৃতি যে যে নিয়মে পরিচালিত হয়, মানবের প্রবৃত্তি ও কার্য্যও সেই সেই নিয়মে পরিচালিত হয়। মানবের কার্য্যাবলী ও অবস্থাসমূহ যে ফল প্রসব করে, তাহাই সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়। এইরূপ বহু ঘটনা ও বিষয় হইতে যে সত্য আবিষ্কৃত হয়, তাহাই সামাজিক বৈজ্ঞানিক সত্য। মানব কোন সমাজে থাকিয়া যেরূপ আচরণ করে, তাহা নিজের (ব্যক্তিবিশেষের) প্রকৃতির ফল-মাত্র। সুতরাং কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, মানব-প্রকৃতির সাধারণ সত্য আবিষ্কার করিতে পারিলেই মানবের সামাজিক বিজ্ঞানের সাধারণ সত্য আবিষ্কার করা হইল। মানব-সমাজের ইতিহাস ঐ সকল সাধারণ সত্যের পরীক্ষার স্থল মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মানব প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হইতে মানবের আদিম অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন কোন উপসংহারে উপনীত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কোন দেশের কোন মানব সমাজেরই আদিম অবস্থার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিরূপে বন্য অবস্থা হইতে, অসভ্য অবস্থা হইতে মানব সভ্য সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন করিতেছেন, তাহার আদিম ইতিহাস সুদুর্ল্লভ। আমরা যতই আদিম অবস্থার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না কেন, আমরা সমাজের বাহিরে কোন মানবমণ্ডলীকে দেখিতে পাই না। আদিতেও মানবসমাজই দেখি, এখনও মানব-সমাজই দেখিতে পাই। শুধু মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ গঠিত হইতে পারে না। অনেকের মত এই যে, সমাজ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হই-তেছে এবং গতকালের একত্রীভূত সামাজিক বহুদর্শিতা ও শক্তি বর্ত্তমান সমাজের উপর কার্য্য করিতেছে, বর্ত্তমান সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, পদে পদে শাসন করিতেছে। এই যে মানবগণ দেখিতেছেন, যাঁহাদের প্রকৃ-তির সাধারণ নিয়মের উপর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নির্ভর করে, তাঁহারাও অভিনব সৃষ্ট মানুষ নহেন বা অশরীরী মানুষী শক্তি নহেন; তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মাত্র, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজের সন্ততি মাত্র। এইরূপ অবস্থায় সমাজ-বিজ্ঞান গঠন

করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে ইতিহাসও বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিতে পারে না। কারণ, এক সমাজের মানবপ্রকৃতি অন্য যুগের অন্য সমাজের মানবপ্রকৃতির তুল্য নহে; সুতরাং এক সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত অপর সমাজের পরিবর্ত্তনের অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপর বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে নির্ভর করিতেছে। এতদ্বারা আশা করা যায় যে, সমাজ-বিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল বিজ্ঞান হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে।

এইস্থানে বর্ত্তমান্ সময়ের হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ কর্ত্তা-দিগের নিকট আমি একটি বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি। মিসেস্ য়্যানী বেসান্ত্ বলিতেছেন, বিদেশীয় ইতিহাস পাঠ না করাইয়া দেশীয় ইতিহাস পাঠ করাও। হিন্দুস্থানের পঠিতব্য ইতিহাস এপর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। * ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিভিন্নযুগের ঐতিহাসিক ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ ও সম্পর্ক স্পষ্ট দেখা যাইতে পারে, ভারতীয় ইতিহাসে তাহা হইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীজানকীনাথ পাল।

ভারতীয় পারস্য কবিগণ।

বর্ত্তমানকালে ইংরাজী আমাদের রাজ ভাষা; কাজেই আফিস-আদালতে, হাটে ঘাটে, পথে বাজারে সর্ব্বত্রই সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ইংরাজীর ন্যূনাধিক আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল সমাজের লোকের মুখেই এখন কথায় কথায় ইংরাজী বকুনী শ্রুতিগোচর হয়;

* জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন:—"If the facts of history, empirically considered, had not given rise to any generalizations, a deductive study of history could never have reached higher than more or less plausible, conjecture. By good fortune (for the case might easily have been otherwise), the history of our species, looked at as a comprehensive whole, does exhibit a determinate course a certain order, a development: though history alone cannot prove this to be a necessary law, as distinguished from a temporary accident."

কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যখন ভারতের গৌরবান্বিত সিংহাসনে প্রবল-প্রতাপান্বিত বিচক্ষণ মুসলমান নরপতিগণ সমাসীন ছিলেন, তখন ভারতের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি-নীতি অন্যরূপ ছিল। তখন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, সকলের মুখেই কথায় কথায়, সর্ব্ব কার্য্যে ও আফিস আদালতে পারসী ভাষার প্রচলন ছিল। তখন পারসী ভাষায় সম্পূর্ণ কাজকর্ম্ম সম্পাদিত হইত। তখন ভারতে বড় বড় প্রতিভাশালী কবিগণ স্ব স্ব বীণার ঝঙ্কারে সমগ্র এসিয়া এবং ইউরোপবাসী সুধী-মণ্ডলীকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক অদূরদর্শী হিন্দু-লেখক সহসাই বলিয়া থাকেন যে, "ভারতীয় মুসলমান-রাজ্যে যদিও পারস্য ভাষার প্রচলন ছিল, তথাপি ভারতীয় মুসলমানগণ পারস্য ভাষায় ততোধিক জ্ঞানলাভ করিতে এবং কেহই কবির আসনে সমাসীন হইতে সক্ষম হন নাই। মুসলমানের মধ্যে প্রতিভাশালী কবিগণ পারস্য দেশেই জন্মগ্রহণ কলিয়াছিলেন।" আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সমস্ত অদূরদর্শী লেখকগণের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিব যে, ভারতবাসী মুসলমানগণ পারস্য ভাষায় কত জ্ঞানলাভ ও তাহার কত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় মুসলমান পারস্য কবিগণ দিগ্ দিগন্তরে স্বীয় প্রতিভা-কিরণ কিরূপ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন।

ভারতের প্রধান ও প্রথম কবি আমির খসরু। ইঁহার পিতার নাম আমির সয়েফ উদ্দীন। এই কবিকুল-চূড়ামণি দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পাটিয়ালা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটিলে তদীয় মাতামহ তখন পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে লালনপালন ও উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান করেন। খসরু স্বীয় অধ্যবসায়-গুণে শীঘ্রই উচ্চ শিক্ষা-সোপানে আরোহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি হজরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমির খসরু দিল্লীর সম্রাড়্গণের সহবাসে ও মোসাহেবী পদে থাকিয়াই জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে দিল্লীর সাতজন নরপতির সহবাস লাভ ঘটিয়াছিল। আমির খসরু নিরানব্বই খানি অতি উচ্চ শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। খণ্ডকাব্য এবং সন্দর্ভ যে আরও কত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। পারস্য, আরব, মিশর ও ভারতবাসী যত কবিই আছেন, কেহই খসরুর ন্যায় সর্ব্বরসে রসাল কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। খসরুর রচনা-ঝঙ্কারের রসময় ভাবে পারস্য

ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রকেই বিমোহিত হইতে হয়। প্রাণ যেন উল্লাসে ভরিয়া যায়! সে মোহ—সে উল্লাসও ক্ষণস্থায়ী নহে। খসরুর প্রত্যেক কবিতার ভাব অতি উচ্চ। তাঁহার কোন একখানি গ্রন্থ বা কোন একটি কবিতা একবার বা দুইবার পাঠ করিলে 'পিয়াস' মিটে না; স্বতঃই বার বার পাঠে ইচ্ছা হয়। এমন কি, আজীবন খসরুর কবিতাগুলি জপমালায় গাঁথিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়!

খসরু একবার মহা ভাবুক কবি মহর্ষি বু-আলি কলন্দরের সাক্ষাৎ মানসে গিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি, খসরুকে একটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া কবিতা রচনা করিতে বলেন। খসরু তৎক্ষণাৎ ঐ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়াই ঐ বিষয়ের সুন্দর ভাবযুক্ত কবিতা রচনা করেন। তাহাতে মহর্ষি বু-আলি কলন্দর সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, —"খসরু! তুমি একটি অত্যুজ্জ্বল হীরক বিশেষ। খোদাতালা তোমাকে সুখে রাখুন ও দীর্ঘজীবী করুন।"

আমাদের আমির খসরু কোন্ শ্রেণীর কবি ছিলেন,—তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনাটি পাঠ করিলেই পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন। একদা সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ মহাকবি সাদী সিরাজীকে তাঁহার রাজধানীতে শুভাগমন করিবার নিমিত্ত দুইবার আহ্বান করিয়া পাঠান। ঐ সময় আমির খসরু সুলতান মোহাম্মদ বা খান সহিদের মোসাহেব ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই সুলতানই আমির খসরুর রচিত কয়েকটি কবিতা মহাকবি সাদীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সাদী খান সহিদের পত্রোত্তরে বার্দ্ধক্যের আপত্তি করেন এবং লিখেন যে, "আমার আর এখন বিদেশ গমনের সময় নাই। আপনার দরবারে আমির খসরু আছেন। তাঁহাকে উপযুক্ত যত্ন করিবেন। খসরু আমা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন। আমির খসরু একটি অমূল্য মণি-বিশেষ।" খসরু একজন মহা-প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "মালেকশ্‌শোরা" (কবিসম্রাট) ও "সোলতানে সোখন্" (বাক্‌সম্রাট) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ভারতের দ্বিতীয় কবি মওলানা উরফী,—যাঁহার কবিত্ব-রসে মুগ্ধ হইয়া এক সময়ে মহামতি সম্রাট আকবরও তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। কবিকুল-ধুরন্ধর মওলানা উরফীর রচনাগুলি সর্ব্বরসে পরিপূর্ণ। আবার স্থানে স্থানে তাঁহার কবিতার ভাব এতই উচ্চ যে,বড় বড় পণ্ডিতগণেরও

মস্তক ঘুরিয়া যায়! "কাছায়েদে উরফী" নামক পারসী কাব্যখানি তাঁহার প্রমাণস্থল। সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান খানান আবদুর রহিম খান মওলানা উরফীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মওলানা উরফী তাঁহার জীবনে ২৬ খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ৯৯৯ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আগ্রা সহরে মহাত্মা উরফীর সমাধি বর্ত্তমান আছে এবং আজও তাহাতে বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

ভারতের তৃতীয় কবি মহর্ষি বু-আলি কলন্দর। ইনি একজন অতি ক্ষমতাশালী তাপস ছিলেন। পানিপথ তাঁহার বাসস্থান। এই সংসার বিরাগী তাপস-প্রবরও পারস্য ভাষায় অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সমস্ত রচনাগুলিই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ ও ঐশিক প্রেমের জ্বলন্ত চিত্র। ইঁহার কবিতার ভাব গ্রহণে অনেক পারস্য কবিকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। এই তাপসকবি ৭২৪ হিজরীতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। পানিপথে তাঁহার পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান আছে।

ভারতের চতুর্থ কবি হজরত শেখ নিজাম উদ্দীন আউলিয়া। মহাত্মা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া একজন ঐশীশক্তি বলে বলীয়ান তাপস ও ভাবুক কবি ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনে ৭খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ধর্ম্মজীবনলাভ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রথম বয়সে তিনি একজন প্রধান দস্যু ছিলেন। একদা মহা-তাপস বাবা ফরিদ কোন অরণ্য-মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে নিজাম উদ্দীন তথায় উপস্থিত হইলেন। বাবা ফরিদকে দেখিয়া নিজাম স্বীয় দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে তাপসপ্রবরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বাবা ফরিদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমাকে কেন মারিতে চাও?" নিজাম উদ্দীন উত্তর করিলেন, "দস্যুবৃত্তি আমার ব্যবসায়। পথে ঘাটে অসহায় লোক পাইলেই তাহাকে বধ করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারাই আমার এবং আমার পরিবারস্থ সকলের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।" বাবা ফরিদ বলিলেন,—"হে নিজাম! তুমি দস্যুবৃত্তি করিয়া কত অসহায় ও অনাথ পথিকের প্রাণবধ করিয়া তোমার পরিবার প্রতিপালন করিতেছ। আচ্ছা ভাল, অদ্য যাইয়া তোমার পরিবারস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, এই সমস্ত পাপের অংশী তাহারা হইবে কি না?"

নিজাম বলিলেন,—"ফকির! তুমি ত বেশ চতুর লোক দেখ্ছি! ছলে

কৌশলে বুঝি পলায়ন করিতে চাও? কিন্তু নিশ্চয় জানিও, নিজাম তোমা হইতে অনেক চতুর। শিকার পাইয়াছি, আর ছাড়িয়া দিব না।"

বাবা ফরিদ বলিলেন,—"নিজাম! যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে ঐ বৃক্ষের সহিত আমাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও, তবেই ত হইল!"

বাবা ফরিদের কথা নিজামের মনোমত হইল এবং একটি বৃক্ষের সঙ্গে বাবা ফরিদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমন করত পরিবারস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা নিজামের কৃতপাপের অংশী হইবে কি না? পরিবারস্থ সকলেই উত্তর করিল, "হে নিজাম! আমাদিগকে প্রতিপালন করা তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য, এখন তুমি পাপ কি পুণ্যবৃত্তি দ্বারা আমাদের ভরণ-পোষণ করিতেছ, তাহা আমরা জানি না। পাপ-পুণ্য যত তুমি করিতেছ, আমরা তাহার অংশী হইব কেন?"

এতচ্ছ্রবণে নিজামের মনে ভয়ানক ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাবা ফরিদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফিরিয়া আসিয়া নিজাম যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান-বিলুপ্তি ঘটিল। বাবা ফরিদকে তিনি দৃঢ়রূপে বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বন্ধনের মত বন্ধন রহিয়াছে,—বাবা ফরিদ অদূরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন! তদ্দর্শনে নিজাম উদ্দীন বাবা ফরিদকে একজন ঐশীশক্তিশালী তাপস জানিতে পারিয়া তদীয় পদে বিলুণ্ঠিত হইয়া সন্তাপিতান্তঃকরণে কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাবা ফরিদ বলিলেন,—"নিজাম, কাঁদ কেন? তোমার কি হইয়াছে?" নিজাম বলিলেন,—"হজরত! আমি যাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি ও পাপ কার্য্য করিয়াছি, কত সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়াছি, তাহারা সকলেই সুখের সাথী, পাপের সাথী কেহই নয়। এখন আমার মনে যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিতেছে, তাহা কি করিয়া জ্ঞাপন করিব? হায়! আমি কাহার জন্য এত পাপ করিয়াছি! হজরত! এখন দয়া করিয়া বলুন, কিসে আমি এই সমস্ত পাপ এবং নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি?" এই বলিয়া নিজাম বাবা ফরিদের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। নিজাম উদ্দীনের কাতর ক্রন্দনে মহাতাপস বাবা ফরিদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি নিজাম উদ্দীনকে স্বীয় শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে

আদেশ দেন। তিনি নিজাম উদ্দীনকে নিবিড় অরণ্যে একটা শুষ্ক বৃক্ষতলে বসাইয়া বলিলেন,—"নিজাম! তুমি এই স্থানে বসিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে থাক। যখন দেখিবে, এই শুষ্ক বৃক্ষ জীবিত হইয়া পত্র পল্লব ও ফল ফুলে সুসজ্জিত হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, খোদাতালা তোমার কৃতপাপ ক্ষমা করিয়া তোমাকে তাঁহার দাসত্বে গ্রহণ করিয়াছেন।" নিজামউদ্দীন গুরু-দেবের আদেশানুযায়ী দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ফল মূল ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। এবং অবশেষে একজন কুল-মহিলার সতীত্ব রক্ষা করিয়া দরবেশী প্রাপ্ত হন ও ঈশ্বরকৃপায় সর্ব্ববিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। হজরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া মহর্ষি বু-আলি কলন্দরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি প্রায়ই দিল্লীতে থাকিতেন। সোলতান আলাউদ্দীন খিলিজি ও সম্রাটের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় খিজির খান ও সাদত খান এবং কবিসম্রাট আমির খসরু তাপস-প্রবরের প্রধান ভক্তশিষ্য ছিলেন। ৭২৫ হিজরী ১৮ই রবিওল-আউওয়াল তারিখে এই তাপস-প্রবর মানবলীলা সম্বরণ করেন। দিল্লীর জামে মসজিদের সন্নিকটে তাঁহার পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

সৈয়দ নূরুল হোসেন।

বালক-চোর।

১

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলাম, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তিনি আজ দুই বৎসর ধরিয়া আমায় এরূপ অপত্য নির্ব্বি-শেষে পালন করিতে ছিলেন শেষে কি এই ঘৃণিত জঘণ্য কলঙ্কের ডালি মাথায় চাপাইয়া দিবার জন্য? ছিঃ! ছিঃ! সরলা যে আমার ভগ্নী। সে যে আমায় 'মন্মথ দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিত। আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল বলিয়াই ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইদানীং আমার পাঠে শৈথিল্য দেখিয়াছিলেন। তাহা বলিয়া কি আমি নারকী? ছিঃ! ছিঃ! কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার কথা!

কথায় বলে,—ভূত মরিয়া ওঝা হয়। সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির ও ধর্ম্ম

প্রাণ হইলেও পরেশ বাবু যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। আর তিনি এই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া ছিলেনও বিস্তর। সুতরাং ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বাপু! যে দিন থেকে তোমার ঐ সিঁথির বাহার, আর পোষাকের পারিপাট্য দেখেছিলাম, সেই দিন হতেই বুঝেছিলাম, তুমি গোল্লায় গেছ। তবে তুমি যে আমারই সর্ব্বনাশ করিতেছিলে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। উঃ! দুধ্ কলা দিয়ে কি কালসাপই পুষে ছিলাম। তোমার বাবাকে পত্র লিখেছি। আর তোমার এবাটীতে থাকা হ'বে না।"

আর একবার চেষ্টা করিলাম। কায়ক্লেশে চোখের জলও দুই এক ফোঁটা ফেলিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

আত্ম-পক্ষ সমর্থনার্থ মুখে এত কথা বলিলাম বটে, প্রাণে কিন্তু বড় বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, অবিমৃষ্য কারিতার প্রবল উন্মত্ত-আবেগের বশে কি জঘণ্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি! বাস্তবিকই দুই বৎসর কাল অপত্য নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়া পরেশ বাবু যাহা প্রতিদান পাইলেন, তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। আর তাহার উপর সেই সরলা নিরপরাধিনী বাল-বিধবার ভবিষ্যত জীবন কল্পনা করিয়া পাষণ্ড হৃদয়ে শতবৃশ্চিকের দংশন বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

যখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিবার প্রস্তাব হইতেছিল, পিতা বলিয়াছিলেন, কলিকাতা স্থান মন্দ। তোমায় একেলা ছাত্রাবাসে রাখিতে পারি না। পরেশ আমার বাল্য সহচর। তাহার বাটীতে সুখে থাকিবে। তোমায় সেই খানে পাঠাইব।

পিতার বাক্য সত্য হইয়াছিল। পরেশ বাবুর বাটীতে সুখে ছিলাম সত্য। তাঁহার ভবনে যে দিন প্রথম পদার্পণ করিলাম, তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আহা! দিব্য ছেলেটি। কেমন নধর চেহারা! কেমন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, আর রঙ্‌টি যেন কাঁচা সোনার!" তখন যদি স্বাধ্বী বুঝিতে পারিতেন, আমার এক একটি কুঞ্চিত-কুন্তল এক একটি বৃশ্চিক, তাহা হইলে ত আর আজীবন তাঁহাকে এই লক্ষ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ্য করিতে হইত না!

বলা বাহুল্য, কলিকাতায় আসিবার পর ধীরে ধীরে আমার নৈতিক অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইল। পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং পাঠাদি গুরুতর ব্যাপারে আমার তেমন

যত্ন ছিল না। প্রত্যহ নূতন নূতন বেশভূষা করিয়া বন্ধুবর্গকে হোটেলে খাওয়াইয়া ক্রমশঃ ইয়ার-মহলে বেশ পসার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া লইলাম। শেষে একটি সখের নাট্যশালায় যোগদিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এসবের কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যদি এইরূপে নরকের পথে ধীরে ধীরে একেলা চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে কোনও পরিতাপের কারণ থাকিত না। তাহা কিন্তু হইল কোথা? আমার হাত ধরিয়া চিরঅভাগিনী চম্পককলিকা সরলাও নরকের পথে অগ্রসর হইল। আমার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া বালিকা পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ে এই পাপিষ্ঠের প্রতিষ্ঠা করিল।

২

পিতার পত্রপাঠে বিস্মিত হইলাম না। জানিতাম, পিতা সুবিদ্বান সাধু-চরিত্র পুরুষ। তিনি যে একথা লিখিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"মন্মথ!

তুমি বংশের কুলাঙ্গার। তুমি অকৃতজ্ঞ পশু। পত্রপাঠমাত্র পরেশের বাটী হইতে চলিয়া যাইবে। এজন্মে আমায় মুখ দেখাইয়া আর আমার মনঃকষ্ট বাড়াইও না। তবে যদি কখনও চরিত্র সংশোধন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া মানুষের মত হইতে পার, তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিও।

তোমার পিতা—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা।"

ভাবিলাম, কি করি? কোথা যাই? অনুতাপের কালো মেঘটা প্রাণের মধ্যে বেশ জমাট বাঁধিল। মোহ বশতঃ খানিকক্ষণ কষ্ট পাইলাম। শেষে নিরাশাপ্রসূত নির্ভীকতা আসিয়া হৃদয়কে উৎসাহিত করিল। ভাবিলাম,—পুরুষ মানুষ,—ভয় কি? জগতে পাপাচরণ করে না কে? রামবাগানের আড্ডাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিব। এজীবনের মধুটুকু ত গিয়াইছে। এখন দেখি, যদি কুকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারি।

ভট্টাচার্য্য গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় কিন্তু প্রাণে একটা মস্তবড় বাসনার উদ্রেক হইল। যাহার জন্য আজ স্বজন-প্রীতি-বিরহিত হইয়া এই সুবৃহৎ সংসারার্ণবে অসহায় ভাবে ভাসিয়া যাইতেছি, একবার জনম শোধ সেই অভাগিনী হৃদয়েশ্বরীকে দেখিবার সাধ হইল। তাহার সেই সরলতা মণ্ডিত

সলজ্জ কোমল মুখ খানিই যত অনিষ্টের মূল। সাধ কিন্তু মিটিল না, সরলা গৃহে ছিল না। আপনার বিধবা কন্যাকে আসন্ন প্রসবা দেখিয়া লোক নিন্দার ভয়ে পরেশ বাবু তাহাকে এক আত্মীয়ার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

৩

বুঝিলাম, এ বিশ্বে আমি একা, যখন আড্ডাবাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট্ টানিতে টানিতে রাজপথে অসংখ্য জনমানবের সমাগম দেখিতাম, তখন ভাবিতাম, পৃথিবীতে এত নরনারী, –তবু কিন্তু আমি একা! যখন সেই আড্ডানরকের পৈশাচিক জঘন্য আমোদ-স্রোতে গা ভাসাইয়া নাচিতে নাচিতে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখনও চমক ভাঙ্গিলে ভাবিতাম, এ সকল আমোদ-প্রমোদ হাসি-ঠাট্টার ভিতর ত আমার বাস্তবিক স্থান নাই; প্রকৃতই এ বিশ্বে আমি একা। যখন পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত আমারই মত কত পুরুষপুঙ্গব আসিয়া আড্ডা-বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিত, যখন দেখিতাম, মদ গাঁজা প্রভৃতি কুবৃত্তি সকলই আমার চতুর্দ্দিকে আমায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমি কিন্তু এখনও ইহাদের ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হই নাই;—তাহাদিগকে ঘৃণা করি, তখন ভাবিতাম, কুসংসর্গে হৃদয়ে সুভাব লইয়া এখানে আমি একা। আমার এই নির্জ্জনতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চারিদিগের রং তামাসা কার্য্য কলাপ যেন অসমীচীন উদ্দেশ্য বিহীন বিদ্রূপকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহই কিন্তু ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারে নাই, কি চিন্তাপ্রবাহ সদাসর্ব্বদা আমার হৃদয় আলোড়িত করিত। তাহারা প্রায় সবাই মূর্খ। স্পর্দ্ধা করিয়া কেহ কেহ বলিত,—"বাঃ! মন্মথর কি সখ! বড় লোকের ছেলে, নিজে এণ্ট্রান্স পাশ করা, বাড়ী ঘর ছেড়ে দিয়ে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। কি স্বার্থত্যাগ বল!"

এক বিষয়ে ঘৃণিত পাপাচারী সঙ্গিগণ অনেকানেক কৃতবিদ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উদার। তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই। বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি অন্বেষণেই সকলে ব্যস্ত। আমার সঙ্গীদিগের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি পরি-লক্ষিত হইত। তাহারা জানিত, এখন অসময়ে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু আড্ডায় থাকিলে আমি তাহাদের সুখবৃদ্ধি করিতে পারিব। সুতরাং তাহারা যথাসাধ্য আমার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত।

সেদিন একটু গরম কম ছিল। আমি প্রমোদ গৃহে একা অলসভাবে

জানালা দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় শুইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর পড়িতে ছিলাম। বাহিরে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর আপন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বারান্দায় বসিয়া একটা কাক অলস ভাবে কা কা করিয়া শব্দ করিতেছিল। দূরে একটা রাজমিস্ত্রীর ইটকাটার ঠন্ ঠন্ শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেছিল। নীচের জলের কল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না; পাইপের মুখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। আমার হস্তস্থিত তালবৃন্ত এক এক বার পড়িয়া যাইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ দ্বারোদ্ঘাটিত হইল। আমার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম, রৌদ্রদগ্ধ মুখে হাসিতে হাসিতে কানাই ও নফর গৃহে প্রবেশ করিল।

আমি বলিলাম,—কিহে আজ এত বিলম্ব কেন?

কানাই বলিল, ভাই রাস্তায় এক বড় হুলস্থুল হ'য়েছে। আমাদের আড্ডাবাড়ীর কাছে গোয়ালাদের বাড়ীতে কে একটা সদ্যজাত ছেলে ফেলে দিয়ে গেছে। লোকে লোকারণ্য হয়েছে।

নফর বলিল,—বাবা! ব্যাপারটা গুরুতর। এসব বড় ঘরের বড় কথা। ছেলেটা যে বড়লোকের ঘরের, তা দেখিলেই বুঝা যায়।

কানাই বলিল—ইহার ভিতর আরও একটু রহস্য আছে। ছেলেটি যখন প্রথম পাওয়া যায়, তখন তাহার গলায় একখানি কবচ ভিন্ন অপর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কবচে কি একটা সংস্কৃত লেখা আছে।

আমি বলিলাম,—বটে! এ যে আরব্য উপন্যাসের ব্যাপার! এর ভিতর একটা কিছু জটিল রহস্য আছে, সন্দেহ নাই।

তিনজনে খুব খানিকটা হাসিঠাট্টা, সমাজের উপর শ্লেষ প্রভৃতিতে সময়াতিবাহিত করিলাম। শেষে আমারও কেমন ঔৎসুক্য জন্মিল। অলস ভাবে আবার তিনজনে মজা দেখিতে ছুটিলাম। তবু একটা কাজ পাওয়া গেল, ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা?

৪

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছিল। তখনও কাঁদিতে ছিলাম। ত্রিতাপনাশিনী পবিত্রোর্ম্মী মন্দাকিনী তীরে বসিয়া পবিত্র অনুতাপাশ্রু মোচন করিতেছিলাম। জাহ্নবী সলিলের সহিতও কত অপবিত্র বারির সংমিশ্রন ছিল। আমার অশ্রু কিন্তু বিশুদ্ধ নির্ম্মল অকৃত্রিম। ইহা সন্তপ্ত হৃদয়ের আবেগাশ্রু।

কোন্ পশুবলে সে অশ্রু সংবরণ করিব? যখন বুঝিলাম, আমারই রক্ত-

জাত শিশু নীচ শূদ্রগৃহে গলগ্রহ হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে পিতামাতার পাপের জন্য, ব্রাহ্মণজাত হইলেও সমাজে হেয়, ঘৃণিত হইয়া চিরকাল কষ্ট সহ্য করিবে, তখন অসহ্য যাতনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

কোনও উপায় ছিল না। আমার আপনারই উদরান্নের জন্য ঘৃণিত পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত অশিক্ষিত দুর্ব্বিনীত সহচরদিগের সহিত জীবন যাপন করিতেছিলাম। ভাবিলাম, গোয়ালার নিকট আপানার শিশুটিকে চাহিয়া লইলে তাহাকেই বা কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারিব? সুতরাং শিশুটির গোপগৃহে বাস নিবারণ করা অসম্ভব বুঝিলাম।

এক একবার সন্দেহ হইল, এই অজ্ঞাত কুল-শীল শিশু পুত্রটি আমার নহে। এ বিশ্বে মৎ-সদৃশ পাপী ত আরও অনেক ছিল। এ হয়ত অপর কোনও হতভাগ্যের জীবনপুত্তলি; কিন্তু সে মুখ যে আমার পরিচিত! এরূপ অনিন্দ্যসুন্দর ক্ষুদ্র বদনখানি ত সরলারই ইন্দু-আননের প্রতিকৃতি; আর তাহার উপর সেই সঙ্কেত চিহ্ন। শিশুগল-বিলম্বিত কবচ আমার বহু পরিচিত। এ কবচ আমি আমার প্রণয়িনী-কণ্ঠে কত দিন দেখিয়াছি; তাহাতে লিখিত "শুভমস্তু" শব্দ লইয়া কত বাদানুবাদ হাসি ঠাট্টা করিয়াছি! সুতরাং এই কবচ যে সরলার কণ্ঠ হইতে শিশুর গলদেশে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না।

ভাবিলাম, ধন্য জগদীশ্বরের প্রেম! যে পাষণ্ড ভ্রমেও কখন আপনার দোষগুণ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে শিখে নাই, আজ তাহার পাশবিক আত্মসুখানুসন্ধিৎসু হৃদয়টি শিশু প্রেমে ভরিয়া গেল কিরূপে?

বার বার মনে পড়িল সেই সুকুমার মূরতি। তাহার সেই অস্ফুট ক্রন্দন মারুত-হিল্লোলে অসীম ব্যোমে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার কর্ণ মাঝারে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছিল। আমার ব্যথিত হৃদয়োত্থিত করুণ-বিলাপ-গীতিসুরে সুর মিলাইয়া ভাগিরথী গীত গাহিতেছিল। শুক্ল চতুর্দ্দশীর অমল-শুভ্র-ইন্দু-করগুলি অশ্রুশিক্ত হইয়া আমার তমশাবৃত হৃদয়ের বাহিরে এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া স্থির হইয়া দেখিতেছিল, লজ্জায় আমার তিমির-পরি-বেষ্টিত পরাণের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহস করিল না।

রাত্রিও বাড়িতে লাগিল,—আমরাও মনের অবস্থা ভীষণতর হইতে লাগিল। ভাবিলাম, চিরকালই কি এই অনুতাপ-বহ্নি হৃদয়ে রাখিয়া এই কলঙ্কময় অকীর্ত্তিকর জীবন বহন করিব? কেন কিসের জন্য? এ জগতে

আমি থাকিলে কাহার কি লাভ হইবে? আমার অস্তিত্ব লোপ পাইলে কাহারই বা এক কপর্দ্দক ক্ষতি হইবে?

সম্মুখেই বিশ্রাম-স্থান। সিঁড়ি ধরিয়া নামিলাম! বলিলাম,—মাতঃ! আমার আপনার বলিতে এ জগতে কেহই নাই। ক্রোড়ে স্থান দে মা! এক গলা জলে নামিয়া যখন ডুবিতে গেলাম, কোথা হইতে নবনীত-গঠিত ছোট ছোট দুইখানি সুন্দর হাত বড় গোল বাধাইল, হাত দুটি গলা জড়াইয়া ধরিল। আধ আধ ভাষে কনক-অধরে সেই গোপগৃহের শিশু বলিল,—বাবা! বাবা! তুমি মরিলে আমার কি হইবে? চিরকাল কি নীচগৃহে পালিত হইব?—ভাবিলাম, না না, মরিব না। ফিরিয়া যাই। পশ্চাৎ হইতে তরঙ্গ আসিল। মা বলিলেন,—সে কি বাছা ফিরিবে কোথা? তরঙ্গ বক্ষে ভাসিয়া গেলাম। জ্ঞান লোপ পাইল।

সে যাত্রায় মরি নাই; বাঁচিয়া ছিলাম। আবার আড্‌ডাবাড়ীতে আশ্রয় লইয়া ছিলাম। কিন্তু আর তত ভাবি না। ভাবিব কেন? এ জগতে কেহ কাহারও নয়। তবে মাঝে মাঝে শিশুটিকে দূর হইতে দেখিয়া আসি কেন? বাঃ! এতটুকু মানসিক দুর্ব্বলতাই যদি না থাকিবে, তবে আর আমি মনুষ্য কিসে?

পূর্ব্বে নেশারত ছিলাম না। এখন প্রাণের ভিতরটা সূচিকাবিদ্ধ হইলেই, হৃদয়ের মধ্যে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলেই --অগ্নি নির্ব্বাপনার্থ প্রাণের ভিতর বারি সিঞ্চন করি। এ জল বিলাতী,— স্কটলণ্ডে প্রস্তুত। এ জল কত আমীরকে ফকীর করিয়াছে; কত সতীকে নয়ন জলে ভাসাইয়াছে; কত পিতামাতাকে পুত্রশোকে কাতর করিয়াছে. তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে পূর্ব্বে প্রধান মদ্যপায়ী ছিল শিবচন্দ্র। এখন শিবচন্দ্র দেখিল, এণ্ট্রান্স পাশ করা মন্মথনাথ তাহার প্রধান প্রতিযোগী। যখন বিলাতী অমৃত জুটিত না, তখন দেশী ধান্যেশ্বরীর সেবা করিতাম। আর পূজার সময় অভিনয় হইবে বলিয়া বক্তৃতা মুখস্থ করিতাম, জীবনটা মোটের মাথায় এক রকম স্ফূর্ত্তির উপর কাটাইতেছিলাম।

ভগবান যাহাকে কষ্ট দিবার জন্য জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন; তাহার ভাগ্যে আর অধিক সুখের সম্ভাবনা কোথায়? একদিন সম্প্রদায়ের

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিল, মন্মথ! তুমি আজ কাল বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ। খালি নেশায় বিভোর হ'য়ে থাক্‌বে, আর গোলমাল কর্‌বে।

আমার চক্ষুদুটি বেশ লাল ছিল; মস্তিষ্কটাও উষ্ণ ছিল, রাগত ভাবে বলিলাম,—কি? যত বড় মুখ, তত বড় কথা? ম্যানেজার বলিল,—ওসব চালাকি হবে না। অমন কর ত নিজের পথ দেখতে হবে।

আমি গালি দিলাম। সেও দিল। আমি পিরাণের হাত গুটাইলাম, সেও গুটাইল। মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেক মধ্যস্থ জুটিল। কেহ বলিল, দোষটা সম্পূর্ণ মন্মথর; কেহ বলিল, না—না, প্রধান দোষী ম্যানেজার। আমার তখন মেজাজ অগ্নি সদৃশ হইয়াছিল। আমায় ৩।৪ জনে ধরিয়াছিল। আমি তবুও বলিতেছিলাম,—ওর জান ল'ব। ম্যানেজারও তদ্রূপ।

যখন নেশার ঘোরটা কাটিয়া গেল, বিষম লজ্জা আসিল। ম্যানেজারও রাগিয়া ছিল। সেও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেরূপেই হউক, আমাকে আড্ডা হইতে বিতাড়িত করিবে। ভাবিলাম,—করিয়াছি কি? এ হতভাগ্য জীবনের শেষ আশ্রয় তরুটির মূলেও কুঠারাঘাত করিলাম। জগতের শেষ আশ্রয় স্থান-চ্যুত হইলাম। একবার ভাবিলাম, ফিরিয়া যাই। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করি। অমনি ঘৃণা হইল। আর সে পশুশালায় পুনঃপ্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কে বলিতে পারে এ ঘটনাটি আমার ইষ্টসাধন করিবে না? আমার ইষ্ট কি? পরক্ষণেই মনটি গোপগৃহে চলিয়া গেল। ভাবিলাম,—আমার ইষ্ট নাই; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমার সংযোজন করিবার একটি সূত্র যে সে স্থলে পড়িয়াছিল। আমার শিশুর কি হইবে? তাহার উদ্ধারের কি উপায় করিতেছি? ভগবান যাহা করেন, জীবের মঙ্গলের জন্যই। সহচরদিগের সহিত কলহ হইয়াছিল,—ভালই হইয়াছিল।

একটা মহা সংকল্প করিয়া ফেলিলাম,—একটি কাজকর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া ভদ্রভাবে থাকিয়া অর্থ সঞ্চয় করিব। তাহার পর অর্থের দ্বারা গোয়ালার নিকট হইতে পুত্রটিকে ক্রয় করিয়া লইব। তার পর? তাহার পর তাহাকে শিক্ষা দিব, লেখাপড়া শিখাইব। সারা জীবনে কেবল তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব।

জীবনের নূতন পথে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথম প্রথম কার্য্যের অবসরে পুরাতন অভ্যাস গুলির জন্য প্রাণ কাঁদিত। প্রথমে যখন সওদাগরী আফিসে চাকুরী

পাইয়া প্রাতে দশটার সময় আহারাদি সমাপন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে যুটিতে হইত, পাঁচজন সংসারী কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তির সুখ দুঃখের গল্প শুনিতে হইত, তখন এক নূতন রকম ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিত। বাহ্য-জগতের এ সব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গৃহ সংসার প্রভৃতির কথায় কেমন একটা নূতন আকর্ষণী শক্তি ছিল। হৃদয়ের নিভৃতে এক কোণে কোথায় বাসনার ক্ষীণ একটা রশ্মি দেখা দিত। আবার যখন আপনার অবস্থাটা সম্যকৃরূপে বিশ্লেষণ করিতাম, তখন আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া একটি বিদ্রূপের হাসি হাসিতাম।

তখন সন্তোষ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিতাম। বাসায় যখন সামান্য আহার্য্যের দ্বারা আপন উদর-পূরণ করিতাম, তখন কেমন একটি সন্তোষের ভাব অনুভব করিতে পারিতাম। ভাবিতাম,—আপনার উদ্যমের দ্বারা,—আপনার উপার্জ্জনের দ্বারা আত্ম-রক্ষা করিতেছি। সে চিন্তাতেও একটা শান্তি পাইতাম।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ পাইতাম অর্থ সঞ্চয়ে। সেই অর্থ সঞ্চয়ের সহিতই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত আশা ভরসা বিজড়িত ছিল। মনে মনে ভবিষ্যতের সুখ-সৌধ বিনির্ম্মাণের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। জানিতাম তাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন, প্রথমতঃ প্রচুর অর্থ দ্বারা গোপগৃহ হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিতে হইবে; তাহার পর অর্থের দ্বারা পুত্রের লালন পালন ও বিদ্যা শিক্ষার সকল ব্যয়ই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেবল পুত্র পালন করিতে হইবে বলিয়াইত আমি নূতন জীবন যাপন করিতে-ছিলাম; পৃথিবীর সকল সম্বন্ধ হইতে বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত হইলেও আবার সামাজিক জীব হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

এক দিকে লক্ষ্য করিয়া এক উদ্দেশে পাঁচ বৎসর কার্য্য করিলাম। আর আমার সেই জঘন্য ঘৃণিত-জীবনের অভ্যাস গুলি? সমস্ত অভ্যাসই জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, কিন্তু একটি অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আত্মজীবনের সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতাম,—কণ্টক পরিবৃত সংসার-অরণ্যের এক স্থানে একটি মাত্র নন্দনকুসুম পরিস্ফুট হইয়া আছে;—এত জ্বালা এত ক্লেশ সহ্য করিতেছি কেবল ভবিষ্যতে সেই কুসুমটি লাভ করিব বলিয়া। প্রত্যহ কর্ম্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিবার সময় এক একবার আমার জীবন-প্রদীপটিকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতাম।

ইহাতেই স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতাম; ভগ্ন হৃদয়ে আশা ভরসা প্রেম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতাম।

৭

পঞ্জিকা দেখিলাম, আজ সদনুষ্ঠান করিবার পক্ষে অত্যন্ত সুদিন। বাহিরের লক্ষণাদি দেখিয়া কিন্তু এ সিদ্ধান্তের কিছুই যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিলাম না। সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিন দিন রামবাগানে পুত্র দর্শন করিতে যাইতে পারি নাই। আজ অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য হইতেছিল। ভাবিলাম, আজই এ কার্য্যের শেষ করিয়া ফেলিব।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতার রাস্তাগুলিতে এক হাঁটু জল জমিয়াছিল। রাজ পথ একেবারে জনশূন্য। রামবাগানের পথে আমা ব্যতীত আর একটিও লোক চলিতেছিল না।

পরিচিত সদয় গোপের কুটীর দ্বারে আঘাত করিলাম। অনেক ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকির পর এক যুবক আসিয়া কপাট খুলিয়া দিল। একটু বিরক্তির সহিত যুবক বলিল,—কি চান, মহাশয়?

আমি বলিলাম,—বৃষ্টিতে পথ চলিতে পারিতেছি না; একটু আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি। অনুমতি কর ত একটু বিশ্রাম করি। যুবক আমার মুখের দিকে একবার ঔৎসুক্যময় দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার পর বলিল,—আসুন।

ভিতরে গিয়া একটি ক্ষুদ্র গৃহে উপবেশন করিলাম এবং তাহার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলাম। প্রাণে কিন্তু মহা অতৃপ্তি অনুভব করিলাম। আমার নয়ন যাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহার ত কোন চিহ্নও পাইলাম না। যে গোপ আমার পুত্রের পালক-পিতা, তাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং সমস্ত বিষয়টাই কেমন সন্দেহ জনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া একেবারে যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলিতে পার এখানে সদয় বলিয়া কি কেহ বাস করে?

সে বলিল,—হ্যাঁ, সদয় থাকিত বটে; কিন্তু সে দুই দিন হইল কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালার টাকা পাওনা আছে; তাহাও দিয়া যায় নাই বা কাহাকেও কিছু বলিয়াও যায় নাই।

আমি সাগ্রহে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর তার ছেলে কোথায়?"

যুবক বলিল,—সদয়ের ত ছেলে মেয়ে ছিল না। একটি পাঁচ বৎসরের পালিত পুত্র ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম,—কোথা গিয়াছে বলিতে পার না? সে বলিল,—না। কেহই বলিতে পারে না। হটাৎ সদয় কোথা গেল জানিবার জন্য, আমাদের পাড়া শুদ্ধ মহা গোলযোগ হইতেছে।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া খুব কাঁদিলাম। জীবনের শেষ আশাটুকু চলিয়া গেল। ভাবিলাম, এ জীবন ত মরুভূমি। মনুষ্য-নিয়তি যে অপর হস্ত-শাসিত তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিলাম। সংসারের এত জমাখরচ, এত ভবিষ্যতের কল্পনা সকলই বৃথা!

ভাবিলাম,—আর কেন? বহু পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, এখন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করিব; তাপসের বেশে নিজের মনের জ্বালায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব। আমার মত ব্যক্তির আর সংসারে থাকিয়া লাভ কি?

যে দিন ভট্টাচার্য্য গৃহ ত্যাগ করিলাম, সে দিন যে ইচ্ছা হইয়াছিল, আজও হৃদয়ে সেই ইচ্ছা বলবতী হইল। একবার ছদ্মবেশে সরলাকে দেখিয়া আসিবার জন্য হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

মতীচুর-সমালোচনা। *

বাঙ্গালা ভাষা এখন আর নিতান্ত দীনা নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন জাতীয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কোন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-পক্ষে কবিতা এবং উপন্যাসের বাহুল্য অনাবশ্যক না হইলেও গুরু সন্দর্ভাদি দ্বারাই সাহিত্যে দৃঢ়তা, গুরুত্ব এবং শক্তি সঞ্চারিত হয়। গুরু সন্দর্ভ সাহিত্য-শক্তির পরিচয় দেয় এবং তাহাকে উদ্বোধিত করে; সুতরাং গভীর গবেষণা, ভাব এবং চিন্তাপ্রসূত নানা বিষয়ক সন্দর্ভ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

মাসিক-সাহিত্য-পত্রই এবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ত্রিপাদ পাঠকের কাছেই এসকল সন্দর্ভ অপঠিত থাকে। ইহা সাহিত্যের

---

* 'মতীচুর' ১ম ভাগ, মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত। কলিকাতা কড়েয়া 'নবনুর' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত!

পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর এবং পাঠকের পক্ষে উন্নতি-প্রয়াসহীন তরলতার পরিচায়ক,—নিতান্তই লজ্জার বিষয়। এই জন্যই বাঙ্গালায় সন্দর্ভগ্রন্থের প্রচার এত বিরল,—সন্দর্ভগ্রন্থ-লেখক ও লেখিকাও এত অল্প।

আজিকালি তবু দুই-একখানি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকের মধ্যেও সন্দর্ভ পাঠাকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। অধুনা বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রামদাস প্রভৃতির আদর্শে মাসিকের অকর্ত্তিত পত্রমধ্য হইতে সন্দর্ভমালা গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে এবং পাঠক সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে। ইহা শুভলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, গ্রন্থকারদিগের অনুকরণে গ্রন্থকর্ত্রীগণ যে কবিতা-স্রোতে গা ঢালিয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা তাহা হইতে একেবারে উঠিতে পারেন নাই। উন্নত-শিক্ষাসম্পন্না মহিলাগণের লেখনী আজও কমকান্ত প্রসূনরাজিবিশোভিত সুরভি-মধুর মলয়ানিল সন্ধুক্ষিত পিককল-মুখরিত মোহন কাব্যকুঞ্জের সৃষ্টি প্রয়াসে সযত্নে নিরত। তাঁহাদের সাহিত্য-পাঠ স্পৃহাও সেই কল্পনাজালাবৃত কুঞ্জমধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ইহা প্রকৃত পথ নহে। এই লেখনী যে দিন প্রকৃত সুগৃহিণীর কর্ত্তব্যচিত্র অঙ্কনোদ্দেশে গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবে, আর এই তৃষ্ণা ঐরূপ চিত্র দর্শনে ব্যাকুল হইবে, সেইদিন বাঙ্গালাভাষার পক্ষে শুভদিন।

'মতীচূর' এইরূপ একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ। সন্দর্ভ-গ্রন্থ, সন্দর্ভ-বিষয় এবং সন্দর্ভ-রচয়িত্রী প্রভৃতি বিবিধ হিসাবে 'মতীচূরে'র মূল্য এসময়ে বড় বেশী। এত বেশী মূল্য বলিয়াই আমরা এসম্বন্ধে দুই কথা বলিতে বসিয়াছি।

'মতীচূরে'র বহিরাবরণ অতিশয় সুদর্শন,—পরম লোভনীয়। এরূপ আবরণ খুলিয়া আজিকালি অনেকেই স্থূল-চিক্কণ পত্রে দুই-চারি পংক্তি সিপিয়া-কালীমুদ্রিত 'আসি তবে' 'যাই তবে' ধরণের কবিতা কিংবা গল্পগুচ্ছ দেখিবার আশা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নৈরাশ্যে আমরা ক্ষুণ্ণ হইব না। যে সাহিত্যে সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগের সমস্যাপূর্ণ বিষয় লইয়া স্বয়ং মহিলাগণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন, সে সাহিত্য বাস্তবিকই পরিপূর্ণতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিশোরী বঙ্গভাষার পক্ষে ইহা বড়ই আশা-প্রদ,—পরম আনন্দ পুলক-কর।

বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িত্রী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা। অধিকন্তু, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলতার মধ্যেও হৃদয়ের অদম্য তৃষ্ণায়, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঐকান্তিক সাহায্যে, যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া-

ছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রসূত এ অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগের সাহিত্যভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন। ধন্য লেখিকা, ধন্য এ সাহিত্য, আর ধন্য সেই ভ্রাতা। এ 'মতীচূর' সাহিত্য-পূজায় অকৃত্রিম অনুরাগচর্চ্চিত প্রকৃত ভক্তিপূত ফুল্ল-পুষ্পাঞ্জলি।—এ একলব্যের প্রাণব্যাকুল পূজার অমূল্য অতুল গুরু দক্ষিণা।

হিন্দু-মুসলমান আজি একত্রে বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত,—মাতৃভাষার পূর্ণমাতৃত্ব এবং জাতীয় শক্তির দৃঢ়তা আজি নব বলে জাগিয়া উঠিতেছে, এই বলিয়া আমরা কতই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, যেমন হিন্দুর, তেমনই মুসলমানের অন্তঃপুর মধ্যেও আমাদের এই মাতৃ ভাষা এতখানি আদর পাইতেছে,—এতদূর যত্ন চর্চ্চায়,—এত সুন্দর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে চন্দন-চর্চ্চিত উপহারের মত উপস্থিত হইয়াছে,—আজি এ অসীম আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। কেবল এই জন্যই বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'মতীচূর' অমূল্য রত্নখণ্ড।

'মতীচূর' সত্যই মতীচূর। ইহার লিখনভঙ্গী যেমন বিস্ময়কর, ভাষাও তেমনি মনোহারিণী। এই চমৎকার লিপি কৌশল ও মনোহারিণী ভাষার মধ্যে যে গভীর ভাবরাশি উজ্জলরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক পাঠকের নিকট তাহা অনন্ত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ "মোহরের পায়সে"র ন্যায় পাঠকের পাঠ-ক্ষুধার উদ্রেক করে, কিন্তু ইহার স্বাদ লইতে গেলে আনন্দ পুলকের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ চিন্তা এবং অপার সমস্যা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'মতীচূর' পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' এবং কালীপ্রসন্নের 'ভ্রান্তিবিনোদ' মনে পড়ে। অতুল কাব্যালঙ্কারে, বিপুল রহস্য বিজড়িত রসপূর্ণ যে সুগভীর সমস্যা-প্রশ্ন সমুচ্চয়ে কমলাকান্তাদির উৎপত্তি হইয়াছিল, 'মতীচূর'ও সেইরূপ অগণ্য সমস্যা-ভাব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। পার্থক্য কেবল, তাহাদের মূল প্রধানতঃ দর্শনে; ইহার ভিত্তি সমাজ-সমস্যার উপরে। 'মতীচূরে'র ন্যায় গ্রন্থের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। সুতরাং ইহার গুরুত্বও সামান্য নহে। 'মতীচূর' শুধু হিন্দু-মোস্‌লেম সমাজকে নহে, সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে—ভাবতরঙ্গে আলোড়িত করিয়াছে। মুসলমান মহিলা লিখিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থের এ ক্ষমতা কতদূর বিস্ময়কর, তাহা ভাষায় বুঝান সুকঠিন।

'পিপাসা', 'আমাদের অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্দ্ধাঙ্গী', 'সুগৃহিণী',

'বোরকা' এবং 'গৃহ' এই সপ্তসন্দর্ভ-মুক্তা-কণিকায় 'মতীচুর' গঠিত। এই মুক্তাসপ্তক ত্রিবর্ণে বিভক্ত। প্রথমে 'পিপাসা', দ্বিতীয়ে 'নিরীহ বাঙ্গালী' এবং অবশিষ্ট পঞ্চমুক্তা তৃতীয় শ্রেণীর। এই শেষোক্ত পঞ্চমুক্তা সমস্যা-সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

'পিপাসা' গদ্য কাব্যের নিপুণ তুলিকাচিত্রিত এক সুকরুণ ছবি। সমস্ত বিশ্বজগতের পিপাসা ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু প্রাণের পিপাসা ধূলায় লুটাইয়া "পিপাসা, পিপাসা" বলিয়া আর্ত্তরোদনে সমস্ত সংসার কাঁদাইয়াছে!

'পিপাসা'র ধ্বনিতে অন্তরের পিসাসা জাগ্রত হয়; কিন্তু সে উধাও পিপাসা কারুণ্যশরাহত হইয়া যখন পিপাসু বিশ্বের বুকে ফিরিয়া আসে, তখন নয়নের অজস্র জলধারাও আর সে পিপাসা নিবাইতে পারে না।

'পিপাসা'র প্রতি অক্ষরে পিপাসার হাহাকার—প্রতিছত্রে পিপাসার ব্যাকুলতা। ভাব স্রোতে ছন্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে—স্নেহ বিধুরা অনন্ত স্নেহময়ী জননীর আকুল স্নেহ-পিপাসা, রণক্লান্ত বিপুল জনসঙ্ঘের দারুণ জলপিপাসা, আর সংহারোন্মুখ অস্ত্র-কণ্টকিত ভয়াল মরুভূর করাল শোণিত-পিপাসা—পিপাসার এক মহাসংঘর্ষ তুলিকার রেখায়-রেখায় স্পষ্টীকৃত।

"নবপ্রভায়" যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম,—মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জলপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, —'আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি; আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর,—সহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না!' শত্রুগণ কহিল, 'বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।' বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্ত্তে তীরবৃষ্টি হইল!—

'পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু
বজর পড়িয়া গেল।'

হোসেন শরবিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন "আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না!—আর বলিবে না 'পিপাসা, পিপাসা!' এই শেষ!"—সেদিন * মহরমের 'মুর্সীয়া'র হৃদয়-বিদারণ আর্ত্তকরুণ সুর এবং 'হায় হোসেন, হায়

---

* মুর্শিদাবাদে।

হোসেন !!' ধ্বনির সহিত ব্যাকুল শোক-স্মৃতি, উন্মাদ-ভাবে বক্ষে করাঘাত,—এ সকল চক্ষুর সম্মুখ দিয়া, কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয় ভেদ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই দিন যে আকুল পিপাসায় হৃদয় হা হা করিয়া উঠিয়াছিল, আজ 'পিপাসা' পড়িয়া আবার তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে !

আর একটি ছবি, "হৃদয়ানন্দ জানিত—আমি তাহাকে জল দিব না। আমি ডাক্তারের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত সময়ে জল চাহিতে সাহস করে নাই ! কি মহতী সহিষ্ণুতা ! জলের পরিবর্ত্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা ! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চার পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটী দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত) জড়াইয়া ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল ! আহা ! না জানি সে কেমন পিপাসা ! অনলরচিত পিপাসা কিম্বা গরলরচিত পিপাসা !!! * * * আক্ষেপ এই যে জল কেন দিলাম না ? রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না ? এই জন্যই ত রাত্রিদিন শুনি "পিপাসা, পিপাসা !" এই জন্যই ত এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি,—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা !"—ব্যথিত মর্ম্মের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া এ পিপাসা যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে ! —বাষ্প-আবেগে নয়নের সমক্ষে এ চিত্রের দৃশ্য রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্তর না জানি কোন্ নিদারুণ পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে !

বুঝি জননীর জাতি বলিয়াই তিনি এ পিপাসার এমন দৃশ্য এমনি করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন ;—এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইয়াছেন !

যে লেখনী হইতে এ 'পিপাসা' সৃষ্ট হইয়াছে, সে লেখনী ধন্য। যে আকুল হৃদয় হইতে এ পিপাসার আর্ত্তনাদ উৎসারিত হইয়াছে, সে হৃদয়েয় তুলনা নাই।

কিন্তু অতি আশ্চর্য্য সেই লেখিকার লেখনীর শক্তি ; যিনি দারুণ সন্তান-শোক হৃদয়ে লুকাইয়া চোখের জল শুকাইতে না শুকাইতে অনাবিল রহস্যের সঙ্গে গুরুতর সমস্যা লইয়া হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। কর্ত্তব্য-কঠোর সংসারে কুসুমকোমল প্রাণ এমনই করিয়া মুহূর্ত্ত

মধ্যে বজ্র কঠিন হয়। হয়, কর্ত্তব্যের পরীক্ষায়, হয় হৃদয়ের আবেগে। এখানে ভাণ নাই; ইহাই সংসারের খাঁটি সত্য। ‘নিরীহ বাঙ্গালী’ রস ও রহস্তের আবরণে কি তীব্র ধিক্কার, কি মর্ম্মন্তুদ চিত্র! এ চিত্রে লোকরহস্যাদি বহু গ্রন্থের ভাবরাশি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।—হউক সে সব নবীকৃত পুরাতন কথা;—কিন্তু, বঙ্কিমপ্রমুখ মহাত্মার মধুমাখা কশাঘাতে যাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, আজ অন্তঃপুরের সুবর্ণসম্মার্জ্জনী তাহাদের চৈতন্যসঞ্চারে উদ্যত,—আজ যদি চেতনা হয়! অন্তঃপুরের এ মিষ্ট টিট্‌কারী রুগ্ন সমাজে হয়ত মহৌষধিস্বরূপ হইতে পারে! আজ ভারত-ললনা স্বয়ং জাগিয়া উঠিয়া সম্মার্জ্জনী ধরিয়াছেন, এখনও যদি জঞ্জাল-আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবার আভাষ না পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালীর ঘুম আর ভাঙ্গিবে না।—এ নিদ্রা নিদ্রা নহে, মৃত্যু।

অবশিষ্ট পঞ্চ প্রবন্ধে, গ্রন্থকর্ত্রী বর্ত্তমান মৃত সমাজ সম্বন্ধেই অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন। যে সকল গুরুতর সমস্যা লইয়া আন্দোলন, সংক্ষেপেও তাঁহার সকলগুলির মীমাংসা করা সহজ নহে। সকল প্রবন্ধের বিষয়গুলির সামঞ্জস্য করিতে গেলে বহুবার প্রয়াস করিতে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা তাহাতেও তাঁহার সকল কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব এই এক প্রবন্ধে সে সমস্তের সম্পূর্ণ সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও এ গ্রন্থে তাঁহার যে ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কথা সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। সত্য, তিনি ‘স্বকীয় মত মাত্র’ ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় লেখিকার মতের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। বিশেষতঃ তাঁহার এই ‘স্বকীয় মতে’ সমাজে যে আন্দোলনের সম্ভাবনা, তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু বলিতে হইবে।

সমস্যা বা অভিমতি সকলের সংখ্যা বহু। তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা একান্ত প্রধান কয়েকটি বিষয় লইয়াই মীমাংসার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সমাজের ক্ষত সম্বন্ধে তিনি অনেক চিত্র দেখাইয়াছেন। চিত্রের দৃশ্য বস্তুতঃই ভীষণ মর্ম্মপীড়ক। এ সকলের সংস্কার যে অত্যাবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবেন? শুধু এ সকলের নহে, সমগ্র সমাজেরই সংস্কার আবশ্যক। "বর্ত্তমান মৃত সমাজ" উল্লেখেই আমরা ইহার আভাষ দিয়াছি। সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু সংস্কার এক কথা আর সমাজের প্রাকৃতিক বিধি আর-এক বিষয়।

উপযুক্ত সংস্কারে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না,—কিন্তু মূল সমাজ-বিধির পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর, না স্বভাবসম্মত? যাহা একান্ত কৃত্রিম, তাহার

পরিবর্ত্তন চলে; পরন্তু প্রকৃতির সহিত যাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাহার পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলকর হয়। যেমন, ক্ষত জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন; এজন্য রোগীর কোন অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিতে হইলেও করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া হাত কাটিয়া মাথার স্থানে, মাথা পায়ের স্থানে এবং পা হাতের স্থানে বসাইয়া দিয়া রোগীকে কোন উপায়ে আরোগ্য করিয়া তুলিলে বিশেষ লাভ দেখা যায় না।

হৃদয়ের জ্বালাময় আবেগে গ্রন্থকর্ত্রী এ শেষ পঞ্চ প্রবন্ধে অনেক রকমের কথাই কহিয়াছেন। স্থূল বক্তব্য যাহা, তাহা তিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে বুঝাইতে পারিতেন। এক্ষেত্রে যেন হৃদয়ের আবেগেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন;—সকল বস্তু বাছিয়া লইবার অবসর পান নাই। 'পিপাসা' ও 'নিরীহ বাঙ্গালী'তে তাঁহার যে প্রতিভা নির্ম্মলোজ্জল-জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এ কয় প্রবন্ধে তাহা সর্ব্বগ্রাসিনীরূপে সদসৎ সমস্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছে! এই জন্য অধিক আবেগে—অত্যধিক ব্যগ্রতায় প্রবন্ধগুলি কূটতর্ক এবং নানারূপ সমস্যায় একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

আবাহন-সঙ্গীত।

অই শুন শুন—শত আবাহন
চরিছে ভুবন মাঝে:
সভ্যতার তুরি—ঘুরি ঘুরি ফিরি
জাগাইছে সবে কাজে।
শত হাত তুলি যুনানী-মণ্ডলী
ডাকিছে করিবে স্নেহ কোলাকুলি;
(মোদের) মলিন বদনে—কিরণ ভূষণে
সাজাবে নবীন সাজে!

শত শত মুখ চারি পাশে হাসে,
শত শত শিরে হীরক প্রকাশে,
আমরা কি প'ড়ে—রহিব আঁধারে,
তুলিব না শির লাজে?
আমরা কি আজি কালিকার জাতি?
অতীতে এসেছি জ্বালাইয়ে বাতি,
(যাহা) পৃথিবী মোহিয়া—এসেছি গাহিয়া
এখনো পরাণে বাজে!
গ্রহগণে বসি ওই ঋষিগণ
আশীর্ব্বাদ যেন করেণ বর্ষণ;
জগতের গানে—জগতের প্রাণে
এস, মিশ, ছাড় ব্যাজে!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ

আমি অভ্যাগত নূতন বরষ
এসেছি তোদের দুয়ারে ;
তাই কি হরষে ওগো নরনারি !
হাসিছ নিরখি আমারে ?
তাই দ্বারে দ্বারে আমোদে মাতিয়া
চূত পল্লব দেছ ঝুলাইয়া ?
কুসুমের হার, মরি কি বাহার,
দুলিছে কাতারে কাতারে !
এসেছি কি ব'লে নূতন বরষ
আমিগো তোদের দুয়ারে ?

২

প্রত্যুষে উঠিয়া নাইয়া ধুইয়া,
আমরি পবিত্র আচারে
সাজিয়া সকলে বসনে ভূষণে
ভেসেছ আনন্দ-পাথারে !
অনাথ দরিদ্রে, কি চারু বিধান !
ভাণ্ডার খুলিয়া করিতেছ দান ;
হিন্দু-মুসলমান নাহি ভেদ জ্ঞান,
তুষিতেছ পান আহারে।
আহা কি উল্লাস হেরি মর্ত্তে আজি
কহিব, দেখাব কাহারে ?

৩

পাইলাম প্রীতি বড়ই অন্তরে
আজের আদর আহ্বানে ;
কি এক অমিয়া বিমল মধুর
ভরিয়া গিয়াছে পরাণে !
যে দিকে তাকাই কেবলি আনন্দ,
ঢলিয়া মজিয়া বহিয়া মন্দ,
বিলায় মারুত কুসুমগন্ধ,
আনমনে এক ধেয়ানে !
কি এক অমিয়া বিমল মধুর,
ভরিয়া গেলরে পরাণে !

করি আশীর্ব্বাদ যে ক'টা দিবস
থাকিব তোদের সকাসে,
এমনি বিমল আনন্দ-লহরী
খেলে যেন সব আবাসে।
হেন সদাচারে অতিথি সৎকার
থাক গো করিতে সবে অনিবার,
ভ্রাতৃভাবে মজি ধ্বজা একতার
তোলহ সুদূর আকাশে !
দ্বেষাদ্বেষি ঘৃণা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা
পলাইয়া যাক্ তরাসে।

মোজাম্মেল হক্।

খোল গো দুয়ার !

জননি, তোমারে ভুলি মোহ-কারাগারে
এতদিন ছিনু মোরা নিবিড় আঁধারে
অবরুদ্ধ অসহায় ! নিত্য অভিনব
আচরিয়া মহোল্লাসে বিলাস-উৎসব
বাড়ায়েছি সহস্র সন্তাপ ! নিজ করে
নিজ ফাঁস-রজ্জু মোরা নিশিদিন ধ'রে
ক'রেছি নির্ম্মাণ সুখে ! কভু মুখ তুলে
হে জননি, হে কল্যাণি, তব মুখ ভুলে
করিনি দর্শন মোরা ! আজি আমাদের
হইয়াছে প্রায়শ্চিত্ত সে মহা পাপের
জীবনের শুভক্ষণে ! জ্বলিয়াছে আলো,—
তোমারে দেখিতে মা'গো পাইতেছি ভালো
স্থির দয়াময়ী বেশে ! চরণে তোমার
ছুটে আসিয়াছি তাই,—খোল গো দুয়ার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সরম।

জাগাইয়া আঁখিকোণে নব অনুরাগ,
খুলি নন্দনের দ্বার ধীরে অতি ধীরে,
(ফুলশয্যা-দিনে রম্য বঙ্গ-বধূ-সম)

এলে তুমি নামি যবে সরম সুন্দরী!
হেরি তোমা যূথীলাজে লুকালো পাতায়:
বল্লরী কুসুম-নম্র সহকারে হেরি
ফিরালো বদন! যুবতী লইল টানি
স্রস্ত নীলাঞ্চল তার। শুভ কোজাগরে
তুমি লক্ষ্মী এলে বঙ্গভূমে। হে কমলা,
রমণীর তুমি আভরণ। মনোহর
বর্ম্ম তুমি তার; লক্ষ্মণের গণ্ডী তুমি।
তোমা হ'তে দূরে রহে কলুষ-রাক্ষস!
হে অবগুণ্ঠণপ্রিয়া! বাঞ্ছিতার মুখে
তোমার বিকাশ হেরি ভাসি মনঃসুখে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মরণখেলা।

সুবিমল জোছনায় জগত ভাসিয়া যায়,—
হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে
মুরতি খানি।
মধুর এ সমীরণে কি গান বহিয়া আনে,
আমি যে পাগল হই
সে গান শুনি'।
অতৃপ্ত বাসনা মম জলন্ত অনল সম—
হৃদয় দহিয়া যায়
দিন-যামিনী!
আজি যম-যাতনায় সে কোথায় আছে হায়
দেলো তোরা দেলো তারে
ডাকিয়া আনি!
সুবিমল জ্যোছনায় জগৎ ভাসিয়া যায়,—
হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে
মুরতি খানি।
আমি কতদিন ধরিয়া তারি মুখ চাহিয়া
রাখিয়াছি প্রাণ মম
তাহারি তরে।
আমি কত নিশি যাপিয়া ফুল-হার গাঁথিয়া—
দিয়াছি ভাসায়ে হায়
নয়ন-নীরে!
সেত সখি আসিল না, মালাগাছি পরিল না,
শুকায়ে ছিড়িয়া গেল,
কুসুম-ডোর।
আশা সাধ ফুরাইল, স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল,—
কোথায় রহিল হায়
সে মন-চোর।
আমি কার তরে বল আর বহিতেছি দুঃখভার
কার তরে সযতনে
গাহিতেছি গান,
আমি যারে সদা চাই, তাহারে নাহিক পাই,
ভাষাহীন বেদনায়
কাঁদিছে প্রাণ!
আকুল ক্রন্দন তার, ভাঙ্গিল হৃদয়-দ্বার—
যে দিন সে চলে গেল
প্রভাত-বেলা;—
রহিনু দ্বারের পানে, চাহিয়া কাতর প্রাণে,
মনে হ'ল এই বুঝি
মরণ খেলা!
যে দিন সে চলে গেল—
প্রভাত বেলা।
ভগ্ন শূন্য হৃদি লয়ে আমিও রয়েছি চেয়ে,—
রবি উঠে ডুবে যায়
সাঁঝের বেলা,—
আঁধারে জগৎ ঘেরে, পাখিটিও আসে ফিরে,
শূন্য এ গৃহের দ্বারে
আমি একেলা!
আবার তপন আসে
প্রভাত বেলা।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য।

মোগল-সাম্রাজ্য।

(টাভার্নিয়ার-বর্ণিত।)

(১)

হিন্দুস্থানের অধিকাংশ ভাগ এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সিন্ধু নদীর শৈল-শ্রেণী-সঙ্কুল তীর হইতে গঙ্গার পর পারের গিরিপ্রান্ত পর্য্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বসীমায় আরাকান, ত্রিপুরা ও আসাম, পশ্চিমে পারস্য ও উজ্‌বেগ তাতারগণের রাজ্য, দক্ষিণে গোলকণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য এবং উত্তরে ককেসাস্ গিরিপুঞ্জ অবস্থিত। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে বানতাম্ রাজ্য ও উত্তর পশ্চিমভাগে উজ্‌বেগ (Chegathey) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

মোগলগণকে শ্বেতবর্ণ বলে। কারণ,ভারতের শেষ বিজেতার বর্ণ সাদা ছিল; কিন্তু উহার অধিবাসিবৃন্দ গৌরবর্ণ।

সুলতান তৈমুরলঙ্গ হইতে বর্ত্তমান সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব একাদশ পুরুষ-ব্যবধান। চীন হইতে পোলণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তার ও তদ্ধেতু রণনৈপুণ্য পূর্ব্বকালের সমস্ত প্রধান সেনাপতির গৌরবকেই ম্রিয়মাণ করে। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অনেকানেক দেশীয় নরপতির বিনাশ সাধন করিয়া দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন। ঔরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন গুর্জ্জর, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী, মুলতান, লাহোর, কাশ্মীর, বাঙ্গালা এবং আরও অনেক রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, জমীদার প্রভৃতি তাঁহাকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন। মোগল সম্রাড়্গণের সিংহাসনারোহণ-ক্রম নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। সুলতান তৈমুরলঙ্গ (লঙ্গ অর্থাৎ খোঁড়া)। তাঁহার একখানি পা অপর খানি হইতে ছোট ছিল। জন্মস্থান উজবেগ, তাতার-রাজ্যভুক্ত সোমরখণ্ড প্রদেশে সমাধিস্থ হন।

২। মিরাম শা—সুলতান তৈমুরলঙ্গের পুত্র।

৩। সুলতান মোহাম্মদ—মিরামশার পুত্র।

৪। সুলতান মির্জ্জা আবু উমিদ—সুলতান মোহাম্মদের পুত্র।

৫। হামেদ শেখ—পূর্ব্বোক্তের পুত্র।

৬। সুলতান বাবর (বীর নরপতি)। মোগল সম্রাড়্গণের মধ্যে ইনিই প্রথম ভারতবর্ষের উপর দুর্জ্জয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৭। সুলতান হুমায়ুন (সুখী)—সুলতান বাবরের পুত্র। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। *

৮। সুলতান আবুল ফতে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ (সাধারণতঃ সম্রাট্ আকবর নামে অভিহিত)। ৫৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৯। সুলতান সেলিম (অপর নাম জাহাঙ্গীর বাদশাহ অর্থাৎ বিজয়ী সম্রাট্)—আকবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। প্রথম—সুলতান খস্রু; দ্বিতীয়—সুলতান কোরাম; তৃতীয়—সুলতান পারবিজ; এবং চতুর্থ—শাহ দানিয়াল।

১০। উক্ত সন্তান-চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় সুলতান কোরাম পিতা জাহাঙ্গীরের দেহাবসানে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। আগরা প্রাসাদে সমস্ত আমীর ওমরাহ কর্ত্তৃক সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তিনি পরে শাহাবউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ-জাহান (পৃথিবীর অধীশ্বর) নাম গ্রহণ করেন।

১১। সুলতান ঔরঙ্গজেব (সিংহাসনের অলঙ্কার)—বর্ত্তমান সম্রাট্।

এসিয়া মহাদেশে 'গ্রেট মোগল' (শাহজাহান) † নিঃসন্দেহে ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাশালী নরপতি। যে সমুদয় রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল, তাহা সমস্তই তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। অধিকারস্থিত এই সকল রাজ্য হইতে তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

(২)

এই প্রবল নরপতি শাহজাহান চল্লিশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল রাজত্ব করেন।

* 'তাজকেরা-অল-ওয়াকিয়ত' বা 'হুমায়ুন নামা' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হিজরী ৯৬৩ সালে রবি-অল-আউয়াল মাসের ১১ই তারিখে হুমায়ুন পরলোক গমন করেন। ইহা ইংরেজী ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের ২১শে জানুয়ারী সংঘটিত হয়।

† ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ঔরঙ্গজেবকে "The Great Mogul" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু টাভার্নিয়ার শাহজাহানকেই "The Great Mogul" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। পরে ঔরঙ্গজেবের বিবরণ প্রদান কালে তৎপ্রতিও ঐ উপাধি প্রযুক্ত হইয়াছে। কথিত আছে, শাহজাহান তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি ছিলেন।

প্রজার সহিত রাজার যেরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাঁহার সময়ে সেরূপ ছিল না। পিতা যেমন নিজ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে দেখিয়া থাকেন, তিনিও সেইভাবে তাঁহার প্রজাবৃন্দের সহিত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের উপর এমনি কড়াকড়ি হইত যে, দস্যু তস্করদিগের অত্যাচারে একটি লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। রাজত্বের অবসান কালে শাহজাহান ত্রয়োদশবর্ষীয়া একটি যুবতীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার শারীরিক শক্তি সমূহ তাঁহার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ দিতে তাদৃশ অবসর না পাওয়ায়, তিনি শক্তি সঞ্চয়ের নিমিত্ত অতি উগ্র ও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং ইহাই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ হইয়াছিল।* এইরূপে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি দুই তিন মাস ঐ সুন্দরীর সহিত অন্তঃপুরে থাকিতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি কর্ম্মচারী ও প্রজাবৃন্দকে অতি অল্পই দর্শন দিতেন। তাহাতে দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা মনে করিয়াছিল যে, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। কারণ সপ্তাহে তিন দিন বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা পনর দিন পর সকলের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহাদের রীতিসম্মত ও নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শাহজাহানের চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—দারাশাহ; দ্বিতীয়ের নাম—সুলতান সুজা; তৃতীয়ের নাম—ঔরঙ্গজেব; এবং চতুর্থ পুত্রের নাম মুরাদবক্স ছিল। কন্যাদ্বয়ের প্রথমটির নাম বেগম সাহেব এবং কনিষ্ঠার নাম রোসেনারা বেগম।

শাহজাহান চারি পুত্রকেই সমান ভালবাসিতেন। তিনি পুত্রচতুষ্টয়কে চারিটি প্রধান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বা রাজপ্রতিনিধি করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ দারাশাহ সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি তথায় একজন

---

* সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক ভ্রমণকারী ডাঃ বার্ণিয়ার ভারতে পদার্পণ করিয়া চিকিৎসকরূপে শাহজাহানের দরবারে অবস্থান করিতেন। তিনি শাহজাহানের পীড়ার বিশেষ কারণ কি, তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই। তবে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন,—"** Shah-Jehan fell dangerously ill. I shall not speak here of his sickness, much less relate the particular of it. I shall only say this, that it was little suitable to a man of above seventy years of age, who should rather think on preserving his strength than to ruin it as he did."—Page 20.

সহকারী শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া পিতার সহিত দিল্লীতেই অবস্থান করিতেন। সুলতান সুজা বঙ্গদেশের অধিপতি হন। ঔরঙ্গজেব ডেকানের, এবং মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদিও শাহজাহান পুত্র চতুষ্টয়কে তুল্যরূপে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহাদের উচ্চাভিলাষ কিন্তু এই বিভাগে তৃপ্ত হইয়াছিল না। সদাশয় পিতা পুত্রেগণের মধ্যে শান্তি সংরক্ষণ মানসে যে সকল উচ্চ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষাই তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়াছিল।

শাহজাহান যখন এই ভাবে অন্দর মহলে রোগশয্যায় শায়িত, যখন তিনি নিয়মিত ভাবে সকলকে দর্শন দিতে অক্ষম, তখন চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল যে, শাহজাহান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; এবং দারাশাহ সিংহাসন অধিকারের উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। সত্যই শাহজাহান তাঁহার আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহগণকে আহ্বান করতঃ সিংহাসনে উপবেশন করিতে দারাকে আদেশ করিয়াছিলেন। যেহেতু, জ্যেষ্ঠ পুত্র-স্বরূপ তিনিই সিংহাসনে উপবেশনের উপযুক্ত পাত্র। সম্রাট্ আরও প্রকাশ করেন যে, শান্তিময় সাম্রাজ্যের মস্‌নদে তিনি নির্ব্বিঘ্নে উপবিষ্ট হন, তাহা দেখাই তাঁহার ইচ্ছা। সম্রাটের এইরূপ অভিলাষ হইবার উপযুক্ত কারণও ছিল। তাঁহার অপর পুত্র ত্রয় তৎপ্রতি দারা অপেক্ষা কম ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দারা প্রকৃতই হৃদয়ের সহিত সম্রাট্‌কে সম্মান ও ভক্তি করিতেন। তিনি পিতার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলেন যে, তিনি সম্রাটের জীবন রক্ষা ভিন্ন ভগবানের নিকট আর কোন প্রার্থনা করেন না এবং যে পর্য্যন্ত ভগবান তাঁহার জীবন রক্ষা করিবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি সিংহাসনে আরোহণের অপেক্ষা সম্রাটের অনুগত ও বাধ্য হইয়া থাকাই গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। সম্রাটের পীড়ার সময় দারাই সকলের অপেক্ষা বেশী সেবা শুশ্রূষা করেন। তৎকালে তিনি তাঁহার নিকট হইতে একবারেই অনুপস্থিত থাকিতেন না; সর্ব্বদাই পিতার শয্যার পার্শ্বে ভূমিতলে একখানি পশমী গালিচা বিছাইয়া অবস্থান করিতেন।

শাহজাহানের অলীক মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাঁহার অপর পুত্র ত্রয় বিদ্রোহী হইয়া প্রত্যেকেই পিতৃ-সিংহাসন দাবী করেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বন্দর সুরাট আক্রমণ করিতে সেনাদল

প্রেরণ করেন। নগরের প্রাচীর জীর্ণ ও স্থানে স্থানে ভগ্ন ছিল; সুতরাং মুরাদ-সেনার নগরপ্রবেশে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। দুর্গাভ্যন্তরে ধন রত্নাদি সঞ্চিত ছিল। জয়াভিলাষী যুবরাজ তাহা হস্তগত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও প্রতিপক্ষগণ সবিক্রমে তাহা রক্ষা করিতে সক্ষম হন। মুরাদের সেনাপতি শাহআব্বাস খাঁ একজন অধ্যবসায়শালী কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ অধিনায়কের ন্যায় এই সমর-প্রক্রিয়া পরিচালিত করেন। এই সেনাপতি যখন দেখিলেন, দুর্গ অধিকার করা যায় না, তখন একজন ইয়ুরোপীয়ান ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে দুই স্থানে খনন করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাচীরের অনেকাংশ ধসিয়া পড়িয়া গড়খাই পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে দুর্গবাসিগণ যার পর নাই ভীতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু অচিরেই তাহারা সাহস ফিরিয়া পাইল এবং যদিও সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়, তত্রাচ তাহারা বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা বিধ্বস্ত করতঃ চল্লিশ দিনেরও অধিক আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপ প্রবল বাধা পাইয়া শাহআব্বাস অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিপক্ষ-সৈন্য পুনরায় যখন তাহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিবে, তখন তাহার সম্মুখে রাখিবার জন্য দুর্গবাসিগণের স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গস্বামীর এক ভ্রাতা দ্বারা দুর্গাধিপতির নিকট নানা প্রলোভনের কথা বলিয়া পাঠান। কিন্তু শাসনকর্ত্তা একজন প্রকৃত রাজ-ভক্ত ছিলেন। তিনি সম্রাটের মৃত্যুর ঠিক সংবাদ জ্ঞাত না হওয়ায় এই সকল প্রলোভন উপেক্ষা করেন। সেনাপতি এইরূপে বিফলমনোরথ হওয়ায় দুর্গ-বাসীদিগকে ভয় দেখান যে, পরদিন যদি তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া না দেয়, তবে তাহাদের সকলেরই স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিব। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় না। অবশেষে প্রলোভন জয়যুক্ত হওয়ায় এবং সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় দুর্গস্বামী অতি উচ্চ সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেন। শাহআব্বাস সর্ত্তের সমুদয় নিয়ম যথারীতি পালন করিয়া সমস্ত ধন রত্নাদি লইয়া আমেদাবাদে প্রস্থান করিলেন। তথায় মুরাদ অর্থের জন্য প্রজাসমূহকে শোষণ করিতেছিলেন। *

* বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন যে, মুরাদ গুজরাটের বণিগ্‌গণের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ধার করিয়া লন। এই টাকা তাহাদের নিকট হইতে শোষণ করিয়া লওয়া

সুরাট অধিকারের সংবাদ জ্ঞাত হইবামাত্র যুবরাজ একখানি সিংহাসন আনাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাতে উপবেশন করিয়া কেবল গুজরাটের নহে, নিজকে তাঁহার পিতা শাহজাহানের অধিকৃত সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে তিনি নিজ নামে টাকাও মুদ্রিত করেন এবং সমস্ত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করতঃ প্রতি নগরে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এই বেপথুমান সিংহাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীঘ্রই ভূতলশায়ী হয়; এবং রাজদণ্ড অপহরণ অপরাধে তিনি কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যুবরাজ দারা শাহ ছলনা করিয়া বলেন যে, তিনি সুরাট উদ্ধার করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ তিনি তৎকালে তাঁহার পিতা সম্রাটের সাহায্য-কল্পে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজা মুরাদের অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী। তিনি বহুতর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সুজা বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে পদানত করিয়া লাহোরে * উপনীত হন। দারা তাঁহার গতিরোধার্থে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান সেকোর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই তরুণ যুবরাজ খুল্লতাতকে † পরাজিত করতঃ তাঁহাকে বঙ্গদেশাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া পিতৃ-সদনে উপনীত হন। ইত্যবসরে মুরাদ গুজরাট রাজ্যে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হইতে, ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করিতে এবং আগরা বা জাহানাবাদে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে জল্পনা-কল্পনা ও আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রাজ্যের অবস্থা যখন এবম্প্রকার, অপর ভ্রাতৃগণের তুল্য অভিলাষী কিন্তু তদপেক্ষা সমধিক সুচতুর ঔরঙ্গজেব নিজের অভিলাষ গোপন করিয়া তাঁহাদিগকেই প্রথমে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অবসর দেন। পরে তাঁহার বাসনা পরিব্যক্ত হইলে অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিনাশ সাধন সংঘটিত হয়। প্রথম তিনি সিংহাসনের প্রতি কোন দাবী দাওয়া না করিয়া দরবেশের ন্যায়

হয় নাই; তাহারা স্বেচ্ছাক্রমেই প্রদান করিয়াছিল। (Page 23.) ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন যে, এই কর্জ্জ সুরাটের বণিকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয়।

* বেহার হইবে; কারণ বঙ্গ পদানত করিয়া সুজা বেহারেই প্রথম সেনা পরিচালন করেন।

† এলাহাবাদের (এলাবাস্) নিকট (বার্ণিয়ারের মতে)। কাফি খাঁ ও এলফিন্ষ্টোনের মতে বেনারসের নিকট। "গঙ্গারতীরে বাহাদুরপুর নামক পল্লীতে,"—আলমগীর নামা।

জীবনাতিবাহিত করিবার ভাব প্রকাশ করেন এবং নিজের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে অতিশয় সিংহাসন-লোলুপ দেখিয়া বলেন যে, তোমার অতুল বীরত্ব তোমাকে সিংহাসন দাওয়া করিবার সুযোগ দিয়াছে। তজ্জন্য তোমার সাহায্যার্থে ও একমাত্র পরিপন্থী দারা শাহকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আমি আমার সৈন্যদল ও অর্থ নিয়োজিত করিব। তরুণ যুবরাজ সুখ-ঐশ্বর্য্যের আশায় মুগ্ধ হইয়া ঔরঙ্গজেবের কপট কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। যুবরাজ মুরাদ সম্রাট্ হইবার আশায় ঔরঙ্গজেবের সম্মিলিত সৈন্যের সহিত আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দারাও তাঁহাদের গতিরোধার্থে যাত্রা করিতে বিলম্ব করিলেন না; কিন্তু তাঁহার পক্ষে যুদ্ধাভিনয় যেরূপ অবিবেচকের ন্যায় পরিচালিত হয়, তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে তাহা তেমনি কার্য্যদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল। ইহার কারণ, দারাশাহ তাঁহার বিশ্বাসী সেনাপতির (যিনি রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যও করিতেন) পরামর্শের বিরুদ্ধে সেনাদলের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের উপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাহাদের আপাতমনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই জয়শীল হইবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা অতিশয় পৈশাচিক ছিল। মুরাদ প্রচণ্ড বিক্রম ও উৎসাহের সহিত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকেন। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁহার দেহের পাঁচ স্থান ক্ষত হয়। প্রথম যখন বিজয়লক্ষ্মী দারার দিকে হেলিয়া পড়িতে' আরম্ভ করেন, ঔরঙ্গজেব তখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যুদ্ধ অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। নিজের সুদক্ষ কর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণ বিনষ্ট হইবার পরে ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, দারার প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ রাজদ্রোহীতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া সম্রাটকে পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার দলে মিলিবার জন্য আসিতেছে। এই সকল রাজবিদ্রোহী সেনাগণের সাহায্যে ঔরঙ্গজেব পুনরায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। দারা বিদ্রোহী-দিগকে বিপক্ষের সঙ্গে যোগদান করিতে দেখিয়া এবং অবশিষ্ট সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতা শাহজাহানের নিকট আগরা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। * আগরায় যে সকল ধন রত্নাদি রক্ষিত

* ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত সৈন্যের সহিত দারার দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম,—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে শিপ্রা বা নর্ম্মদা নদীরতীরে। এই যুদ্ধে সম্রাট-সৈন্য রাজা

আছে, তাহা লইয়া দিল্লী দুর্গে আশ্রয় লইতে সম্রাট্ দারাকে পরামর্শ দিলেন। দারা অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্য্য করেন। এবম্প্রকারে ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণরূপে জয়মাল্যে ভূষিত হন। মুরাদ যুদ্ধ শেষের পূর্ব্বেই দেহের ক্ষত হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়ায়, অবসন্ন হইয়া ক্ষত স্থান ধৌতাদি করিবার অভিপ্রায়ে শিবিরে গিয়াছিলেন। এই সময় ঔরঙ্গজেবের পক্ষে বিপুল অর্থের সাহায্যে এই সকল বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী সেনানায়কগণকে হস্তগত করা কষ্টসাধ্য নহে। সেনানায়কগণ তরলমতি ও অনুদারচিত্তের লোক ছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা পলাতক নগণ্য পারসীক্, যে বেশী দেয়, তাহারা তাহারই গোলাম হইয়া থাকে। যুবরাজগণের মাতুল সায়েস্তা খাঁ, যাঁহার ভগিনী যুবরাজ চতুষ্টয়ের মাতা, তিনি দারা ও মুরাদের পক্ষ-পরিত্যক্ত তাঁহাদের দলের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সমভিব্যাহারে ঔরঙ্গজেবের সকাশে উপনীত হইলেন। এখন মুরাদ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ঔরঙ্গজেবের কথিত কল্পিত সুখ সৌভাগ্যের অলীক মোহে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি যে ভুল করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিল মাত্র সময় নষ্ট করিলেন না। মুরাদ ভ্রাতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'তিনি যে ধন হস্তগত করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক প্রদান করুন, আমি গুজরাট অভিমুখে প্রস্থান করিব।' কিন্তু ঔরঙ্গজেব তদুত্তরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলা প্রয়োজন। তদনুসারে মুরাদ একটু সুস্থ হইয়া ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন যে, পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্য তোমারই প্রাপ্য। নবীন যুবরাজ এই আপাতমধুর বাক্যে একেবারে ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার এক সেনাপতি শাহ আব্বাস খাঁ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সাবধান করিলেন যে,

---

যশোবন্ত সিংহ (Joswant Sing) কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ঐ সালেরই জুন মাসে সামুঘরে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দারা স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য করেন। গ্রন্থকার এখানে এই শেষোক্ত যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ঠিক ও সুস্পষ্ট নহে। এই যুদ্ধের কৌতূহলোদ্দীপক বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ইলিয়ট (Vol, II) ও ডাউর (Dow's Hindustan Vol, III) ইতিহাস দেখিতে পারেন।

তাঁহাকে বিজড়িত করিবার অভিপ্রায়েই তৎসম্মুখে জাল বিস্তার করা হইতেছে। মুরাদ তাহাতে আস্থা স্থাপন করিলেন না। যখন সেনাপতির কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল, তখন আর সময় ছিল না। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বিনাশ করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একদা ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। মুরাদ যাইতে পারিবেন না বলিয়া যতই আপত্তি করিতে লাগিলেন, ঔরঙ্গজেব ভোজে যোগদান করিবার জন্য ততই তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুরাদ যখন দেখিলেন, তাঁহার ওজর গ্রাহ্য হইবে না এবং পাছে ঔরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার যে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করনার্থে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অদ্যই তাঁহার জীবনের শেষ দিন; ঔরঙ্গজেব বোধ হয় আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণপাখী অপহরণ করিবেন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন; কারণ তৎকালে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করা ঔরঙ্গজেবের লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিতে ও সিংহাসনের প্রতি ধাবিত হইবার পথ রুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। মুরাদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ভ্রাতৃভবনে প্রবেশ করিলে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বন্দী করতঃ নির্ব্বিঘ্নে গোয়ালিয়ার দুর্গে * প্রেরণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

মুসলমান-ছাত্রজীবন।

সংসারের এই কর্ম্ম কঠোর পরিশ্রান্ত জীবনে সুখময় ছাত্রজীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিলে সকলের মনেই একটু ক্ষণিক শান্তি ও প্রীতির সঞ্চার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু হতভাগ্য মুসলমানের পক্ষে তাহার অতীত ছাত্রজীবন-আলোচনা করিতে যাওয়া আর গলাধঃকৃত অকারণ অপমান ও লাঞ্ছনার পুনরভিনয় দর্শন করিয়া ক্ষুণ্ণমনাঃ হওয়া প্রায়ই সমান! আমাদের এই কথায় অনেকেই চমকিত ও বিস্মিত হইতে পারেন। এই জন্য আমরা 'কোহিনূরে'র

* মুরাদকে বন্দী করিয়া প্রথমতঃ দিল্লীর সন্নিকট সেলিমঘর নামক স্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। পরে তিনি গোয়ালিয়ারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কাফি খাঁর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণের সম্মুখে 'মুসলমান-ছাত্র-জীবন' সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া তাঁহাদের বিস্ময় দূর করিব, স্থির করিয়াছি।

ছাত্রজীবন নানা কারণে সুখদায়ক ও মূল্যবান। প্রথমতঃ সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা, দ্বিতীয়তঃ সহাধ্যায়ী ছাত্রগণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও শিক্ষক মহাশয় দিগের অকৃত্রিম ভালবাসা, তৃতীয়তঃ সাহিত্যের রসভোগ জনিত আনন্দে ছাত্র-জীবন মনোরম ও শান্তিময়। ছাত্রজীবনে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় বলিয়া ইহা মূল্যবান।

ছাত্রজীবনে সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা স্বাভাবিক। সকল ছাত্রই স্ব স্ব অবস্থানুসারে এই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ছাত্রগণের মধ্যে সখ্যভাব ও শিক্ষক মহাশয়ের ভালবাসা তাঁহাদের পরস্পরের উপর নির্ভর করে। সাহিত্যের রসভোগ তাহার কোমলতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে।

এক জাতীয় এক ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদের মধ্যে যতদূর সৌহৃদ্য, সহানুভূতি ও ঐক্য দৃষ্ট হয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন জাতীয় ছাত্রদের মধ্যে ততদূর সৌহৃদ্য, সহানুভূতি ও ঐক্য কদাচ পরিলক্ষিত হয় না বা হইতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের মধ্যে এই পার্থক্য প্রথমতঃ অনেক পরিমাণে কম হইলেও উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের মতে, শিক্ষা ও সাহিত্যের দোষই ইহার মূলীভূত কারণ।

বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা হইলেও সাধারণতঃ ইহা হিন্দুর ভাষাই বটে। ইহার সকল দিকেই তাঁহাদের লেখনীর প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আমরা যে সমস্ত স্কুলপাঠ্য ও সাধারণ পাঠ্য পুস্তক দেখি, তৎসমুদায়ই হিন্দুদিগের লিখিত। এখন দেখা যাউক, এই সকল পাঠ্যপুস্তক মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সর্ব্বথা সুবিধাজনক কি না? কারণ, সাহিত্য হইতেই প্রধানতঃ ছাত্র-জীবন গঠিত ও নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। আবার কদর্য্য সাহিত্যের ফল যে নিতান্ত বিষময় ও অবনতির মূলীভূত কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার যো টি নাই। এই জন্যই ইংলণ্ডের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সুধীপ্রবর কার্লাইল ছাত্রদিগকে গ্রন্থনির্ব্বাচন (Choice of books) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কালে সদ্‌গ্রন্থ ও কুগ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিতে দৃঢ় আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার উক্ত মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Discriminate between good books and bad books. In short, as I have written it down some where else, I conceive

that books are like men's souls; divided into sheep and goats, some few are going up and carrying us up heaven-ward; calculated, I mean, to be of priceless advantage in teaching; —in forwarding the teaching of all generations. Others—a frightful multitude are going down; doing ever the more and the wider and the wilder mischief. Keep a strict eye on that latter class of books, my young friends!"

"আমাদের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি হিন্দুদিগের লিখিত বলিয়া তৎসমুদায়ই হিন্দু-ভাবাপন্ন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠে মুসলমান ছাত্র স্বধর্ম্ম বিষয়ে কিছু জ্ঞান ত লাভ করিতেই পারে না; অধিকন্তু অনেকগুলি গ্রন্থে মুসলমানের অযথা নিন্দাবাদ দেখিয়া তাহাদিগকে মর্ম্মাহতই হইতে হয়! প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই মুসলমানের অযথা নিন্দা ও হিন্দুর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে হিন্দুকে দেবভাবে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, মুসলমান সেখানে পিশাচের চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।" সুতরাং হিন্দু ছাত্র যে পুস্তক পাঠে আপনাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠ মহাবল মহাজাতির অংশ বলিয়া মনে করে, মুসলমান ছাত্র সেই পুস্তক পাঠে আপনাদিগকে হেয় অসভ্য জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করে, এবং সংসারের উপেক্ষা-যোগ্য ভাবিয়া উদ্যমহীন হইয়া পড়ে। এই হেতুতেই শিক্ষিত মুসলমান যুবকবৃন্দকে হিন্দু যুবকদের ন্যায় উৎসাহশীল ও কার্য্যপরায়ণ দেখা যায় না। তাহারা সাহিত্য হইতে যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের স্বসমাজের বা স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাই থাকে না; বরং কতকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াই সংসার-রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া থাকে!

বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরদের জীবনী আছে। হিন্দুছাত্র তাঁহাদিগের জীবনী পাঠে, তাঁহাদিগের ন্যায় ধার্ম্মিক, কর্ম্মঠ ও জীবন্ত হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমান বালকেরা ছাত্রজীবনে কখন কোন মুসলমানের নাম গন্ধও প্রাপ্ত হয় না। অথবা কখন যদি কিছু পাওয়াই যায়, তাহা ত নরপিশাচ সিরাজ প্রভৃতির মতই বটে! সুতরাং এইরূপ নানা কারণ বশতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি মুসলমান ছাত্রের একরূপ কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ইহা মুসলমানের পক্ষে বিষাক্ত, অন্যদিকে হিন্দুর পক্ষে ইহা সুধা স্বরূপ বটে। হিন্দুছাত্রগণ তাহাদের স্বজাতীয় লেখকদিগের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে নানাবিধ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানজাতিকে একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে শিখিয়া থাকে।

মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্জাত হওয়ার পক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যই যে প্রধানতঃ দায়ী, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বই থাকে ; কিন্তু মাইনর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে যাওয়া মাত্রই সহসা দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে! প্রাণপ্রতিম হিন্দু-ছাত্রবন্ধুগণ যেন আদর করিয়াই তাহাদের মুসলমান ছাত্রবন্ধুদিগকে সময় সময় যবন, ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর প্রভৃতি শ্রুতিমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে থাকে। তখন বালসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ তাহারা এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিলেও স্বীয় পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানকে উক্তরূপ বিশেষণে ভূষিত দেখিয়া লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয় ; এবং মনে মনে হিন্দুদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইতে থাকে। জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উভয়ের মধ্যে এই বিদ্বেষ ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠে। কিন্তু স্কুলে মুসলমান ছাত্রের পক্ষপাতিতা করিবার কোন মা বাপ থাকে না বলিয়া, কিল খাইয়াও কিল চুরি করিয়া থাকা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। হিন্দু শিক্ষক মহাশয়ের কাণে তুলিলে পাঠ্য পুস্তক হইতে মুসলমানের দুশ্চরিত্রতার বিবিধ নজির আবির্ভূত হইয়া বেচারা মুসলমান ছাত্রকে একবারে নাকে খৎ ও 'তোবা' করাইয়া স্বীয় অভিযোগ প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করে! এখানে পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে এখন দু' একটি কথা বলা যাউক। বলুন দেখি,—

"একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন ;
সে ভাব থাকিত যদি,
পার হ'য়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন ?"

এই কবিতাটি পাঠ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র কে কিরূপ শিক্ষা লাভ করিবেন ও কাহার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইবে? বস্তুতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু লেখকগণ ইচ্ছা করিয়াই যে মুসলমান-হৃদয় প্রমর্দ্দিত ও পীড়িত করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বহুদূর যাওয়ার দরকার নাই। কেবল সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থ হইলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না, কিন্তু স্কুলপাঠ্য পুস্তক, যাহা সহস্র সহস্র সুকুমারমতি বালকে পড়িবে, তাহাতে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব বা সঙ্কীর্ণতার স্থান থাকিলে তাহার ফল বিষময় না হইয়া আর কি হইবে? পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ যে বেশী জাগিয়া উঠিয়াছে,

তাহা যে অনেকটা এই কারণেই, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। কেবল দেশের একপ্রান্তে এরূপ হইলেও স্বতন্ত্র কথা হইত। সমগ্র বঙ্গেই এরূপ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়াছে, ইহাই বিশেষ দুঃখের কথা! স্কুলপাঠ্য পুস্তক-গুলিই লোক-লোচনের অগোচরে দেশমধ্যে হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। একটি গ্রন্থের দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা কথাটি বিশদ করিতেছি। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ঘোষ বি, এ, প্রণীত 'নীতিগাথা' (৩য় ভাগ) কোন কোন স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। উহাতে হিন্দু মহিলা সম্বন্ধে আটটি ও নূরজাহান সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে। প্রাগুক্ত কবিতাগুলিতে যেরূপ নৈতিকভাব পরিস্ফুট, নূরজাহান কবিতায় ঠিক তাহার বিপরীত। বাস্তবিক এই কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, হিন্দুমহিলারা যেন দেবীরূপে ও মুসলমান রমণীগণ যেন পিশাচিনীরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এস্থলে 'চিন্তা' নাম্নী কবিতাটির প্রথম ও শেষ কয়েক ছত্র ও 'নূরজাহান' কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকমহোদয়গণ তুলনা করিয়া দেখুন।—

চিন্তা।

"যত কিছু ভারতের, রহিয়াছে গরবের,
ইতিহাস বর্ণিত বিষয়;
রমণীর প্রেমধর্ম্ম, অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম,
তুলনার অতীত নিশ্চয়।

* * *

এমন হৃদয় দান, নারীধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
কে কোথায় করিয়াছে আর?
ধন্য চিন্তা, ধন্য দেশ, যথা এত দুঃখ ক্লেশ,
সহে নারী ধর্ম্মে আপনার!"

নূরজাহান।

"ছিল শুধু রূপরাশি, ছিল গো তোমার—
অলৌকিক চিত্তহর প্রতিভা অপার!
এই শুধু অপরাধ;—তাতেই এমন
করিল সেলিম এক দুষ্কার্য্য সাধন।

বিদ্যুৎবরণ কান্তি ছিল যদি হায়!
ছিল না দাহিকা শক্তি সুষমা শিখায়?
ছিল যদি, তবে কেন সহি নির্য্যাতন,
করিলে না পাতকীর বিনাশ সাধন?"

পাঠক মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করি, এই কবিতাটি কি উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে? মুসলমান রমণীর আদর্শ খর্ব্ব করিবার জন্য নহে কি? ইহা পাঠ করিয়া মুসলমান ছাত্র ব্যথানুভব করিবে না কি?

মুসলমান ছাত্র যে এইরূপ সাহিত্য হইতে কত কষ্ট অনুভব করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না। মুসলমান ছাত্র বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে যে রসাস্বাদন করে, তাহা "রোগীর নিম খাওয়া" বই আর কিছুই বলা যাইতে পারে না!

আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত সমাজ নীরবে এই অত্যাচার দেখিয়া আসিতেছেন। হিন্দু ছাত্রের প্রতি এইরূপ অত্যাচার হইলে আজ বঙ্গদেশে মহা তোলপাড় উপস্থিত হইত। এই সেই দিন না বুয়র কংগ্রেস্ হইয়া গেল! তথাকার সাহিত্য ইংরাজী ভাবাপন্ন হওয়াতে তাঁহারা সভা সমিতি করতঃ প্রতিবাদ করিতেছেন ও মনোমত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত না হইলে ইংরাজ-পরিচালিত স্কুলে ছাত্র দিবেন না বলিয়া সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু বৃথা আক্ষেপ! সেই এক দেশ, আর এই এক দেশ! তাঁহারা ভুবনবিখ্যাত বুয়রজাতি, আর আমরা বাঙ্গালী (ভীরু) মুসলমান! অনেক দিবস অতীত হইল, এডুকেশন গেজেট (Education Gazette) নামক হিন্দু পত্রিকা খানিতে জষ্টিস্ আমির আলী মহোদয়ের History of the Saracens নামক গ্রন্থের সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। সম্পাদক মহোদয়ের মত :—"History of the Saracens পাঠে হিন্দু ছাত্রের কোন উপকার লাভ হয় না। সুতরাং ইহা বাদ দিয়া হিন্দুছাত্রের উপযোগী কোন Indian History পাঠ্য-ভুক্ত হউক।" তবেই দেখুন, হিন্দুমহোদয়গণ মুসলমান ছাত্রদের মস্তক চর্ব্বণ করিতে কতটা ব্যগ্র!

যাক্ ও সব বাজে কথা। সমস্ত পাঠ্য পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত দিতে হইলে এক বিরাট গ্রন্থ হইবে। সুতরাং আর ২।৪টি দৃষ্টান্ত দিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিবর হেমচন্দ্র রচিত কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। ইহা মুসলমানের ভারতের রত্নরাজি লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাই হিন্দু কবি আক্ষেপ সহকারে গাহিয়াছেন :—

"হিন্দু গর্ব্ব খর্ব্বকারী দুরন্ত যবন
ভারতের সর্ব্বস্ব করি বিলুণ্ঠন,
নিগ্রহিয়া বিগ্রহেরে নিধি নিল হ'রে,
হইল অলকা ভ্রান্তি গজনী নগরে!"

এই কবিতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে "দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়" নামক পাঠে আছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের নাম স্মরণ হইলেই গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! তাঁহার—"দাঁড়ারে, দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন" প্রভৃতি পদ মনে পড়িলে মুসলমান ছাত্রের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অজ্ঞাতসারে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। জানিনা আমাদের প্রিয় কবি কি জন্য মুসলমানের প্রতি এত নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন! যাঁহাকে দেবতুল্য, পিতৃতুল্য জ্ঞান করা যায়; তিনি "শালা" বলিয়া রঙ্গ করিলে তাঁহার পদমর্য্যাদার লাঘব হয় বলিয়াই মনে হয়।

এখন ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। স্কুলে যে সমস্ত ইতিহাস পঠিত হয়, তাহার ছত্রে ছত্রে মুসলমান বিদ্বেষ-বিষ প্রবাহিত! কথায় কথায় যবন শব্দ; এবং মুসলমান সম্রাট্ ও নবাব, এমন কি, আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতিও তুচ্ছার্থে শব্দ ব্যবহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেয়। বাঙ্গালার ইতিহাস নামক একখানি পুস্তক চতুর্থ শ্রেণীতে পঠিত হয়। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে লিখিত আছে;—"মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বল দ্বারা প্রচার করাও বিধেয়, এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বদেশীয়দিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন।"

এখন জিজ্ঞাসা করি, "হজরত" মহম্মদের পবিত্র নামের পূর্ব্বে 'মহাত্মা' শব্দ প্রয়োগ করিলে কি ঐতিহাসিকের সম্মানের লাঘব হইত? এইরূপ বেয়াদবী বড়ই দূষণীয়। আমরা প্রায় কোন পুস্তকেই মুসলমান সম্রাট্, নবাব এমন কি পরমা-রাধ্য প্রেরিত পুরুষের প্রতি সম্ভ্রমার্থক শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই না। ইহা বাস্তবিক হিন্দু গ্রন্থকারদের শৈথিল্য ও গর্ব্বান্ধতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহারা মনে করেন, এম্ এ, বি, এল্ কিম্বা বি এ, বি এল্ পাশ করতঃ মাসিক দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলেই, তাঁহারা মুসলমান সম্রাট্, নবাব, আমীর ওমরাহদের সমান হইলেন! এমন কি চুনীরাম, পুঁটীরাম পর্য্যন্ত মনে করেন যে, তাঁহারা সম্রাট্ শাহজাহান, আকবর ও আওরঙ্গজেব

প্রভৃতি হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোক। তাই তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহাদের আর সম্মান প্রদর্শন করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ হয় না। হিন্দু গ্রন্থকারগণ 'যবন' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করিলে যে কি ক্ষতিগ্রস্ত হন, বুঝি না। ইতিহাসে অগণিতবার "যবন সেনা" "যবন সৈন্য" শব্দরাজি দৃষ্ট হয়। ইহার পরিবর্ত্তে "মুসলমান সেনা" ও "মুসলমান সৈন্য" ব্যবহার করিলে কি তাঁহাদের বেদ অশুদ্ধ হয়, না মাথা ধরে? তাঁহাদের জানা উচিত, মানীর মান রক্ষা না করিলে নিজেরই ইতরতা প্রকাশ পায়।

উপসংহারের পূর্ব্বে এখানে শিক্ষক মহাশয়দের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, প্রণীত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে যথাক্রমে এই দুইটি মটো (Motto) দেখিতে পাই ;—

> "The future of mankind is in the hand
> of the nurse and the school master."
> "The future of mankind is in the hand of the
> school master."

স্কুল মাষ্টারের হাতেই যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়, তাহা প্রাচীন মুসলমানগণই বিশদরূপে বুঝিতেন। কিন্তু আজকাল মুসলমানগণের তাদৃশী বিবেচনা নাই। নতুবা "বাঘের হাতে ছাগল ভাগী দিয়ে" তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন কেন? বিজাতীয় শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইয়া স্বজাতীয়ত্ব আয়ত্ত করা কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্কুলের ছাত্রের এক অপবাদ আছে যে, তাহারা টুপি মাথায় দেয় না। কেন? মাদ্রাসার ছাত্রেরা ত এরূপ করে না। মুসলমান ছাত্রের নৈতিক অবনতি এতদূর যে, হিন্দু ছাত্রগণের উপহাসের ভয়েই অনেকে টুপি মাথায় দেয় না। অনেকে মুসলমানের (অনার্য্য যবনের) ঘরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়! হায় মুসলমান সমাজ, এরূপ National Peril (জাতীয় সঙ্কট) প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তুমি এখনও নীরব থাকিবে?

অনেক হিন্দু শিক্ষক মুসলমান বিদ্বেষ পোষণ করেন, সাহিত্যে মুসলমানের ঘটনা দেখিতে পাইলেই তাহাতে কিছু রং ফলাইয়া ব্যাখ্যা করেন। এতদুপলক্ষে হিন্দু ছাত্রবর্গ মুসলমানের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করতঃ হতভাগ্যদিগকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

একবার আমাদের জনৈক হিন্দু শিক্ষককে "রুম" কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে,

তিনি বিকট মুখভঙ্গীসহকারে বলিলেন,—"কে জানে কোথায় তোদের রুম্"। তাঁহার এই ঘৃণামিশ্রিত উক্তি এবং হিন্দুছাত্রদের উপহাস আমাদিগকে কতদূর মর্ম্মাহত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

পরিশেষে বক্তব্য, যাহাতে বিদ্যালয় হইতে উপরে বর্ণিতরূপ দোষগুলির সংশোধন হয়, তৎপ্রতি শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যদি আমাদের 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি' এবং 'শিক্ষা-বিষয়িণী মুসলমান সমিতি' এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারিব, "এয়্ছা দিন নেহি রহে গা।"

হাতিম উল্লা।

পারস্য হইতে হুমায়ুনের স্বরাজ্য-প্রবেশ। *

(১)

৯৫১ হিজরীতে (১৫৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট্ হুমায়ুন সিস্তান প্রদেশে উপনীত হইয়া তথায় একপক্ষ কাল অপেক্ষা করেন। কারণ, পারস্য হইতে প্রস্থানকালে পারস্যাধিপতি সম্রাটকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে পারস্য-সৈন্য-দল যাত্রা করিয়াছে, তাহারা সিস্তানে তাঁহার পরিদর্শন নিমিত্ত একত্রিত হইবে। শাহের এই আদেশানুযায়ী নানাস্থান হইতে পারস্য-সরদারগণ আসিয়া তথায় মিলিত হয়েন। সম্রাট্ সৈন্য-সংখ্যা গণনা করিয়া দেখেন যে, পারস্যাধিপতির প্রতিশ্রুত দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আগমন করিয়াছে। এই সকল সৈন্যদল পরিদর্শন করিয়া সম্রাট্ হুমায়ুন পারস্য-অধিনায়ককে বলিলেন,—

---

* 'তাজকেরাতুল-ওয়াকেয়াত' বা হুমায়ুন নামা অবলম্বনে লিখিত। পারস্য ভাষায় লিখিত এই ইতিহাসের গ্রন্থকর্ত্তার নাম—জোহর। তিনি সম্রাট্ হুমায়ুনের আফ্তাব্চি (জলসরবরাহকারী) ছিলেন। এই কার্য্যব্যপদেশে তিনি সর্ব্বদাই হুমায়ুনের সঙ্গে থাকিতেন। তদ্বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 'কোহিনুরে'র পাঠকবর্গকে এই গ্রন্থের কতিপয় ঘটনা যথাক্রমে শুনাইবার ইচ্ছা থাকিল। লেখক।

"এখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে বোস্ত দুর্গ * অবস্থিত। বোস্তকে সাধারণতঃ 'মদায়েন' (*Medain*) বলে। এখানে নওসেরওয়ানের (Nushirvan the Just) বাসস্থান ছিল। উক্ত বোস্ত দুর্গের বর্ত্তমান সেনাপতি—মীর খেলেজি (সম্রাটের ভ্রাতা) মির্জ্জা আসকারীর নিয়োজিত। আমার ইচ্ছা, আপনি তথায় যাইয়া দুর্গ ছাড়িয়া দিতে তাহাকে বলিবেন। যদি খেলেজি তাহাতে সম্মত না হয়, তবে আপনি তৎসহ সমস্ত দুর্গবাসীকে বিনাশ করতঃ বলপ্রকাশে দুর্গ অধিকার করিবেন।" এতদুত্তরে সেনাপতি বলিলেন,—"আমরা শাহের নিকট হইতে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনার এ প্রস্তাব তাহার বিপরীত।" সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ পুনরায় উত্তর করেন যে, 'আমি এ বিষয় শাহকে লিখিয়া জানাইব।'

সম্রাট্ বোস্তের সন্নিকট পঁহুছিলে, মীর খেলেজি গলদেশে একখানি ক্ষুদ্র বক্র তরবারি ঝুলাইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সম্রাট সদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাটও তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর হুমায়ুন কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি বৈরাম বেগকে দূতরূপে যুবরাজ কামরানের নিকট কাবুলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কান্দাহার দুর্গের অধিপতি যুবরাজ আসকারী দুর্গ প্রত্যর্পণ না করায় বিবাদ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই অনলে অনেকগুলি কর্ম্মচারী নিধন প্রাপ্ত হন; কিন্তু তথাপি দুর্গ সম্রাটের হস্তগত হইল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে প্রকৃত যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিয়া ব্যাটারি স্থাপন করিতে হইল। আলেক মির্জ্জা নামক সম্রাটের এক আত্মীয় ভ্রাতা যুবরাজ কামরান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শের আফগানের জিম্মায় রক্ষিত হয়। আলেক শেরকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করায় উভয়ে পলায়নপর হন। এই সময় তাঁহারা আসিয়া সম্রাট্ শিবিরে উপনীত হইলেন।

একদা সম্রাট্ একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের অবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গের অভ্যন্তরে একটি গৃহে যুবরাজের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতেছে। হুমায়ুন তথা হইতে মন্ত্রণা-গৃহ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে আদেশ পালিত হইল। গোলা যাইয়া মন্ত্রণা গৃহের কার্ণিশে

* হীরমন্ত নদীর তীরে অবস্থিত। (About 32, 20 N. Lat.)

পড়িলে দুর্গের সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। সৈন্যগণও ইহাতে অত্যন্ত ভীত হয়।

এই সময় যুবরাজ কামরান (হুমায়ুনের অন্যতম ভ্রাতা) কাবুল হইতে সম্রাট্ বাবরের ভগিনী খোর্‌রমজাহানকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখেন যে, তিনি যেন মির্জ্জা আসকারীর সহিত সম্রাটের মিট্‌মাট করিয়া দেন। তদনুসারে উক্ত মহিলা আসকারীকে ক্ষমা করিতে হুমায়ুনকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে সম্রাট্ আসকারীকে ক্ষমা করিলে তিনি দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া সম্রাটের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন (কদম বুসি) করেন।

যাহা হউক, কান্দাহার অধিকৃত হইলে পারস্য সেনাপতি তাঁহার প্রভু শাহতামসের জন্য তথাকার ধন রত্নাদি দাবী করেন;* এবং তাহা না দিলে যুবরাজ আসকারীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিতে জিদ্ করেন। সম্রাট্ এই দাবী অস্বীকার করতঃ বলেন যে, সখ্যের পরিচয় স্বরূপ কিছু টাকা শাহের নিকট প্রেরিত হইবে। অতঃপর তিনি নিজের সমস্ত অনুচর (তন্মধ্যে গ্রন্থকার জোহর আফতাবচিও ছিলেন) এবং কতিপয় পারসীক্ সমভিব্যাহারে দুর্গে প্রবেশ করতঃ মির্জ্জা আসকারীর গৃহে গিয়া সমস্ত ধন রত্নাদি বাহিরে আনিয়া গণনা করিতে আদেশ করিলেন। গণনা শেষ হইলে হুমায়ুন পারস্যাধিপতির পুত্র, কামরানের শাসনকর্ত্তা শাহকুলী খাঁ, সেনাপতি বাদসা খাঁ, সেন্‌জারের শাসনকর্ত্তা হোসেন স্বলতান এবং সিস্তানের সেনাপতি আহম্মদ স্বলতানের সম্মুখে ধনাদি সিন্ধুকে বন্ধ করতঃ নিজের ও পূর্ব্বোক্ত অধিনায়কগণের মোহর অঙ্কিত করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তৎপর তাহা উক্ত ব্যক্তিগণের জিম্মায় রাখিয়া দুর্গত্যাগ করিলেন।

পারস্য সেনাপতি তৎপর কেবল যে ঐ সকল ধনাদি পারস্যে পাঠাইবার জন্য জিদ্ ধরিলেন, তাহা নহে; তিনি তৎসহ মির্জ্জা আসকারীকে ধৃত করতঃ তাহাদের নিরাপদে স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিভূ স্বরূপ শাহতামসের নিকট প্রেরণ নিমিত্তও বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন।

পারস্য সেনাপতির এই বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ হুমায়ুন তাঁহার

---

* হুমায়ুনের সহিত পারস্যাধিপতির বন্দোবস্ত হয় যে, ভবিষ্যতে কান্দাহার পারস্য-শাহের রাজ্যের অন্তর্গত হইবে।

নিজের সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় বহুতর হিন্দুস্থানী তাঁহার সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিল। ইহারাও সম্রাটের আদেশ মত তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইল। এই ঘটনায় পারসীক্‌গণ ভীত হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল,—"আমাদের প্রতি সম্রাটের অভিসন্ধি ভাল নহে। তাঁহার পিতা বাবর নেজাম বেগকে যেমন উজ্‌বেগদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন। কারণ, উজ্‌বেগগণ নেজামকে বধ করে।" পরে তাহারা ধনরত্নাদি দ্বাদশ ক্রোশ দূরে প্রেরণ করে এবং অনবরত পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে তাহা শাহতামসের হস্তে অর্পণ করে। শাহ্ ধন পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও একখানি মূল্যবান তরবারী সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দেন। হুমায়ুন আদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুর্গ পারসীক্‌দিগের হস্তে অর্পণ করিয়া সম্রাট্ কান্দাহার পরিত্যাগ করতঃ খুলজি বাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া একমাস অবস্থান করেন। কিন্তু এত দিন কান্দাহারের নিকটবর্ত্তীস্থানে সম্রাট্ অবস্থান করায়, পারস্য সেনাপতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার শিবিরের রসদ সংগ্রহের পথ রোধ করিবার আয়োজন করিলেন।

এই অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সম্রাট মন্ত্রিগণকে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, সর্ব্ব প্রথম আমাদের সমস্ত লোকের আরোহণ জন্য অশ্ব সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; এবং সকলেই অবগত আছেন যে, পারস্য সৈন্যগণ কতিপয় ব্যবসায়ীর নিকট তাহাদের অশ্বসমূহ বিক্রয় করিয়াছে। ব্যবসায়িগণ এখন অশ্বাদিসহ কান্দাহারের দুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছে। প্রথমে তাহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত। উক্ত পরামর্শানুসারে সম্রাট্ কতিপয় সেনানায়কের সঙ্গে কান্দাহারে দ্রুত অগ্রসর হইয়া বণিকদিগের নিকট হইতে সপ্তদশ শত অশ্ব ছিনাইয়া লইয়া শীঘ্রগতিতে মধ্যরজনীতে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে সমস্ত অশ্ব রাজকীয় চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া বণিকদিগকে আহ্বান করিয়া দলিল (Bond) লিখিয়া দিলেন যে, প্রথম সুযোগেই তাহাদিগকে অশ্বের মূল্য প্রদান করা হইবে। অতঃপর তিনি দেড় শত অশ্ব যুবরাজ হিন্দাল (সম্রাটের অন্যতম ভ্রাতা) ও যোদগার মির্জ্জার জন্য

নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবশিষ্টগুলি পদমর্য্যাদানুসারে অপরাপর সেনাপতিগণের মধ্যে বিতরিত করিয়া দিলেন।

(২)

এইভাবে অশ্ব বণ্টন করিয়া সম্রাট্ কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় তিনি গোপনে সংবাদ পাইলেন যে, পারস্যের নবীন যুবরাজ * কান্দাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রি-সভা আহ্বান করিয়া দুর্গ পুনরধিকারের চেষ্টা করা স্থির করিলেন। কি ভাবে কার্য্য করা প্রয়োজন, সম্রাট্ তাহা জানিতে চাহিলে হাজী মহাম্মদ খাঁ কুফি বলিলেন,—"এ বিষয়ের ভার আমার প্রতি অর্পিত হউক। আমি সমস্ত ঠিক করিব।" সম্রাট্ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হাজী মধ্য রজনীতে একদল নির্ব্বাচিত সেনা লইয়া কান্দাহারে প্রস্থান করিলেন এবং প্রত্যূষে যখন সহরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তখন অকস্মাৎ পারসীকগণকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সেনাপতি বাদসা খাঁ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সম্রাট্ কান্দাহারের অনতিদূরে উপনীত হইয়া হাজী মহাম্মদের একজন ভৃত্যের মুখে তাহার প্রভুর বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া নগর অধিকারে হর্ষ প্রকাশ করিলেন। সম্রাট্ কান্দাহারে উপনীত হইয়া আক্‌সাই বরুজে (Akshai Bastion) আশ্রয় লইয়া পারস্য সেনা-নায়ককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,—কেন তিনি যুবরাজের মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন? যুবরাজের পিতা যুবরাজকে যখন আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, তখন আমি তাঁহাকে নিজ পুত্রের ন্যায় বিবেচনা করি; এবং উপযুক্ত সময়ে আমাকে জানান হইলে আমি নিজে আসিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতাম। সম্রাট্ আরও বলেন,—"আমি তোমাকে দ্বারের বহির্ভাগে যাইতে এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেও দিব না। কারণ, আমার আশঙ্কা হয়, মোগলেরা তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে। কিন্তু তুমি আমার কোন ক্ষতির উপায় চিন্তা না করিয়া প্রস্থান করিতে পার।" এই ইঙ্গিত পাইয়া বাদসা খাঁ

---

* গ্রন্থকার যুবরাজের নামোল্লেখ করেন নাই; কিন্তু Dow তাঁহার History of Hindustan গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—যুবরাজের নাম মুরাদ।

রজনীযোগে দুর্গের পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নীরবে পলায়ন করেন।

সম্রাট্ কান্দাহার জেলা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিভাগ করিয়াছিলেন। পারসীক্‌গণ রবি কিস্তির (বাঙ্গালা চৈত্র কিস্তি) খাজানা আদায় করায় সম্রাট্ প্রজাগণের সন্তুষ্টির নিমিত্ত অবশিষ্ট তিন কিস্তির খাজানা আদায় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি বেগমদিগকে তাঁহাদের অনুচরীগণসহ বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে দুর্গে রাখিয়া স্বয়ং কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি যুবরাজ কামরান মির্জ্জার সরদার-গণের নিকট হইতে অনেকগুলি পত্র পান। সকলেই পত্রে তাঁহার আগমনে রাজভক্তি প্রকাশ ও শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করেন। সম্রাট্ আলেক মির্জ্জার জায়গার হেজারা পর্ব্বতে অবস্থিত তিরি সহরে উপনীত হইলে যুবরাজ হিন্দল ও তার্দ্দিবেগ আসিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন।

এই স্থানে সংবাদ পাওয়া যায় যে, যুবরাজ কামরান সসৈন্যে কাবুল হইতে যাত্রা করিয়া গিরিবর্ত্মসমূহ অধিকার করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে সম্রাট্ সৈন্য-গণকে সুসজ্জিত করিয়া কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। ইহার অনতিবিলম্বে সংবাদ আইসে যে, যুবরাজের সেনাপতি কাসিম বার্লাস যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আস্ (হেমার) গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। সম্রাট্ বিপুলবাহিনীসহ বিদ্রোহিদমনার্থ হাজী মোহাম্মদকে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। সম্রাট্ সৈন্য পূর্ব্বোক্ত ঘাঁটিতে পঁহুছিয়া অমিত বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বেই রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সম্রাট্ হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করিলেন। সম্রাট্ ঘাঁটিতে আসিয়া পঁহুছিলে সমস্ত কর্ম্মচারিগণ এই বিজয় সংবাদ জানাইয়া হর্ষপ্রকাশ করিল।

এই সময় কতিপয় সরদার যুবরাজ কামরানকে ক্ষমা করিবার জন্য সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে সম্রাট্ বলেন, "আচ্ছা, যাওয়া যাক্; দেখি পরে আর কি ঘটে। তারপর এ বিষয়ের মীমাংসা করিব।" তৎপর সম্রাট্ বিজয়-বাদ্য বাজাইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এই পর্য্যটনের সময় আলাকুলি সম্রাট্ সদনে উপস্থিত হইয়া সজলচক্ষে বলিলেন, সর্ব্বশক্তিমানের আহ্বান ক্রমে তাঁহার পিতা হায়দার সুলতান চলিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সম্রাট্ কুলিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ভগবানের

ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমি তোমার পিতা হইব এবং তোমার তথ্য তল্লাস লইব। দুঃখ করিও না। প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য কর।” সম্রাটের এবম্প্রকার সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া যুবক স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট্ খোজে বস্তান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সে স্থান হইতে উক্ত স্থান তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান।

খোজে বস্তানে দুইজন সাধু পুরুষের সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা যুবরাজের সহিত সম্রাটের শান্তি সংস্থাপিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া সম্রাট্ অতি স্নেহার্দ্রভাবে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন। পরে তাঁহাদের সহিত একত্রে প্রাতঃকালীন উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। সাধুদ্বয় প্রস্থান কালে বলিয়া যান,—“সন্ধি-স্থাপন করা আমাদের ইচ্ছা। যুবরাজ কামরান যদি আমাদের উপদেশ গ্রাহ্য করেন, তবে দ্বিপ্রহরের মধ্যে আমরা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা না আসিলে সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইবে।” কিন্তু সাধুদ্বয় যুবরাজকে নত করিতে না পারায় আর ফিরিলেন না। তাঁহাদের উপস্থিতির নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে, সম্রাট্ যুদ্ধ-পোষাক-রক্ষাকারী রোসেঙ্গকে দিয়া যুবরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—“আমরা পথিক, তুমি এখানকার অধিবাসী। তুমি যদি আমাদিগের অভ্যর্থনা কর, তবে তাহা রীতি-সম্মত কার্য্য হইবে। যদি না কর, আমরা নিজেই তোমার নিকট যাইব।” যুবরাজ আদরে রোসেঙ্গের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তৎকালে স্নান করিতেছিলেন; তজ্জন্য মুখেই বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি আসিতেছি।”

রোসেঙ্গ কামরানের শিবিরে দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগের অবস্থা ভাল নহে; তাহাদের অনেকেই কাবুলে পলায়ন করিতেছে। তিনি বিদায়ের অনুমতি না লইয়াই সম্রাটের নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ যুবরাজ হিন্দলকে সাতশত বর্শাধারী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও একখানি বর্শা ধারণকরতঃ সৈন্যদলের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সম্রাট্ কামরানের সরদারগণের ডেপুটেসন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ও সম্রাটের অধীনতায় কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিতে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

হজরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

আমাদের হজরত মোহাম্মদ (দং) মস্তফার যে সকল ভক্ত ও ধর্ম্ম-প্রাণ আছহাব ছিলেন, তন্মধ্যে হজরত বেলাল একতম। নীচ হইতে কেমন করিয়া উচ্চ হওয়া যায়, কেমন করিয়া ধর্ম্মগুরুকে ভক্তি করিতে হয়, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়া কেমন করিয়া ধর্ম্মে স্থির থাকিতে হয়, তাহা হজরত বেলালের জীবনীতে শিক্ষা পাওয়া যায়। আজকাল আমাদের মুসলমান সমাজে উপরোক্ত গুণসমূহের নিতান্ত অভাব অনুভব করিয়া এস্থলে হজরত বেলালের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দুঃখের বিষয়, হজরত বেলালের আদি বিবরণ আমার নিকট সুবিদিত নহে। তবে তিনি যে উম্মিয়া নামক একজন প্রতিমা-পূজকের ক্রীতদাস ছিলেন, এই মাত্র জানি। উম্মিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত বিবিধ কারু-কার্য্য-খচিত বহুসংখ্যক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনার জন্য স্বীয় দেবালয়ে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক সেই সমস্ত প্রতিমার অর্চ্চনা করিতেন। উক্ত দেবালয়ের পরিচর্য্যার জন্য উম্মিয়া হজরত বেলালকে পরিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশেই তাঁহাকে প্রতিমার পরিচর্য্যা করিতে হইত; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় বা সন্তুষ্টচিত্তে সেই কার্য্য করিতেন না। যে সময়ে হজরত বেলাল দেবালয়ে প্রতিমার পরিচর্য্যা করিতেন, ঠিক সেই সময়েই নূরনবী হজরত মোহাম্মদ (দং) আরবে 'দীন ইসলাম' প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার ওয়াজ নছিহতে কত শত অন্ধ নরনারীর ভ্রম বিদূরিত হইতেছিল! কত লোক প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিতেছিল! কত লোকের অন্ধকার হৃদয়ে ধর্ম্মের বিমল রশ্মি প্রবেশ করিয়া অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল! হজরত বেলালও এই সময়ে এক ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া বিশ্বাসী হয়েন এবং হজরতের শিষ্যত্ব স্বীকার করত প্রতিমা-পূজাকে ঘৃণা করিয়া অভিশাপ দেন। হজরত বেলাল মোসলমান হইলে, তাঁহার মুনিব উম্মিয়া তাহা জানিতে পারেন। অতঃপর তিনি একদিন হজরত বেলালকে ডাকিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করেন যে, "হে বেলাল! তোমার খোদা কে? তুমি কাহার উপাসনা করিয়া থাক?" ইহাতে তিনি অটল অচল পর্ব্বতের

ন্যায় নির্ভীক-চিত্তে উত্তর করিলেন, "যিনি সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি-কর্তা, যাঁহার আদেশে বিশ্ব-সংসার নিয়মিতরূপে চলিতেছে, রবি-শশী যাঁহার আদেশে কিরণ বিতরণ করিয়া জীব সকলের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে, 'যিনি এক, যাঁহার কেহ অংশী নাই, যাঁহার তুল্য অন্য আর কেহ নাই, আমি সেই খোদা-তালারই উপরে বিশ্বাস করিয়া 'দীন ইস্‌লাম' কবুল করিয়াছি; আর অসার কাল্পনিক কুফরী (পৌত্তলিক) ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। যে প্রতিমা হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিতে কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারে না, যাহারা সেই অচেতন জড় পদার্থের উপাসক, নিশ্চয়ই তাহারা ভ্রান্ত এবং সত্য ঈশ্বর হইতে বহুদূরে অবস্থিত।" পুনরায় উম্মিয়া হজরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্বচক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া অদৃশ্য খোদাতালার উপাসনা করিয়া থাক? প্রত্যক্ষ বস্তু না হইলে কখনই ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না। তুমি অদৃশ্য ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমাকে অর্চ্চনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে; নতুবা তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব। যদি মঙ্গল চাও, তবে আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর।" তখন হজরত বেলাল বলিলেন, "আমি তোমার শাস্তির ভয়ে কখনও জীবন্ত খোদাতালাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার। খোদা-তালাতে বিশ্বাস করিয়াছি, এইজন্য যদি আমার প্রাণও যায়, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল।" ইহাতে উম্মিয়া ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া হজরত বেলালকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি কঠিন প্রহারে প্রহৃত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে অন্য দিন উম্মিয়া বেলালকে ডাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্‌রে গোলাম! তোর খোদা কে?" তিনি পূর্ব্বদিনের ন্যায়ই নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিলেন। ইহাতে উম্মিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হজরত বেলালকে আবার প্রহার করিতে লাগিলেন। বাবুলের কণ্টকময় ছড়ি দিয়া মারিতে মারিতে সর্ব্বাঙ্গ রক্তে রক্তাক্ত করিয়া দিলেন। আহা! সেই ক্ষত বিক্ষত শরীর দিয়া রুধির ধারা বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু এত প্রহার করিয়াও উম্মিয়া তৃপ্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে গরম বালির উপরে শোয়াইয়া বক্ষঃস্থলে সুবৃহৎ প্রস্তর দিয়া রাখিলেন; তথাপি হজরত বেলাল কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহার এত দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা কিসের জন্য? কেবল ইস্‌লামের জন্য। যদি তিনি ইস্‌লামকে অবিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে কখনই উম্মিয়া তাঁহাকে এত কষ্ট দিতেন না।

বিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়াই তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন ও খোদা-তালাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, চিরকাল কিছুই থাকে না। খোদাতালাকে বিশ্বাস করিলে, তাঁহাকে ভক্তি করিলে, বিপদে পড়িয়া, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি যে নিশ্চয়ই দুঃখীর আর্ত্ত-নাদে কর্ন-পাত করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হজরত বেলালের প্রতিও তিনি সদয় হইলেন। উম্মিয়া হজরত বেলালকে যে দুই একদিন প্রহার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি নিত্য নিত্য নুতন নুতন শাস্তি দিতেন। কখন কণ্টকের ছড়ি দিয়া প্রহার করিতেন; কখন তপ্ত বালির উপর শোয়াইয়া রাখিতেন এবং কখনও বা বক্ষঃস্থলে প্রস্তর চাপাইয়া ফেলিয়া রাখিতেন। পিপাসায় জলের জন্য কিংবা ক্ষুধায় অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিলেও কেহ ফিরিয়া চাহিত না।

একদিন উম্মিয়া অত্যন্ত প্রহার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী প্রস্তর চাপা দিয়া হজরত বেলালকে শোয়াইয়া রাখিয়াছেন। তিনি আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খোদাতালার নিকটে পানা (আশ্রয়) চাহিতেছেন; ইতিমধ্যে হজরত আবুকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি উম্মিয়ার বাটীতে কান্নার আওয়াজ শুনিয়া কোন একজনকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উম্মিয়া বেলাল নামক স্বীয় দাসকে শাস্তি দিতেছেন। উম্মিয়া নিত্য নিত্য মার-পিট করিয়া বেলালকে ফিরাইতে চাহেন, কিন্তু পারেন না। হজরত সিদ্দিক লোকমুখে যাহা যাহা শুনিয়া ছিলেন, উম্মিয়ার বাটীতে যাইয়াও ঠিক তাহাই দেখিলেন। পরে তিনি উম্মিয়াকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি গোলাম বেলালকে অকারণ প্রহার করিতেছ? মারা অপেক্ষা বিক্রয় করা কি ভাল নহে? ইহা শুনিয়া উম্মিয়া বলিলেন, "আপনি যদি ক্রয় করিতে চাহেন, তবে কত মূল্য দিবেন, বলুন।" ইহাতে হজরত সিদ্দিক বলিলেন, "তোমার গোলামের মূল্য কত লইবে তুমিই বল না।" তখন উম্মিয়া বলিলেন, "আপনার 'নাস্তায়াজ' নামক যে রুমী দাস আছে, যদি তাহাকে দিতে পারেন, তবে আমি বেলালকে দিতে পারি।" 'নাস্তায়াজ' বিশেষ পরিশ্রমী ও কার্য্য-পটু ছিল বলিয়াই উম্মিয়া তাহাকে লইতে ইচ্ছুক হইলেন। হজরত সিদ্দিক 'নাস্তায়জ' কে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং প্রত্যেক বৎসর দশ সহস্র দিনার (স্বর্ণ-মুদ্রা বিশেষ) সহ তাহাকে বাণিজ্য-করণার্থে বিদেশে পাঠাইতেন। যখন উম্মিয়া বেলালের পরিবর্ত্তে 'নাস্তায়াজ' কে চাহিলেন, হজরত সিদ্দিক 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে আনিয়া দিয়া বেলালকে লইলেন। 'নাস্তায়াজে'র নিকটে যে মুদ্রাদি ছিল তাহা আর ফিরাইয়া লইলেন না। হজরত আবুবকর সিদ্দিক হজরত বেলালের

হস্ত-ধারণপূর্ব্বক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মস্তফার সন্নিকটে গিয়া সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন।

হজরত রসুলে করিম (দঃ) শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং হজরত আবুবকরের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপর হজরত সিদ্দিক হজরত বেলালকে লইয়া হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে দান করিলাম। ইহার উপর আমার আর কোন দাবি-দাওয়া নাই।" হজরত, বেলালকে বলিলেন, "আমিও তোমাকে স্বাধীন করিয়া দিলাম; তোমার যথা ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও।" বেলাল তখন বলিলেন, "আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইব? যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন হুজুরের খেদমত করিব।" সেই হইতে হজরত বেলাল হজরত রসুলে করিমের সেবা করিয়া আসিতে ছিলেন। পরে হজরত তাঁহাকে মদিনার মস্‌জিদের 'মোয়াজ্জেম' নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার গলার আওয়াজ অতি উচ্চ ও মিষ্ট ছিল এবং তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও খোদা-পরস্ত (ঈশ্বর প্রেমিক) ছিলেন।

হজরত মোহাম্মদ মস্তফার (দঃ) ওফাতের (দেহত্যাগের) পর মদিনায় অবস্থিতি করা হজরত বেলালের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি শোকে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া তুরস্ক দেশে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ বর্ণের কম্বল পরিধান করিয়া তথায় দিবানিশি কেবলই রোজা করিতেন। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি কাহার জন্য দেওয়ানার (উন্মত্তের) অবস্থাতে ভ্রমণ করিতেছ? কাহার বিরহে অহোরাত্র রোদন করিতেছ?" তিনি তাহাতে কোন উত্তর না দিয়া কেবল রোদনই করিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অনাহারে ও অনিদ্রায় রোদন করিয়া, তিনি এক রাত্রিতে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ মস্তফা (দঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন :—

"কি কারণে ছাড়িয়াছ সান্নিধ্য আমার?
কি কারণে হেথা এ'লে ময়দান উপর?
কি কারণে হেথা এ'লে দেওয়ানার হালে?
কি কারণে মদিনায় আমাকে ছাড়িলে?
হোশ কর, উ'ঠে চলো, না কাঁদিও আর।
তোমার কারণে আমি হৈয়াছি কাতর॥
সত্বরে উঠিয়া যাও মদিনা ভুবন।
গাফিলেতে এই হালে না কর শয়ন॥"

হজরত বেলাল এই স্বপ্ন-দর্শন করিয়া ব্যাকুল অন্তরে রোদন করিতে করিতে মদিনাতে চলিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হজরতের 'হুজর-খানার' কপাটে চুম্বন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন :—

"নূরনবী মোহাম্মদ সালাম আমার।
দরজায় খাড়া দেখ গোলাম তোমার॥

উঠে দেখা দাও মোরে ডাকি হে কাতরে।
তোমার লাগিয়ে প্রাণ কাঁদে নিরন্তরে ॥"

হজরত বেলালের রোদন-ধ্বনি শুনিয়া একে একে মদিনার সমস্ত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। পরে ইমাম হাসেন ও হোসেনও আসিলেন। দুই ভাই ইমামকে দেখিয়া হজরত বেলাল বিবি ফাতেমা-তোজ্জোহরার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ফাতেমা বিবি পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া বেলাল শোক-সাগরে নিমজ্জিত হন এবং "হায় দয়াময়ী মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে থাকেন। পরে জোহরের নমাজের সময় হইলে সকলে বেলালকে আজান দিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "ভাই বেলাল, হজরতের অন্তর্দ্ধানের পর আর তোমার মধুর 'আজান' শুনি নাই। অতএব আজ তুমি একবার 'আজান' দাও"। হজরত বেলাল তাহার উত্তরে বলেন, "ভাই সকল! আমি যখন 'আজানের' মধ্যে বলিতাম "আশ্‌হাদো-আন্‌ মোহাম্মদরসুলাল্লা" (আমি সাক্ষ্য দেখিতেছি যে, মোহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত), তখন আমার সম্মুখে হজরত উপবেশন করিয়া থাকিতেন; এবং আমি উপরোক্ত কালামের মধ্যে অঙ্গুলির ইসারা দ্বারা হজরতকে দেখাইয়া দিতাম। হায়! ভাই সকল, আজ আর কাহাকে দেখাইব? যাহা হউক, পরে হজরত ইমাম হাসেন ও হোসেন অনুরোধ করিলে, তিনি মিনারার উপরে গিয়া 'আজান' দিতে আরম্ভ করেন। বেলালের 'আজান' শুনিয়া মদিনার লোকসকল তথায় জমা হইল। "আশ্‌হাদো-আন্‌ মোহাম্মদরসুলাল্লা" ধ্বনি শুনিয়া লোক সকল কাঁদিয়া আকুল হয় ও অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। হজরতের মৃত্যু-দিবসের ন্যায় লোকের শোকাবেগ বৃদ্ধি হয়। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার তুরস্কে চলিয়া যান কিন্তু প্রতি বৎসর একবার মদিনায় আসিয়া হজরতের সমাধি-দর্শন ও আজান প্রদান করিতেন। তুরস্কেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হজরত বেলাল প্রথমে গোলাম হইলেও বিশ্বাসের গুণে হজরতের প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন। ভয়ানক বিপদে পড়িয়াও তিনি সত্য ধর্ম্মে স্থির-ছিলেন। হজরতের উপর তাঁহার কেমন ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আমরাও যদি সকলে হজরত বেলালের অনুকরণ করি, তাহা হইলে ইহ-পরকালে যে আমাদেরও নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শেখ জমিরুদ্দীন।

প্রভাতী গীতি। *

১

ওগো দুঃখিনি! ওগো জননি!
ওগো সন্তানচয়পালিনি!
হের, তোমার প্রাচীগগনে ওই উষা জেগেছে হরষে!
ঘোর দুর্য্যোগ তিমিরে দলি,
কত কত যুগ গিয়াছে চলি,
আজি তরুণ প্রভাত নিখিলকিরণ-রশ্মিরেণু-পরশে!
আজি বিশ্ব জেগেছে,—জেগেছ মা তুমি, তনয় জেগেছে উরসে!

২

অরুণ-কিরণ-পরশ লাগি'
যেমনি মা তুমি উঠেছ জাগি,'—
কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়াছে আহ্বান উছল প্রভাতবাতাসে!
শত নিকুঞ্জে ফুটেছে ফুল,
টুটে' গেছে যত স্বপন-ভুল,
কোটি সন্তান তুলিয়াছে শির মুক্ত উদার আকাশে!

৩

কর্ম্মঘোষণা ঘোষেছে ভবে,
আর কি মানব নীরবে র'বে?—
সপ্ত উদধি ত্রয়োদশ নদী বিন্দু কি আর গণে সে?
দিক দিক হ'তে রতন খনি
লুণ্ঠনে দিবে ভাণ্ডারে আনি'
অপহৃত তব বিত্তসকল নিত্য নিযুত রণেশে!

৪

হের, সুপ্তি-উত্থিত সন্তানগণ
কর্ম্মে কঠোর করেছে পণ,
তূর্ণ ছুটেছে মরণ ঠেলি'—পূর্ণ সুতেজে উল্লাসে!

---

* 'সন্তান-সঙ্ঘে' পঠিত ও গীত।

আজি মা! সাধনা পূরণ হ'বে,—
স্বপন সে আজি সত্য ভবে ;—
সহস্রযুগ-পোষিত বাসনা-প্রসূন আজি ফুল্ল সে!

৫

শত লাঞ্ছনা যা'বে মা দূর,—
দ্রুত জাগিছে অশেষ শূর
তব শিক্ষা-দীক্ষিত,—তব বজ্রগরজ উচ্ছ্বাসে!
সুপ্ত আত্মা পেয়েছে প্রাণ,
উদ্বোধনে গেয়েছে গান ;—
হের, বিচ্ছুরিত ত্রিদিব-জ্যোতিঃ নিখিল ভুবন উদ্ভাসে!

৬

হোথা মা খুলেছে রমার দ্বার,
ভাণ্ডার-ভরা রতন সার,——
চিরজাগরণ আভাষ দিয়া জ্বলে কি উজল আভাসে!
ওই যে পতাকা উড়িছে শত
তব অঞ্চল-নেত পৎ-পত—
বসন, ভূষণ, সজ্জা সকলি নির্ম্মিত তব স্ববাসে!

৭

দ্বেষ হিংসা বিরোধ নাশি'
ভ্রাতা অযুত মিলেছে আসি'—
তোমা জননী বলিয়া চিনিয়াছে আজি ; প্রাণ গদ্গদ আবেশে!
কন্যা তোমার ধন্যা কোটি,
শক্তি-সমান উঠিছে ফুটি'—
আজি, দীপনমন্ত্রে সন্ততি-চিতে কর্ম্ম-শকতি প্রবেশে!

৮

নগরে নগরে উঠেছে রোল,
পল্লীময় মহা কল্লোল,—
চিন্তাচকিত সকল ধরা—সিন্ধু-সুপার দুর সে!
শত বিস্ময়ে হেরিছে সবে,—
কম্পিত করি' নিখিল ভবে
'জগন্মান্যা জননী ধন্যা!'—ধ্বনে সপ্তকে সুর সে!

৯

রুদ্ধ নির্ঝর খুলে গেছে আজি,—
শেখরে ক্ষেত্রে হাসে দ্রুমরাজি,
তটিনী ছুটেছে উচ্ছ্বল স্রোতা প্রেম-কল্‌কল সুভাষে!
সাগরময় উঠেছে গান
ঊর্ম্মি-নৃত্যে জলদ-তান,—
কিরণোজ্জ্বল চুমিছে তায় নভ ; কি মোহন শোভা সে!

১০

আজি শ্যাম প্রান্তরে বোধন তব,
হর্ম্ম্যে কুটীরে উৎসব নব,—
আজি রোদন গত ;—গোধন-কৃষি-শিল্প বিভব বিকাশে!
হাস মা ঢালিয়া আশীষ-সুধা!
হ'ক মা ধরণী অমিয়াপ্লুতা!—
তনয়-জঠরে অনলক্ষুধা মিটাও অশন প্রকাশে!

১১

হাস মা! আর্য্য তনয় তব
যুগান্তে আজি করে অনুভব
তপ্ত প্রবাহ হৃদয়-রক্তে প্রাণ-সঞ্চার নিশ্বাসে!
সর্ব্ব অপূত চরণে দলি'
আর্য্য-গরব উঠেছে জ্বলি,'——
আজি লক্ষ জীবন প্রস্তুত বলি (এ) যজ্ঞ-বহ্নি-বিশ্বাসে!

১২

ক্লৈব্য তন্দ্রা আজি ছারখার ;
শোন পৌরুষ ছাড়িছে হুঙ্কার,—
দ্রুত জাগরণ—দুর্দ্দম পণ ভুবন-ঘন সন্ত্রাশে!
গুপ্ত মন্ত্র প্রকটি' আজি
উ'ধারি' লুপ্ত যন্ত্ররাজি
উদিত অতীত আর্য্যযুগ সদ্য পতন সংগ্রাসে!

১৩

তপোবনভূমে বেদ উচ্চারণ,
তুঙ্গ বেদী' পরে কোরাণ পঠন,——

সেই ধ্বনি পুনঃ আনে নবযুগ বিনাশি' ঘৃণিত বিলাসে !
উদার মর্ম্ম অসীম শান্ত
নিয়ত কর্ম্মব্রতে অক্লান্ত,—
আজি আত্মা, বচন অঙ্গে একতা অভূত শক্তি-বিন্যাসে !

১৪

তব শুভ্রবসন যশ গৌরব
অপার বিদ্যা ধন বৈভব
ছিল লুণ্ঠিত ছিল কুণ্ঠিত ;—আজি তনয় ধেয়েছে উদ্দেশে !
কোটি ধিক্কারে জাগ্রত আজ
সুপ্ত আত্মা—পেয়েছে লাজ,—
দলি' নিঃশেষে চির কলঙ্ক হের অব্যাজে ছুটে দিগ্দেশে ?
কোটি উন্মদ সুত সর্ব্বকলুষ নিষ্পেষে ঘোর বিদ্বেষে !

১৫

অপগত ভয়, ঘুচেছে ঘৃণা,
আর তো ভুবনে নহ মা দীনা ;
আজি বাণীর বীণে ঝঙ্কারে মধু মুক্ত সুগীতি রভসে !
পরাণহীনা নহে ভাষা আর,
কর্ম্ম নহে মা শূন্যসার,
দিক্ প্রসারে কর্ম্মকাহিনী—যশোমুখরিত নভ সে !
সেই বোধন মন্ত্র মর্ম্ম আঘাতি' জাগায় অযুত অবশে !

১৬

এবে শক্তি তুমি মা ! দুখিনী নয় !
ব্রত উদ্‌যাপি' সন্তানচয়
অঞ্জলি পূরি' চন্দনে ফুলে এ নবযুগ-বরষে
গাইয়া তব বিজয়গীতি
মহিমাময়ি ! পূজিবে নিতি
তব বিশ্ববন্দিত পদ্মচরণ পুণ্য-অপার হরষে !
আজি জেগেছ মা তুমি, বিশ্ব জেগেছে ;
জেগেছে তনয় উরসে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

সোলতান মাহ্‌মুদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।) *

মহামতি সবক্তগীনের এতাদৃশী উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সৈন্যগণ ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে "আল্লা-হো-আকবর" উচ্চারণ পূর্ব্বক অমিত বিক্রমে হিন্দুসৈন্য মধ্যে আপতিত হইল। বিপক্ষ পক্ষও রণশিঙ্গা ও রণডঙ্কা বাজাইয়া অধিকতর বিক্রমের সহিত ইস্‌লাম-সৈন্যের সম্মুখীন হইল। তখন উভয় সৈন্য প্রাণপণ শক্তিতে সমরে লিপ্ত হইল। রণাঙ্গণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, হয় হস্তীর সদম্ভ পদক্ষেপ এবং উভয় সৈন্যের যোধরাবে চতুর্দ্দিক ভীষণতর কোলাহলময় হইয়া উঠিল। ধূলি পটল সমুত্থিত হইয়া রণভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঘোর অন্ধকার;—আত্মপর লক্ষ্য নাই;—সকলেই উন্মত্তবৎ বিদ্যুৎবেগে অসি সঞ্চালন করিতেছে; শত শত হতভাগ্য সৈনিক অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে; কত জন বা হয়-হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া জন্মের মত রণসাধ মিটাইতেছে। নিহত সৈন্যগণের অধিকাংশই স্বপক্ষীয় দেখিয়া হিন্দু যোধগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। অনেকে প্রিয়তমা ললিতা ললনার অপরিমেয় প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মহারাজ জয়পাল সহস্র যত্নেও কাহাকেও আর স্থির রাখিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ইস্‌লাম-সন্তানগণকে সস্নেহ আলিঙ্গন দান করিলেন। তখন হর্ষস্ফীত মুসলমানগণ আনন্দ-কোলাহলে "আল্লা-হো-আকবর" রবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া গৃহে গমন করিল। তাহাদের বীর কীর্ত্তির কথা দেশদেশান্তরে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল; কিন্তু অতীব অনুতাপের বিষয় যে, এই শ্লাঘনীয় বিজয়-গৌরব লাভের অল্প দিন পরেই বীরবর নাসেরুদ্দীন সবক্তগীন ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে হিজরী ৩২৭ সালে ইহলোকের নশ্বর সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া চির সুখ-ময় ধামে প্রস্থান করিলেন।

সোলতান মাহ্‌মুদের রাজ্যলাভ ও ভারতাক্রমণ।

সোলতান নাসেরুদ্দীন সবক্তগীন দুইটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সেই পুত্র যুগলের মধ্যে একটি আমাদের ভুবনবিখ্যাত মহাবীর সোলতান মাহ্‌মুদ এবং অপরটির নাম এস্‌মাইল। মাহ্‌মুদ ৯৭১ খৃষ্টাব্দের

* (৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩১২ সাল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনৈক ইংরাজ লেখক প্রসিদ্ধ ইতিহাস 'তারিখে ফেরেস্তার' সমালোচন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মাহ্‌মুদ সম্ভবতঃ সবক্তগীনের পাটরাণীর গর্ভ সম্ভূত সন্তান নহেন। সম্ভবত তাঁহার এই মন্তব্যই ঠিক। যখন মহাকবি ফেরদৌসী মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' রচনা সাঙ্গ করিয়া মাহ্‌মুদের নিকটে প্রতিশ্রুত মুদ্রা লাভে হতাশ হইয়াছিলেন, তখন মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া মনের আবেগে তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে গিয়া তিনিও লিখিয়াছিলেন, "দাসী-পুত্র দ্বারা অঙ্গীকার প্রতিপালন বা কোন সৎকার্য্য সম্ভবে না। সে যদি মহামান্য বাদশাহের ঔরসেও জন্মগ্রহণ করে, অথবা ভাগ্যক্রমে যদি দেশাধিপতির পদও প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা কখনই দূরীভূত হয় না।"* অপর ঐতিহাসিকেরাও অনুমান করেন যে, মাহ্‌মুদ-জননী জাবলস্তান হইতে আনীতা এক রূপবতী গুণবতী পরিচারিকা মাত্র ছিলেন। যাহা হউক, মহাবীর মাহ্‌মুদ যে সম্রাট সবক্তগীনের বৈধ তনয় এবং উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয়ের কারণ নাই।

মাহ্‌মুদ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব সুগঠিতদেহ ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ছাঁচে ঢালার ন্যায় সুডৌল ও নধর ছিল। কিন্তু এক ভীষণ ব্যাধিতে তাঁহার সেই অনুপম লাবণ্য বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। এক সময়ে তিনি কঠিন বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। করুণাময় আল্লাহ্‌তালার কৃপায় তিনি সেইবার করাল কালের কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত বদনমণ্ডল এরূপ ঘন ও দৃঢ়রূপে বসন্তচিহ্নাঙ্কিত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার উত্তমাঙ্গের সুষমা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার যে রূপমাধুর্য্য আর নয়নরঞ্জক ছিল না। মাহ্‌মুদ ইহার জন্য নিয়ত অনুতপ্ত চিত্তে কালযাপন করিতেন। কথিত আছে, তিনি সর্ব্বদা সৌন্দর্য্যশালী আফগান সহচরগণের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া স্বকীয় কুরূপত্বের ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

মাহ্‌মুদ বাল্যকাল হইতেই পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন এবং যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইতেন। কোন কোন যুদ্ধে তিনি এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাহা অনেক রণদক্ষ মহাবীরের পক্ষেও দুর্ল্লভ ছিল। যৎকালে তিনি নিশাপুরের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার পিতৃদেব এই অচির-স্থায়ী পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া সুখময় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান

---

* লেখক প্রণীত "ফেরদৌসী চরিত" পাঠ করিলে এ বিষয় বিশদরূপে বোধগম্য হইবে।

করেন। মাহ্‌মুদ রাজগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শরীরে বলবীর্য্য যথেষ্ট ছিল। বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যেও লোকসমাজে তাঁহার যশঃ পরিকীর্ত্তিত হইত। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর তিনিই যে সিংহাসনারূঢ় হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই; কিন্তু হইলে কি হইবে? মাতৃকুলের বংশমর্য্যাদার হীনতা-নিবন্ধন তাঁহার ভাগ্যে রাজপদপ্রাপ্তি ঘটিল না। বিশেষতঃ পরলোকগত ভূপতি কনিষ্ঠ পুত্র এস্‌মাইলকেই অধিকতর ভালবাসিতেন এবং স্নেহাধিক্য বশতঃ তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতেন না। কি অন্তঃপুর, কি রাজদরবার, কি যুদ্ধক্ষেত্র,—সর্ব্বত্রই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। যখন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর আমার কনিষ্ঠ পুত্র এস্‌মাইলই আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে; গজনীর রাজমুকুট তাহারই শিরে শোভা বিস্তার করিবে। রাজদণ্ড পরিচালনের ভার আমি তাহারই উপর সমর্পণ করিলাম।" এই নির্দ্দেশানুসারেই কনিষ্ঠ এস্‌মাইল নির্ব্বিবাদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এস্‌মাইল মহাড়ম্বরে সিংহাসনারোহণ করিলেন। গজনী নগরী মহোৎসবে কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। নব ভূপতির শাসনাজ্ঞা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। রাজপ্রাসাদে উৎসবের ইয়ত্তা নাই। সৈন্যদিগের বেতনবৃদ্ধি এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরিত হইল। এই শুভ সুযোগে সভাসদ-গণও বেশ করিয়া নিজ নিজ উদর পূর্ণ করিয়া লইলেন। অপরিণামদর্শী এস্‌মাইল সঞ্চিত অর্থ দানে তাঁহাদিগকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিলেন। প্রজাগণ উপাদেয় পানাহারে পরিতুষ্ট হইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শী মাহ্‌মুদ ভ্রাতার এই অমিতব্যয়িতার সংবাদ শ্রবণে সংক্ষুব্ধ হইলেন। এবং আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিজ্ঞতা ও ধীরতার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট নিম্নের মর্ম্মানুযায়ী এক পত্র প্রেরণ করিলেন ঃ—"দেখ এস্‌মাইল! পর-লোকগত পিতৃদেব বহু কষ্টে এই রাজত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি রাজ-কোষ ধনপূর্ণ ও রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমিত বিক্রমে অরাতিদল ভীতচিত্তে নতমস্তকে অবস্থান করিত; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন চতুর্দ্দিক হইতে এই রাজ্যের উপর শত্রুপক্ষের লক্ষ্য পতিত হইয়াছে। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটিবে, কে বলিতে পারে? আমি অনেক চিন্তার পর যাহা অবধারণ করিয়াছি, তাহাই আজ অকপটে তোমার নিকট প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার বয়স অতি অল্প; ভয়োদর্শন,

বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতার অভাব নিবন্ধন তুমি রাজপদ প্রাপ্তির যোগ্য নহ। বল দেখি যে গুরুভার আজ তোমার মস্তকে ন্যস্ত, তুমি যেরূপ ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, তাহাতে কি তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? কখনই নহে। তুমি যদি বিজ্ঞ হও, তোমার যদি বিচক্ষণতা জন্মে, তবে পিতার অবর্ত্তমানে তুমিই গজনীর সিংহাসনালঙ্কৃত করিবে, বহু পূর্ব্ব হইতেই আমার মনের ইহাই ধারণা ছিল এবং তজ্জন্যই তোমার সিংহাসনারোহণ সময়ে আমি আনন্দিত ভিন্ন দুঃখিত হই নাই। কিন্তু ভ্রাতঃ! তোমার বিজ্ঞতা কৈ? বিবেক বুদ্ধি কৈ? তুমি এই কয়েক দিবসের মধ্যেই পিতার সুখের সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত করিবার উপক্রম করিয়াছ; রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছ। তজ্জন্য আমি সৎ পরামর্শ প্রদান উদ্দেশ্যে তোমাকে বলিতে বাধ্য হইতেছি, তুমি রাজকোষের ধনরত্নাদি ইস্‌লাম শাস্ত্রানুযায়ী আমাকে বিভাগ করিয়া দিয়া আমার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কর। তোমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার্থ আমিও বল্‌খ ও খোরাসান প্রদেশের শাসনকার্য্য নিঃসম্পর্ক-রূপে তোমার হস্তে প্রদান করিতেছি।"

সোলতান মাহ্‌মুদের এই পত্র খানি যথার্থ উপদেশপূর্ণ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইলেও, মোহমুগ্ধ এস্‌মাইল স্বার্থপর সহচর বৃন্দের কুপরামর্শে ও চাটুকারদিগের অযথা তোষামোদে স্ফীত হইয়া, ইহা অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে মাহ্‌মুদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। যৌবন-স্বভাব সুলভ বল-বিক্রম, দম্ভতেজঃ, গর্ব্ব, অভিমান, দৃঢ়তা ও প্রতিভা তখন পূর্ণ মাত্রায় তাঁহার বীরদেহে বিরাজিত ছিল। তিনি এই অসহ্য অবমাননায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এস্‌মাইল পদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া আমার সঙ্গত উপদেশ অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে আমি তেমন ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমার সভাসদ্‌বর্গ যে আমাকে নিতান্ত অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ও তুচ্ছ ব্যক্তি বলিয়া জানিল,—আমার কথার মূল্য নাই বলিয়া বুঝিল, তাহাতেই আমি অতীব অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমার যথার্থ অধিকার ও স্বত্ব-স্বামিত্ব যাহা আছে, তাহাও সে প্রণিধান করিয়া বুঝিল না। কি করিব? অগত্যা আমাকে রাজধানী আক্রমণ পূর্ব্বক এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেই হইবে। জগৎ আমাকে কোন প্রকার দোষে দোষী করিতে পারিবে না।"

ক্রমশঃ।

মোজম্মেল হক্‌।

সমাজ-নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সমস্ত বিজ্ঞানের অনুসন্ধান প্রণালীই "জ্ঞাত" বিষয় হইতে "অজ্ঞাত" বা "অনুজ্ঞাত" সত্যে উপনীত হওয়া। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটনা বা সত্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইতে এক সাধারণ সত্যের আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে এই অনুসন্ধান-প্রণালী প্রযোজ্য নহে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া, বহুত্ব হইতে একত্বে উপনীত হওয়া, বিজ্ঞানেরই ক্ষমতায়ত্ত বিষয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ঘটনাবলীর বা অবস্থা সমূহের একত্র সমাবেশই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঘটনা সমষ্টির বা অবস্থা সমষ্টির ফল আমরা অগ্রে অনুধাবন করিয়া থাকি; তাহা হইতে ব্যষ্টিভাবে—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক এক ঘটনার বা অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা বিচার করিয়া থাকি। যেমন কোন ব্যক্তির চক্ষু বা নাসিকা অতি সুন্দর হইলেই তাহাকে সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যের বিচার করিতে হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাধারণ রূপমাধুরী পর্য্যালোচনা করিতে হয়; সেইরূপ সমাজের অঙ্গ বিশেষ, যেমন ধর্ম্মবিশ্বাস, নীতি-শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য, নৌ-চালন, রাজ্যশাসন প্রভৃতির উৎকর্ষ ব্যষ্টিভাবে আলোচনা করিলে সমাজের উন্নতি বা অবনতি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কিন্তু এই সমস্তের সাধারণ উন্নতি বা অবনতিই সামাজিক উন্নতি বা অবনতির প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাস, নীতি-শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য, নৌ-চালন, রাজ্যশাসন প্রভৃতির কোন একটির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন সংঘটন হইলে অন্যান্য গুলিরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। সমাজের এক সাধারণ অবস্থা হইতে অপর সাধারণ অবস্থায় পরিবর্ত্তন, যেমন সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগে, দ্বাপরযুগে, কলিযুগে পরিবর্ত্তন, ঐ সকলের একটির পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে না, যুগপরিবর্ত্তনের সমস্ত লক্ষণ যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত সমস্ত বিষয়ের আংশিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজের সাধারণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। তবে সমাজ-পরিবর্ত্তন কিরূপে

নির্ণীত হইবে? একটি বিশেষ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা সমাজের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে; তাহার ফলেই সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সমস্ত পরিবর্ত্তনকে এককালীন পাঠ করিতে ও বুঝিতে হইবে। জগতের প্রত্যেক শক্তিই দুই প্রকারের,—এক স্থিতিভাবাপন্ন, অপর গতিশীল। সমাজও স্থিতিভাবাপন্ন ও গতিশীল—এই দুই অবস্থায় দেখা যায়। এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, মানসিক কার্য্যসমষ্টির বা সমাজের প্রাকৃতিক ক্রম-বিকাশ হয় কি না? এবং এই ক্রম-বিকাশ সামাজিক উন্নতি কি না? এই বিষয়ে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা "নববিকাশে"র লেখক শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী হার, এম্-এ, মহাশয়ের সুলিখিত ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "নববিকাশে"র "জাতি গঠনে ব্যক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের মত সময় বিশেষে এক একটি জাতির এক একটা বিষয়ে প্রয়োজন উপস্থিত হয়; এবং তদন্তর্ভুক্ত কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণও সেই বিষয়ে সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া সেই অভাব মোচনের প্রয়াস পান। তাই কখনও বা জ্ঞানচর্চ্চা, কখনও বা সমরচর্চ্চা জাতিবিশেষের বিশেষ লক্ষ্য হয়। তাই রোমাণ জাতির সাধারণ তন্ত্রের সময়ে ব্যবহার শাস্ত্রের চর্চ্চার, রাজতন্ত্রের সময়ের প্রথমভাগে সমর চর্চ্চার এবং উহার পরিণত অবস্থায় সাহিত্য চর্চ্চার অভ্যুদয় হইয়াছিল। মোটের উপর, কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণের স্বজাতির উন্নতি বিধানকল্পে একটি অকৃত্রিম ও গাঢ় অনুরাগ চাই এবং স্থির চিত্তে মাঝে মাঝেই স্বজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে স্থির করা উচিৎ, আমাদের জাতির এখন কি ঘোর অভাব?—আমি তাহার জন্য কি করিব? এতদনুসারে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যে নিরত হইলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।" *

মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সমাজ-বিজ্ঞানের আংশিক উপকরণ মাত্র।

---

* সমাজ-নীতি সম্বন্ধে বেস্থামের মত ছিল যে মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম (যেমন অভাব বোধ করা ও তাহা পূরণের চেষ্টা করা) আবিষ্কার করিতে পারিলে সমাজ-গতির সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা হইল। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, অগস্ত কোমৎ, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি মহানুভবগণ ঐ যুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। Single impalse বা Influence (প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা) সামাজিক পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। দশজনে মিলিয়া সভা করিয়া ভোট সংগ্রহ করিলে সামাজিক ভিত্তির পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। জাতীয় মহাসমিতি তাহার উদাহরণ।

অন্য বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম প্রত্যেক ঘটনার দ্বারা পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানে প্রত্যেক ঘটনা দৃষ্টে সাধারণ নিয়মের উপলব্ধি হয় এবং সেই নিয়ম হইতে নূতন নূতন ঘটনার সংঘটন দ্বারা নিয়মের সত্যতা পরীক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হইতে সংগৃহীত কোন সামাজিক সত্য, যদি চিরস্থায়ী বদ্ধমূল মানব প্রকৃতির কোন সাধারণ সত্যের বিপরীত দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, ইতিহাস বুঝিতে ভুল হইয়াছে। এবং তাহার উপর স্থাপিত সামাজিক সত্যও ভ্রম সঙ্কুল। ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষা দ্বারাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন ও দিশাহারা ভূয়োদর্শন ফলোপ-ধায়ক হয় না। যে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবি-ষ্কৃত হইয়া থাকে, সেই ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা কোন প্রাগনুকল্পিত, বিনা পরীক্ষায় গৃহীত ও অনুমিত মতের উপর নির্ভর করে। এক দিকে দেখা যায়, সমস্ত মতই পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা গঠিত হয়; অপর দিকে দেখা যায়, পূর্ব্ব-অনুমিতি মনে উদিত না হইলে ও সেই অনুমিতির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে, অনুমিতি ও পর্য্যবেক্ষণ কিছুই ফলোপধায়ক হয় না। স্বভাবের শোভাদর্শনে অক্ষম ব্যক্তি সরোবরে বিকসিত কমল দর্শন করিয়া সেই কমলে কমল ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু কল্পনার বরপুত্র কবিগণের হৃদয়ে পূর্ব্বেই ভাবরাশি সমুদিত থাকায় তাঁহারা দেখিতে পান যে, "ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি। এই বিশ্বসঙ্গীতময়, জীবসত্ত্ব তালে তালে গান করিতেছে; ঘটনারাজি তালে তালে ঘটিতেছে; তটিনী সমীরণের সহিত এক তানে মিলিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে; কমল সরোবরে মৃদুল হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া সখীর গাত্রে ঢলিয়া পড়িতেছে এবং নিজের সোহাগে নিজে বিভোর হইয়া কমলের হাসি হাসিতেছে।" এই যে কবির কল্পনা, ইহা অসত্য হইলেও ইহা হইতেই ক্রমে সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে, এইরূপ অনুমিতি ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যই অবলম্বন করিতে হয়। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে,—সম্পূর্ণ ইতিহাস একাধারে কার্য্য ও দর্শন শাস্ত্র। *

মানব প্রকৃতির যতটুকু অংশ সমাজ-বিজ্ঞানে প্রতি ফলিত হয়, তাহা অতি

* History, at least in its state of ideal perfection, is a compound of poetry and philosophy. (Macaulay).

সামান্য। পুরাতন যুগের বহুদর্শিতা, শিক্ষা, সংস্কার, এক কথায় বহুশতাব্দীর একত্রীভূত বলবতী প্রবৃত্তি রাশিই সমাজ-পরিচালক। সকল মানবের সাধারণ প্রকৃতি একরূপ হইলেও অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কার ও বহুদর্শিতার পার্থক্যে সমাজ পৃথক হইয়া পড়িতেছে। অর্থ নীতি শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, কাঁচা দ্রব্য হইতেই শিল্প নির্ম্মিত পদার্থ প্রস্তুত হয়;—যেমন তুলা হইতে বস্ত্র, পাট হইতে ত্রিপল, লৌহ হইতে ঘড়ীর স্প্রীং ইত্যাদি। কিন্তু তুলা, পাট ও লৌহের মূল্যের তুলনায় বস্ত্র, ত্রিপল ও স্প্রীংএর মূল্য অত্যন্ত অধিক; এমন কি এই-সকল শিল্প দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় কাঁচা দ্রব্যের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কাঁচা দ্রব্য হইতে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে বহু প্রকারের শ্রম তাহাতে প্রয়োগ করিতে হয়; নানা প্রকার সম্পত্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং অনুকূল জল বায়ুর সাহায্যও লইতে হয়। (যেমন ম্যাঞ্চেষ্টারের জ'লো বাতাসে যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র হয়, তাহা ভারতে হইতে পারে না।) অর্থনীতির এই উদাহরণ সমাজ নীতিতে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, মানব-সমাজ পরিচালন পক্ষে মানব-প্রকৃতি অতি সামান্য উপকরণ। এই প্রকৃতি না-না অবস্থায় নানা শাসনাধীনে নানা প্রকার লোকের সংসর্গে ও একতায় নানা বিভাগে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যেমন তুলা ভিন্ন বস্ত্র হয় না; সেইরূপ মানব প্রকৃতির উন্নতি ভিন্ন সমাজের উন্নতি সম্ভবেনা। এই জন্যই বলিতে হয়, উন্নত সমাজ বা উন্নত গভর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিয়া কোন অনুন্নত সমাজ বা অনুন্নত গভর্ণমেণ্ট সহসা উন্নত হইতে পারে না। সমাজ বা বভর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে তালে তালে জন্মে; একদিনে নির্ম্মিত হয় না।* দেশ হিতৈষী বঙ্গবাসী সাধক গাহিয়াছেন:—

"শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'তো, চির দিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তি হীন হ'তো না।
কেবল ডাকের গয়নায় ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না।
একমনে বিল্বদল ভক্তি গঙ্গাজল
শতদল দিলে হয় সাধনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না।

* Society or goverment grows, but is not made. Rome was not built in a day.

যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস বাসনা।
কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত্ বিচারে
শক্তি পূজা হয়না।
সকল 'বর্ণ' এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবেনা।"

ক্রমশঃ।

শ্রীজানকীনাথ পাল।

বালক-চোর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৮

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে ছিলেন না। মলিন-বেশা মুণ্ডিতকেশা বিধবা সরলা তাহার বাম হস্তটি প্রসারিত করিয়া অবনত আননে বসিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে তাহার জননী মূর্ত্তিমতী-সাবিত্রী স্থির দৃষ্টিতে আমার গণনা শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন।

তাহারা উভয়েই আমার গননা শক্তিতে বিমোহিত হইতেছিল। সরলার জীবনের ত কোনও কাহিনী আমার নিকট অবিদিত ছিল না। সে সঙ্গ যতক্ষণ উপভোগ করিতে পারাযায়, ততক্ষণই সুখ। তাই সরলার হাত দেখিয়া একে একে তাহার জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিতেছিলাম।

এসব কথা সরলা অন্যমনে শুনিতেছিল। সে আমাকে চিনিতে পারিল না বটে; কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলাম, কি এক পূর্ব্বস্মৃতি তাহার অন্তঃস্থল আলোড়িত করিতেছে।

সরলা অন্যমনে বলিল,—বলিতে পারেন মরিব কবে?

আমার কাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'মরিব কবে?'—ভাবিলাম, সরলা! তোমার এ দশা কাহার জন্য? কি কুক্ষণেই আমায় ভালবাসিয়াছিলে! আর সরলার মাতা? বাসনা হইতেছিল, সেইক্ষণেই ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিয়া বলি,—মা আমায় ক্ষমা কর।

আমায় নীরব দেখিয়া সরলা বলিল,—কই পারিলেন না বলিতে?

ভাবিলাম, ধন্য নারী জীবন! মৃত্যু ত তাহার বহু পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল।

তাহাকে গম্ভীরভাবে বলিলাম,—সকল কথা ইঁহার সাক্ষাতে বলিতে পারি ?

যুবতী একটু শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, তাহাতে ক্ষতি কি ?

আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইচ্ছা ছিল, গোপনে সরলাকে আত্ম পরিচয় দিব।

আমি বলিলাম, কুসঙ্গে পড়িয়া আপনার জীবন বিষময় হইয়াছে।

উভয়ে বিস্মিত নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম,—মরিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? মরিতে আপনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

অবশ্য একথা আন্দাজে বলিলাম। নিষ্ঠুর অধর্ম্মী পুরুষ যাহা করিতে পারিয়াছিল, স্ত্রীলোক তাহার একটুকু প্রয়াসও করে নাই ? আত্মজীবনের একটা কথা তাহাকে বলিলাম।

মাতা-পুত্রী বিস্ময়ে, ভক্তিতে আমার পদধুলি লইতে গেল।

সরলা বলিল,—আপনি অন্তর্য্যামী।

আমার প্রাণত পাষাণে গঠিত। আমি ত কাঁদিয়াছি অনেক, অংশীদারকে লাভের অংশ না দেওয়া অধর্ম্ম। ছেলেটা আমায় অনেক কাঁদাইয়াছে। গর্ভধারিণীকেই যদি না কাঁদাইতে পারিল, তবে তাহার জন্মই বৃথা।

আমি বলিলাম, যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে অপর একটি লক্ষণের ফল বিবৃত করি।

সরলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—কি ? বলুন।

আমি বলিলাম, আপনার একটি পুত্র আছে, কিন্তু বোধ হয় জীবনে তাহার সহিত আপনার সাক্ষাত হইবে না।

এ সংবাদের ফলটা বড় ভীষণ হইল। সরলা একবার তাহার মাতার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পতিত হইল।

আমি তাহার জননীকে বলিলাম,—'শীঘ্র জল লইয়া আসুন।' তাহার জননী উঠিয়া গেলেন।

আমি বস্ত্রাঞ্চল দিয়া সরলাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। সরলা চক্ষু মেলিল। আমি আর্দ্র কণ্ঠে বলিলাম,—সরলা! প্রিয়তমে! আমায় চিনিতে পারিতেছ না ?

সরলা বলিল,—প্রাণাধিক তুমি ? আমার সন্দেহ হইয়াছিল।

যুবতী আবার মূর্চ্ছিতা হইল। আমি সেই অবসরে বিদায় লইলাম।

বাহিরে আসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলাম। কি জানি কেহ যদি সন্ন্যাসীর চক্ষে জল দেখিতে পায়! ভাবিবে,—এটা ভণ্ড সাধু।

৯

বর্দ্ধমানের সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহটি আজ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। একদল বালক কৃষ্ণ-সাগরের পারে বসিয়া পরামর্শ করিয়া ফেলিল,—আজ স্কুল পলাইয়া বালক-চুরির মোকদ্দমাটা দেখিতে হইবে। ধর্ম্মদ্বেষী লোকের আজ মহা স্ফূর্ত্তি। তাহারা ত জানিতই, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল মিথ্যা; গৈরিকবস্ত্রধারী ভণ্ড বেটারা ছদ্ম বেশী চোর। একান্নভুক্ত পরিবারের নিষ্কর্ম্মারা দেখিল, তবু একটা হুজুক পাওয়া গেল,—দেখি এই ছেলে চুরির ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে আমার জীবন সর্ব্বস্ব বালকটিকে পথে খেলা করিতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ভাবিলাম, ভগবান যখন এমন সুযোগ মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন আর বৃথা কষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? তাহার সেই সুন্দর ভুবনমোহন মুরতি দেখিয়া আমার হৃদয় আবার পিতৃস্নেহে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম, হস্তে পাইয়া এ রত্ন পরিত্যাগ করা অবিধেয়। তাই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম। সে ত আমারই পুত্র। ইহাতে আবার অপর ইতর লোকের অনুমতি লইবার কি প্রয়োজন ছিল? আমায় কিন্তু অধিক দূর যাইতে হয় নাই। পথেই পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আজ বর্দ্ধমানের সিনিয়ার ডেপুটির নিকট আমি বিচারার্থ নীত হইলাম।

হাকিমের মুখাবলোকন করিবামাত্রই আমার হৃদয় ক্ষীপ্রগতিতে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমি পিতাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম; কিন্তু পিতা তাঁহার পরিত্যক্ত পুত্রটিকে চিনিতে পারিলেন না।

অভিযোক্তার উকীল মহা লম্বাচওড়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আমি যে ভণ্ড সাধু, আমাদের যে বদমায়েসের দল আছে, আমাদের প্রধান কার্য্য যে ইংরাজ রাজত্ব হইতে ছেলে চুরি করিয়া দেশীয় রাজত্বে বিক্রয় করা, ইত্যাদি সকল তিনি বুঝিতে পারিলেও বিশেষ প্রমাণ দিতে পারিবেন না। সুতরাং অপাততঃ হুজুরকে তিনি ৩৬৩ ধারার অপরাধে আমার বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। আমার লুক্কায়িত আশ্রমাদি খুঁজিলে যে রাশি রাশি চোরাই মাল পাওয়া যাইবে, উকীল পুঙ্গব তাহাও বলিতে বিরত হইলেন না।

এবং পুলিস তদন্ত হইলে ঐ অপরাধেও পুলিস আমায় চালান দিবে, এরূপ আশ্বাস বাক্যও বলিলেন।

ক্রমে সাক্ষী পরীক্ষা হইল। আমার দোষ এক প্রকার সাব্যস্ত হইল।

পিতা বলিলেন,—এ গুরু অভিযোগ আমি স্বয়ং নিষ্পত্তি করিব না মোকদ্দমা দায়রায় দিব। তোমার কিছু বলিবার আছে?

একবার ভাবিলাম, জেলে যাই। আবার ভাবিলাম, জেলে যাইয়াই বা কি হইবে? জেলে গেলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও আশা নাই। তদপেক্ষা আত্মপরিচয় দিয়া সত্য ঘটনা বিবৃত করি। আমি ত আর পিতার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি না। আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে ক্ষতি কি?

করযোড়ে বলিলাম, হুজুর যদি আদালত গৃহ লোকশূন্য করিয়া দেন, এ রহস্যের জটিল ব্যাপার বিবৃত করিতে পারি।

পিতা সম্মত হইলেন। পিতা-পুত্র-পৌত্র ও সরকারী উকীল ব্যতীত গৃহে আর কেহ রহিল না।

দাড়ি, গোঁফ, জটা প্রভৃতি ছদ্মবেশের সকল উপকরণই টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। অবনত মুখে সমস্ত জীবনের ইতিহাসটা পিতার নিকট বলিয়া ফেলিলাম। পুত্রের গলদেশলম্বিত কবচখানি সাক্ষ্য দিলাম। বলিলাম পুত্র যে আমার, ইহাই তাহার প্রমাণ।

যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহা হইল। পিতা এজলাস হইতে নামিয়া আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন। সে সময় শিশু ব্যতীত সেই আদালতস্থিত সকলেরই চক্ষু আর্দ্র হইয়াছিল। কেবল শিশুটি বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে আমাদের কয়েকজনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

মাতার হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছিল, পিতা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পুত্রটিকে গৃহে লইয়া আসিয়াছিলাম। সদয় গোয়ালা আমাদেরই পরিবারভুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে পারে নাই। শান্তি থাকিবে কোথা? পাপের স্মৃতি, পাপের স্পর্শ এসব বিমল শান্তির শত্রু; সুতরাং অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাপেক্ষা ভাগ্যবতী সরলা। যেদিন সরলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি, সে দিন সরলা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। সেই মূর্চ্ছাই তাহার শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। তাহার তিন দিবস পরে অভাগিনী অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্ম্ম।

'অর্চ্চনা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় গত বর্ষের শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় 'ধর্ম্ম দ্বেষিতা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লেখক মহাশয় হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি যে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তৎসম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। অনভিজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু লেখক-গণ ঐস্‌লামিক আলোচনায় এখন যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কিছুতেই আর নীরব থাকা উচিত নহে।

তিনি বলেন, হিন্দুগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন নাই; পক্ষান্তরে, মুসলমান এবং খৃষ্টানগণ ধর্ম্মের নামে কত অত্যাচার এবং কত শোণিতপাত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার মতে হিন্দুগণ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মীদিগের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিতে হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে শাক্ষ্য দিতেছে, হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ ব্যবহার স্পেনের মুরদিগের এবং আমেরিকার আদিম নিবাসী দিগের প্রতি খৃষ্টানদের ব্যবহারের সহিতই কেবল তুলনীয় হইতে পারে।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দুগণ কোন সময়েই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দিগের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই; সুতরাং খৃষ্টানেরা নিরাশ্রয় য়িহুদী দিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন, হিন্দুগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শারীরিক ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ দেখিয়া সেই সুযোগ কখনও পান নাই। কিন্তু যখনই ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহারা কাহারও উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তখনই যে তাঁহাদের অত্যা-চারের পরিসীমা থাকে নাই, তাহা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।

লেখক মহাশয় বলেন যে, হিন্দুর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্য্যাতন না

করিবার কারণ, তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে, যদিও বর্ত্তমান জীবনে মুসলমান কিম্বা খৃষ্টানগণ কুপথে আছেন, তথাচ সহস্র জন্মান্তরেও তাঁহারা একদিন হিন্দু হইবেন। তিনি আরও বলিতেছেন,—"খৃষ্টান এবং মুসলমান যখন বুঝিতে পারে, একটি ব্যতীত জনম নাই, এই জনমের কার্য্য কলাপের সহিত অনন্তকাল-ব্যাপী সুখ দুঃখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এই জনমের কার্য্য-কলাপের মধ্যে তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারক ঈশ্বরাবতার কর্ত্তৃক শিক্ষিত ক্রিয়াপদ্ধতিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও ভবিষ্যৎ-সুখপ্রসূ এবং অধিকন্তু নিজ ধর্ম্মে অপরকে দীক্ষিত করা একটা মহাপুণ্যকর্ম্ম, তখন অপরকে আপনার ধর্ম্মশ্রেণীভুক্ত করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে আপনা আপনিই সমুত্থিত হয়।" মনেরভাব যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ হিন্দুগণ যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও হেয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের সঙ্গে কিঞ্চন্মাত্র সম্পর্ক রাখাও অপবিত্র বিবেচনা করেন, লেখক কি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন? পর ধর্ম্ম বিদ্বেষের পক্ষে ইহাই কি তাঁহাদের যথেষ্ট অত্যাচার নহে? যেরূপ অঙ্গারকে শত ধৌত করিলেও পরিষ্কার করা অসম্ভব, সেইরূপ মুসলমান প্রভৃতি জাতি দিগকে সহস্র চেষ্টাতেও হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার মত পবিত্র এবং উপযুক্ত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, হিন্দুরা কি তাহাদের (মুসলমান প্রভৃতি জাতির) ধ্বংস এবং অধঃপতন কামনা করিতেছেন না? ইংরাজ শাসনাধীনে হিন্দু অফিসার এবং সেরেস্তাদার দিগের অসীম উদারতাগুণে মুসলমানগণের সামান্য এপ্রেন্টিস পদ লাভ করাও যে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কি এই বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? বিশেষতঃ গরীব মুসলমান প্রজাবৃন্দ হিন্দু জমিদার দিগের আমলে কি শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে লেখক মহাশয় একবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই হিন্দুর পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইবেন! ইস্‌লাম ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, সকলেই পবিত্র এবং নির্দ্দোষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু অন্য লোকের সংস্রবে গিয়া তাহাদের চরিত্রে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পবিত্র কোরানে লিখিত আছেঃ—"সত্যপথ অবলম্বন কর; পরমেশ্বর সকলকে এই পথের দিকে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।" বল প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্যকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ কোরানের কোন স্থানে লিখিত নাই। অন্যের উপকার করাই মুসলমান ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। তজ্জন্যই মুসলমানগণ ইস্‌লামের মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া অন্য ধর্ম্মা-

বলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করাকে একটি কর্ত্তব্য কার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। কোরানে ঈশ্বরের আদেশ এই যে, "ধর্ম্ম-বিষয়ে বল প্রয়োগ করিও না।" মুসলমানগণ যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কখনও ইস্‌লামধর্ম্মে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে নয়। রাজনৈতিক কারণে এবং আত্মরক্ষার্থই মুসলমান-গণকে তরবারি ধারণ করিতে হইয়াছিল। কোরানের ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"লোকদিগকে জ্ঞানের সহিত এবং নম্রতার সহিত পরমে-শ্বরের পথে আহ্বান কর; এবং তাহাদের সঙ্গে অতি ভদ্রতার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক কর।" মুসলমান এবং খৃষ্টানগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কোরানের নবম অধ্যায়টি সর্ব্বশেষে এবং এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল; অর্থাৎ যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ সীমায় পঁহুছিয়া-ছিল, তখনই এই অধ্যায়টি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই অধ্যায়েই এইরূপ প্রত্যাদেশ আছে,—"যে সকল ব্যক্তি তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে, এবং প্রেরিত পুরুষকে দেশ হইতে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহা-দের বিরুদ্ধে এবং যাহারা তোমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে বিনা কারণে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমরা কি অস্ত্রধারণ করিবে না?"

এখানে 'জন্মান্তর' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জন্মান্তরবাদিগণ বলিয়া থাকেন, "পূর্ব্বজন্মে লোক যাহা করিয়াছে, তদনুযায়ীই ইহজন্মে ফলভোগ করিতেছে।" এই কথাটি শুনিতে বড় ভাল বোধ হয় বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই ইহার অসত্যতা উপলব্ধ হইবে। মনে করুন, একজন লোক ভয়ানক রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহাতে জন্মান্তর-বাদী বলিবেন, সে পূর্ব্ব জন্মে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহারই সমুচিত শাস্তি এখন ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইস্‌লামধর্ম্ম এই অবস্থায় বলি-বেক, পরমেশ্বর এই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতেছেন যে, সে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বিপদে সহিষ্ণুতা এবং ধীরতা প্রদর্শন করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার উপযুক্ত কিনা। লক্ষ লক্ষ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেও উক্ত রোগী কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিতে পারিতেছে না যে, সে কি কারণে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। পুরস্কার ও শাস্তির অর্থ এবং আবশ্যকতা কি এই স্থানেই তিরোহিত হইল না? এ অবস্থায় এই ব্যক্তিকে পূর্ব্ব জন্মের পাপের জন্য রোগ যন্ত্রণায় শাস্তি দেওয়া এবং নির্জীব পদার্থকে শাস্তি দেও-

য়ায় কোনই প্রভেদ নাই। মনে করুন, আমাকে আমার শিক্ষক মহাশয় ১০টি বেত্রাঘাত করিলেন। যদি আমি অনুভব করিতে পারি যে, আমি দুষ্টামি করিয়াছি বলিয়াই আমাকে শিক্ষক মহাশয় শাস্তি দিলেন, তাহা হইলে আমি নিজকে নিজে প্রবোধ দিতে পারি যে, অবশ্যই আমি শাস্তির উপযুক্ত। কিন্তু যখন আমি স্মরণ করিয়া দেখিলাম যে, আমি এইরূপ কোন কার্য্য করি নাই, যাহাতে আমি শাস্তির উপযুক্ত হইয়াছি, অথবা শিক্ষক মহাশয় কিম্বা অন্য কোন লোকও আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেছেন না যে, আমার অমুক কার্য্যের জন্য আমি শাস্তি পাইতেছি, তখন আমি যে ঐ শিক্ষককে মনে মনে একজন ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী বিবেচনা করিব, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

যে পরকালে খৃষ্টান, য়িহুদী এবং মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, সেই ভবিষ্যৎ কাল এইরূপ যে, আমাদের যে প্রত্যেক সৎ কিম্বা মন্দ কার্য্য এবং যে প্রত্যেক সৎ কিম্বা মন্দ প্রবৃত্তির জন্য পুরস্কার কিম্বা শাস্তি ভোগ করিব, সেই কার্য্য এবং প্রবৃত্তি আমাদের স্মরণপথে জাজ্জ্বল্যমান উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং আমাদিগের নিজকে নিজে প্রবোধ দিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবে। জন্মান্তরবাদীদিগের কথার অসারতা প্রমাণ করিতে গিয়া "Studies in Theosophy" নামক পুস্তকের লেখক বলিতেছেন,—"মনে কর, বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমার কিছুমাত্র স্মরণ হইতেছে না; তখন আমার স্মরণশক্তির হিসাবে বলিতে গেলে আমি বলিব যে, আমি এই জন্মের পূর্ব্বে আর কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি একসময়ে জুলিয়াস্ সিজার ছিলাম, মনে করেন—ভালই; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমার স্মরণশক্তি বলিতেছে, আমি জুলিয়াস্ সিজার না হইয়া সম্পূর্ণরূপে অন্য লোকই বটে, আমি লর্ড কার্জ্জন না হইয়া যেরূপ সম্পূর্ণরূপে অন্য লোক, জুলিয়াস্ সিজার তদ্রূপ আমি না হইয়া সম্পূর্ণরূপেই অন্য লোক। প্রভেদ এই যে, সিজার গত সময়ে জীবিত ছিলেন এবং লর্ড কার্জ্জন বর্ত্তমান সময়ে জীবিত আছেন। জন্মান্তরবাদিগণ বলিতে পারেন, যদি জুলিয়াস্ সিজার বাস্তবিকই আমি স্বয়ং, তবে তাঁহার কার্য্য বাস্তবিকই আমার কার্য্য এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য আমাকে শাস্তি দিবার সময়ে "কর্ম্মগুণ" বাস্তবিক ঐ ব্যক্তিকেই শাস্তি দিতেছে, যে এইরূপ কার্য্য করিয়াছিল; কিন্তু

জন্মান্তরবাদীদের এইরূপ যুক্তি বাতুলতার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। নৈতিক নিয়মানুসারে বলিতে হইলে, লোকের অনুভব শক্তির বাহিরে লোক তাহার কার্য্যের জন্য বাধ্য নয়। মনে কর, আমি এক সপ্তাহ কাল মূর্চ্ছাবস্থায় ছিলাম, এবং ঐ অবস্থায় কতক দূষণীয় কাজ করিয়াছি। ইহা সকলে স্বীকার করিবেন যে, এই অবস্থায় আমি যাহা করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী নহি। ইহা নিতান্ত দরকার যে, আমি যে কার্য্যের জন্য শাস্তি পাইব, তাহা যেন আমার স্মরণ শক্তির বাহিরে না থাকে।"

এইক্ষণ জন্মান্তরবাদী বলিতে পারেন, আমি ত মাতৃগর্ভে জীবিত ছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে আমি কি অবস্থায় ছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। সেই সময় এবং অবস্থার বিষয় স্মরণ নাই বলিয়া আমার কি বলা উচিত হইবে যে, মাতৃগর্ভে আমি ছিলাম না? আমরাও স্বীকার করি, এমন অনেক বিষয় আমাদের জীবনে ঘটিয়াছে, যাহা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। ইস্‌লাম শিক্ষা দিতেছে যে, পরকালটি এইরূপ হইবেক যে, আমাদের মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই স্মরণ পথে উপস্থিত হইবেক; এবং ইহকালে যদি সামান্য মাত্রও কষ্ট কিম্বা বিপদ ঘটিয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে সুখ অনুভব করিব। অন্যপক্ষে যদি পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকি, সেই কার্য্যের স্মৃতি বৃশ্চিকের ন্যায় আমাদিগকে নিরন্তর দংশন করিবে। আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জগৎপাতার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা গুণ যেন অনুভব করিতে পারি। সেই গুণ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার স্থান এই পৃথিবী নহে। ইহা মুসলমানদের এবং খ্রীষ্টানদের স্বর্গ এবং নরক। কোরাণে লিখিত আছে:—"With thy Lord shall be the sure mansion of rest on that day; on that day shall a man be told that which he hath done first and last, yea, a man shall be an evidence against himself; and though he offer excuses, his innerself shall be evidence against them."

মুসলমানগণ একটি জন্মে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মবল এবং নৈতিক বল লাভ করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, জন্মান্তরবাদীরা লক্ষ লক্ষ জন্মান্তরে বিশ্বাস করিলেও ফল এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরা মুক্তি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে কর্ত্তব্যপরায়ণতা অনুভব করিতে Logically বাধা পাইতেছেন।

যখন আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমি যত প্রকারের অত্যাচার এবং

অন্যায় কার্য্য করি, তজ্জন্য পরজন্মে যে শাস্তি দেওয়া যাইবেক, সেই শাস্তি আমি নিজে অনুভব করিতে পারিব না, তখন ধর্ম্মভীরু হইবার আমার দরকার কি? ইহাতে জন্মান্তরবাদী হিন্দুভায়া বলিবেন, তিনি পুরস্কারের আশায় বা শাস্তির ভয়ে কোন কাজ করেন না। স্বীকার করিলাম, তাঁহার কথাই সত্য, কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, শতকরা ৯০ জন লোকে এই কারণেই কাজ করিতেছে। আমাদের কোরানেও বারবার আদেশ আছে যে, আমরা পরমেশ্বরকে ভালবাসি বলিয়াই যেন তাঁহার আরাধনা করি। আমাদের ভালবাসার শেষ ফল এই যে, পরকালে আমরা তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া আরও অধিক পরিমাণে তাঁহাকে ভালবাসিবার সুযোগ পাইব। কিন্তু জন্মান্তরবাদীরা দারুণ মূর্চ্ছাগ্রস্ত লোকের ন্যায় প্রকৃতির নিয়মে এদিক ওদিক চালিত হইতেছেন মাত্র। জন্মান্তরবাদীদের বিশ্বাসের শেষ ফল যে নাস্তিকতা, ইহাতে কি কোনরূপ সংশয় আছে? "The goal of ambition of the believers in the transmigration of soul is this earth only and nothing more, except an unconscious *Nirvan.*"

পরিশেষে বক্তব্য, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের মত উচ্চ-শিক্ষিত লোককেও কতকটা বিদ্বিষ্ট-হৃদয় সাধারণ হিন্দু লেখকগণের দলে মিশিতে দেখিয়া আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। বস্তুতঃ তিনি যদি একটু বিশদ আলোচনা করিয়া দেখিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, ইস্‌লামের মত উদার ধর্ম্ম এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই। পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ যদি ইস্‌লামের অনুমোদিত হইত, তবে পৃথিবীস্থ ধর্ম্মজগতের দৃশ্য কিরূপ আকার ধারণ করিত, তাহা খুলিয়া বলা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। যাহা হউক আমরা আশাকরি, লেখক মহাশয় ভবিষ্যতে ঐস্‌লামিক কথার আলোচনায় একটু অধিক গবেষণা ও বিচার-শক্তির প্রয়োগে পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আহমদ কবীর।

সেদেশ কেমন?

১

কে বলিয়া দিবে মোরে সে দেশ কেমন?
সেদেশে কি ফোটেফুল,
হাসেকি তারকা কুল
এমনি কি সে দেশের সুনীল গগন?
ছোট ছোট ঢেউ তুলি—
সে দেশের নদী গুলি,
কলরবে ছুটে যায় সাগর সদন?
সেদেশে কি হাসে উষা
পরিয়ে কুসুম ভূষা,
সেদেশে কি উঠে নিতি তরুণ তপন?
কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?

২

কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?
সেদেশে মলয় বায়
জুড়াইতে জীব-কায়
বহে কিরে ফুল-গন্ধ করি বিতরণ?
সেদেশে বিহগ স্বরে
এমনি কি সুধা ঝরে
প্রভাত সন্ধ্যায় তারা করে কি কূজন?
সেদেশে পূর্ণিমা চাঁদ
(মধুর মোহন ছাঁদ)
কৌমুদী ছড়ায়ে কিরে মাতায় ভুবন?
কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?

৩

কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?
সেদেশে কি ষড় ঋতু
জীবকুল সুখ হেতু
বিভ্রম বিলাস ভরে করে পর্য্যটন?
সেদেশে কি আছে বিল—
(সলিল ঈষৎ নীল)
মরাল কমল দলে অপূর্ব্ব শোভন।
জলচর নানা পাখী
সদা করে ডাকা ডাকি
কুতূহলে দলে দলে করে সন্তরণ;
কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?

৪

কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?
সেদেশে প্রেমিকা বালা
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা
এ দেশেরি মত কিরে করে আলিঙ্গন?
এমনি পাশেতে বসি
মধুর মুচকি হাসি
বঙ্কিম কটাক্ষে করে মানস হরণ,
এমনি সোহাগ ভরে
আদর যতন ক'রে
করে কিরে সুমধুর প্রেম-সম্ভাষণ?
কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?

৫

কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?
ছোট ছোট শিশু গুলি,
কচি কচি হাত তুলি
এমনি কি করে তথা ধাবন কূর্দ্দন?
মুখে আধ আধ ভাষা,
দেবতারো ভাল বাসা;
দরশনে পরশনে পুলকিত মন;
স্নেহের জনক পিতা,
মমতার খনি মাতা,
পাব কি সেদেশে ছুঁতে তাঁদের চরণ?
কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?

৬

কে বলিয়া দিবে মোরে সেদেশ কেমন?
স্নেহের ভগিনী ভাই,
পাব কিরে সেই ঠাঁই?

পাব কি সুহৃদ সখা আর বন্ধুজন ?
এসব যদি না পাই,
তবেত সকলি ছাই,
হায়রে ! কিসের তরে মানব জীবন !
অনন্ত শূন্যেতে হায় !
মিশিব কি অচিরায়,
হায়রে কি বিড়ম্বনা ! যাতনা বিষম !
জীবন হইলে ছিন্ন,
হায়রে সকলি শূন্য !
মানব জীবন তবে সুধু কি স্বপন ?
এই চারু বসুন্ধরা,
প্রেমপুণ্যপ্রীতি ভরা,
শ্যামলা, সিন্ধুবসনা, জীব-নিকেতন !
ইহারে ত্যজিলে পরে
আর কিছু নাই কিরে ?
না-না-না তাও কি হয় সম্ভব কখন ?
দয়া সিন্ধু বিশ্বপতি,
কভু নন ক্রূর মতি
নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি মঙ্গল কারণ।
পতিত পাবন খোদা
ঘুচাও এ মোহ ধাঁধা,
খুলেদাও কৃপা করি জ্ঞানের নয়ন।
মানব দেখুক চে'য়ে
সেদেশ ইহার চেয়ে
সুখশান্তি হর্ষে ভরা সুখদ শোভন।

সৈয়দ সিরাজী।

গিরি।

প্রখর মধ্যাহ্ন-দিনকর-করজাল
খর শরজাল হ'তে তীক্ষ্ণ অতিশয় ;
না করি ভ্রূক্ষেপ তায় গিরি মহাশয়
আছে বিভুধ্যানে মগ্ন। পূর্ণ হ'লে কাল
দিনমণি চ'লে গেলে পশ্চিম গগনে
গোধুলি আসিয়ে দেয় তার পুরস্কার,—
সুবর্ণ কিরীট শিরে, শোভার আধার,
লোহিত-বসনা সতী অতীব যতনে,
নিশাকালে শশী ঢালে অমিয় জ্যোছনা ;
স্বরগ উদ্যান হ'তে কিম্বা দেবদল
বরষে হীরকপুষ্প—সাবাস সাধনা !
চিহ্ন তার ছিন্নফুল জোনাকি সকল।
তব উদাহারে গিরি বিকাশিল জ্ঞান,
শান্তি ও মুক্তির পথ নিরাকার ধ্যান।

সাদত আলী।

সিরাজ।

জ্বালাময় সংসারের অসহ্য তাড়নে
মধুর স্বপন-ভরা জীবন-উষায়
নির্ম্মম ঘাতুক-ত্যক্ত শাণিত কৃপাণে
তুমি দেব! গেছ চলি স্বর্ণ-অমরায়!
তখনো মিটেনি আশা—চির অস্ফুরণ!
মোহন মাধবীলতা ছিঁড়িয়া বাতাসে
কর্ত্তব্য-সুরভি-ভরা মধুর জীবন
ল'য়ে গেছে পুণ্যময় দেবতার দেশে।
তোমার মঙ্গল গীতি অনন্ত নিখিলে
মেঘমন্দ্রে সমীরণে ধ্বনিত ঝঙ্কৃত!
প্রকৃতি তোমার স্মৃতি পুণ্য-পুষ্প-দলে—
রেখেছে এ বিশ্বমাঝে নিয়ত জাগ্রত!
মরিয়া অমৃত তুমি,—সার্থক মরণ!
সসীমে অসীমে সত্য সুন্দর মিলন!

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

মহা দুর্ভিক্ষ

ঐ যে শ্রবণবিদারণ আর্ত্তনাদ—গগনভেদী হাহাকার,—কিসের ও?

দুর্ভিক্ষ! যে ভারতে যুগযুগান্তরে কদাচিৎ 'মন্বন্তর' দেখা দিত, আজ সেই ভারতের কুটীরে গৃহে, হর্ম্ম্যে পর্ণকুটীরে, গ্রামে নগরে, শৈলে সরিতে—দুর্ভিক্ষের নিত্যাধিকার! কিসের এ দুর্ভিক্ষ?

এ দুর্ভিক্ষ অন্নের, এ দুর্ভিক্ষ জলের, এ দুর্ভিক্ষ বসনের, এ দুর্ভিক্ষ ভূষণের, এ দুর্ভিক্ষ ধর্ম্মের ও কর্ম্মের!—দুর্ভিক্ষ কিসের নহে? হায়! এমন অশন-বসন-অনিল-সলিল-প্রাণমানগ্রাসী সর্ব্বভুক্ মহাদুর্ভিক্ষ কোথা হইতে আসিয়া এমন করিয়া সোনার ভারতে কালের ভেরী বাজাইল?

কুক্ষণে মুর্শিদকুলী খাঁর ভাগ্যে বাঙ্গালার নবাবী ঘটিয়াছিল! কুক্ষণে মুর্শিদাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! মুর্শিদকুলী যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যান, জগৎশেট, রায়দুর্ল্লভ এবং মির্জ্জাফর প্রভৃতি বলীবর্দ্দের সাহায্যে হলকর্ষণ করিয়া সাগরপারের বণিগ্‌ভৃত্যেরা সেই ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা হইতে পলাশীর কালসমর-প্রান্তরে এ কালদুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর উৎপত্তি।

জন্মিয়াই এই রাক্ষসী দুইটি রাজপুত্রের মস্তক কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইয়াছিল,—একটি ভগবান গোলায়, আর একটি উদয়নালায়! এই দুইটি সোনার ছেলের সদ্যঃশোণিত পান করিয়া রাক্ষসী দেখিতে দেখিতে মোহিনী মূর্ত্তিতে বাড়িয়া উঠিল!

এই সাগরপারাগত বীজসম্ভূতা সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী দুইটি যাদুকর যন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—একটি সোনার কাটি, অপরটি রূপার কাটি। প্রথম— সোনার কাটিটি দেখিয়া এ দেশের লোক আনন্দে নাচিয়া উঠিল, লোভে অধীর হইল, মোহিনী রাক্ষসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তখন চতুরা রাক্ষসী রূপার কাটিটি ছুঁয়াইয়া দেশের লোককে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিল;—যাদুমন্ত্রে বোকা বানাইয়া অবশেষে নল-সংযোগে তাহাদের রক্ত শোষিতে লাগিল! লোকেরা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াও রাক্ষসীর দক্ষিণ হস্তস্থিত সোনার কাটিটি দেখিয়া, তথাপি উল্লসিত হইয়া থাকিল!

হঠাৎ একদিন আর সোনার কাটিটি দেখা গেল না। তখন মরণের মুখে লোকগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল;—দেখিল, তাহাদের দেহে রক্ত নাই; শরীরে বল নাই; শ্বাস রুদ্ধ;—দারুণ ক্ষুধা, দারুণ তৃষ্ণা, নিদারুণ জ্বালা!— তাহারা উলঙ্গ,—তাহারা সর্ব্বস্বহীন!

ঐ সেই চীৎকার! ঐ সেই রোদন রোল! ঐ সেই আর্ত্তনাদ!—ঐ শোন দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর পৃষ্ঠানুসারী বিকট গর্জ্জন!

ইহা রূপক নহে; ইহাই সত্য। হিন্দুযুগে যখন ভারতে রাজবাহুল্য ছিল, তখনও লোকের অন্নাভাব ছিল না, জলাভাব ছিল না, শৌর্য্যবীর্য্যাভাব ছিল না,—কর্ম্মের অভাব ছিল না,—সকলেরই সচ্ছলতা ছিল। আবার যখন মুসলমানযুগ স্থাপিত হইল, তখনও এদেশের 'সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা' নাম দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছিল। দেশের সাময়িক অবস্থানুযায়ী রাজকর আদায় হইত; * গমনাগমনের সুবিধার্থে সুবৃহৎ রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মিত

* ইংরাজরাজের বন্দোবস্তে মুসলমান রাজত্বের সময় অপেক্ষা রাজস্ব কিরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইত। * সুপেয় জল এবং বাণিজ্যের প্রসার-বিধানকল্পে তড়াগ, দীঘি, খাল ইত্যাদি নিখাত এবং নদনদীর সংস্কার হইত। † তখন ভারতের পণ্য দেশ বিদেশে যাইত;—ভারতের দিগ্‌দিগন্ত বিঘোষিত নাম ছিল। সেই নামের গুণরাশিই তো সুদূর হইতে কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া ইউরোপীয় বণিককে চঞ্চল করিয়াছিল! সেদিন ভারতের দ্বারদেশে ভিক্ষুক-বেশে আসিয়া এই বণিককে হস্ত পাতিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার মহাদুর্ভিক্ষে সেই ভারতবাসীকেই সেই ভিক্ষুকের কাছে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিয়াও আহার্য্যের পরিবর্ত্তে কঙ্কর পাইতে হইতেছে! কখনও বা ভিক্ষাকণাও মিলিতেছে না! ভারতের দ্বারে আসিয়া যে ইংরাজ আশাবিভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই, সে আজ—সে কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া ভারতবাসীর প্রার্থনীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তে তাহার নাসাভঙ্গের ব্যবস্থা করিতেছে!

দেশের ধন হুহু শব্দে শোষিত হইয়া সাগরপারে যাইতেছে; দেশের শস্য ভারে ভারে পার হইতেছে; দেশ বসনশূন্য, শিল্পশূন্য,—তাহার উপর বিদেশীয়ের পণ্য,—অপদার্থ পণ্য—স্তূপে স্তূপে আসিয়া এদেশের নগরপল্লী ছাইয়া ফেলিতেছে,—লোককে বিলাসী, অপব্যয়ী, অপরিণামদর্শী—অন্তঃসারহীন অক্ষম করিয়া তুলিতেছে! চাহ, নদনদীখালে হিন্দু-মুসলমান মাল্লার নৌকা

হইয়াছে, দেশের অর্থ কি ভীষণ ভাবে শোষিত হইতেছে, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা' পাঠ করিলে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

* এখনও রাস্তা প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু রোড্‌সেস যে উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়া লওয়া আরম্ভ হইয়াছিল, এখন তাহার পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে? এই অর্থে এখন অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় না; নানা ভাণ-অছিলায় সাধারণের এই অর্থের অপব্যবহার হইয়া থাকে।

† ভাগীরথীর মোহানা পদ্মার ভীষণস্রোতবাহিত বালুকায় বন্ধ হইয়া যাইত। মুসলমান নবাব বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সীসার পাত দ্বারা ঐস্থানে ভাগীরথীর তলদেশ বান্ধাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বারমাস ভাগীরথীতে জল থাকিত। ঐ সীসক ইংরাজের চক্ষে পড়িল, উহাকে সীসকের খনি মনে করিয়া তাঁহারা উহা উঠাইলেন এবং বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইলেন। কিন্তু সেই হইতে ভাগীরথী যে চিরকালের মত 'ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিত্তিন্না' হইয়াছেন, আর তাহার সংস্কার হইল না। দেশের কৃষির একশেষ দুর্গতি হইল।—এখন কাল্গুন-চৈত্রে ভাগীরথীর গর্ভে জলের গভীরতার পরিমাণ (বহু বাঁধছাঁদ দেওয়াতেও) ছয় ইঞ্চির অধিক নহে।

আর দেখিবে না;—বিদেশীয়ের জলযানে ঐসকল পূর্ণ হইতেছে! শৈলে, অরণ্যে বিদেশীয়ের একাধিকার। দেশীয়েরা কেরানী ও কুলী রূপে খাটিয়া বিদায় পাইতেছে! দরিদ্রে জ্বালানী কাষ্ঠ কুড়াইয়া অর্থদণ্ড দিতেছে! চারিদিকে অগাধ লবণসমুদ্র থাকিতে দেশের লোক শত-যোজনাগত অস্পৃশ্য অপবিত্র লবণকণিকা ভক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সকলি হারাইতেছে! সমাজের আচার-নিষ্ঠা বিকৃত; শিক্ষা অপ্রকৃত—সঙ্কুচিত। অপমানের সচল প্রস্তরমূর্ত্তিসকল 'চাকুরী' 'চাকুরী' করিয়া দলেদলে রাসভস্বরে চীৎকার করিয়া ছুটিতেছে। পাইতেছে পদেপদে প্রত্যাখান!—লাঞ্ছনা!

"অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা;
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা!"

এদেশ কবে এমন ছিল? মুসলমানযুগে হিন্দু এদেশের সেনাপতি ছিল, মন্ত্রী ছিল;—কি না ছিল? তথন সম্মান ছিল, শক্তি ছিল, দেশময় কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত ছিল।—তথন শোষণ ছিল না, শাসন ছিল। কাজেই তৎ-কালে এমন মহাদুর্ভিক্ষ করাল বদনব্যাদনে দেখা দেয় নাই। প্রাসাদে যাও, দেখিবে আজ সেখানে দেশীয় স্থাপত্য নাই, দেশীয় শিল্প নাই। হিন্দুর অতুল শিল্পে মুসলমানের উন্নত শিল্প মিলিয়া যে সোনায় সোহাগা হইয়াছিল,—সে শিল্প আজ মরিয়া গিয়াছে!—বিদেশীয় ছাঁচে গড়া প্রাসাদাভ্যন্তরে বিদেশীয় মাকাল-শিল্প দেশের মৃতশিল্পের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিকট উপহাসের হাসি হাসিতেছে! ইহা দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর শিল্প-দুর্ভিক্ষের প্রকট মূর্ত্তি! বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যাও, সেখানে দুর্ভিক্ষপিশাচী ভীষণ-দশন বিকাশ করিয়া দেশের বাণিজ্য দন্তে কাটিয়া খিল্-খিল্ হাসিতেছে! কুটীরে যাও, দেখিবে কৃষককুল সর্ব্বস্বান্ত; হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিচারে ক্ষুদ্রবৃহৎ উচ্চনীচ, দেশের সকল ব্যবসায়িগণই কুটীর হইতে প্রান্তরে বিতাড়িত হইয়াছে! যেদিকে চাহিবে,—এই মহাদুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আকাশে বজ্ররূপে, স্থলে ব্যাঘ্রমূর্ত্তিতে, জলে কুম্ভীররূপে দেশীয়ের সম্মুখে দাঁড়াইতেছে! সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দিগ্‌দিগন্তের আকাশ-নক্ষত্র ছিঁড়িয়া প্রকৃতি, সমাজ, সমস্তই চিরান্ধকার সাগরের অতল জলতলে নিক্ষেপ করিতেছে! যে দেশের লোকে জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিল, যে দেশের ধর্ম্ম ও সভ্যতা বঙ্গসাগর হইতে অতলান্তকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই দেশবাসীর রক্তসম অর্থরাশি আদায় করিয়া লইয়া পাশ্চাত্যসংস্পর্শে বিকৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আজ তাহাদিগকেই শিখান

হইতেছে! আর তাঁহাদের ধর্ম্মগুরুরা হেয়, লাঞ্ছিত ও নিষ্পীড়িত হইয়া নিবিয়া যাইতেছেন!

"Rule Britania rule the waves,
Britons never shall be slaves!"

যাঁহাদের জাতীয় মন্ত্র এই মহাসঙ্গীত, যাঁহারা জগতের দাসত্বপ্রথা কুঠারাঘাতে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই স্বার্থের পায়ে বিবেক-বলি দিয়াছেন, আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য ও নিষ্ঠা পদদলিত করিয়াছেন! একচ্ছত্র ভারতে আজ যদি তোমার ন্যায়দণ্ড ধর্ম্মসংহতি পরিচালিত হইত,—তবে জগতের সমক্ষে ভারত তোমার নামের পরম গৌরব-স্বরূপে দাঁড়াইতে পারিত। কিন্তু হায়! তোমার অনন্তদ্যুতি তীব্রমতি ভারতকে আলোকিত করিবার পরিবর্ত্তে ইহার অতুলিত ধনরত্ন, সুশুভ্র যশোরাশি, দিগ্বিশ্রুত দেহবল সকলকেই অঙ্গারে পরিণত করিয়াছে!

সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী হিন্দু-শক্তি,—শতশত বৎসরব্যাপী মুসলমানের ক্ষমতা ভারতে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইংরাজ সার্দ্ধশত বৎসরে তাহাতে শ্মশান স্থাপনা করিয়াছেন! এই শ্মশানের মহাচিতানলে হিন্দু-মুসলমানের সকল কীর্ত্তি,—সকল বিত্ত ভস্মীভূত হইয়াছে।—পলে-পলে অনল ফুৎকারে, প্রেতের বিকট হী-হী রবে শ্মশানস্থলী মহা ভয়ঙ্কর!—তাহাতে মহা দুর্ভিক্ষপীড়িতের মহা হা-হা রব!—এ দৃশ্য দেখিতে তোমার প্রাণ শিহরিল না!—তুমি ভূত ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া বর্ত্তমানের শিরে ঘৃতের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া-দিয়া ভারতকে ভারত হইতে উদ্বাস্ত করিয়া দিয়াছ! এই হৃতসর্ব্বস্ব মহা-দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কোটি কোটি শ্মশান-বাসীর মহা-হাহাকার ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া উধাও হইয়াছে!—যখন বিশ্বপাতার চরণতলে এই আকুল ক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনায় বিচার-যাচ্ঞায় লুটাইয়া পড়িবে, সেদিনের জন্য শ্মশানপতি হিসাব নিকাশের কি জবাব স্থির করিয়া রাখিয়াছেন? বিশ্বপাতা তাঁহাকে যে অমিত শক্তি,—যে অব্যাহত ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে আজ জগতের দিকেদিকে ইংরাজের গৌরবান্বিত নাম আকাশ ভেদ করিত, মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইত! কিন্তু হায়! তাঁহার পূজার ফুল তিনি শ্মশান-লীলায় পর্য্যবসিত করিয়াছেন!—তাঁহার মহাগৌরবান্বিত নাম আজ জগতের দিকে দিকে ধিক্কৃত হইতেছে!

তর্ক ও হৃদয়।

দর্শনের তত্ত্ব নিয়ে প্রাণখানি হ'য়ে গেলছাই !
অন্তহীন তর্কজাল বিরসতা করি উদ্গীরণ—
হৃদয়েরে করিল সংহার।—'পদার্থ,' 'বিষয়,' 'মন,'
'অতীন্দ্রিয়,' 'শক্তি,' 'জড়,'—অতগুলি 'আছে' আর 'নাই,'
মানবের ক্ষুদ্রতম ধারণার পরিধির মাঝে
চাহিল ভাঙ্গিয়া দিতে এ বিশ্বের রহস্য বিপুল !
ক্ষুদ্রতার মহা-আস্ফালন !—কি রাগিণী বাজে
বিশ্বময়,—কেমনে বুঝিবে তুমি ? নাহি তার কূল ;
নাহি সংজ্ঞা, নাহি ভাষা, ক্ষুদ্রতর্ক—তব মস্তিষ্কের
ক্ষীণ দুর্ব্বল সন্তান—ছোট দু'টি বাহুপাশ দিয়ে
কেমনে জড়াবে এই বিপুল জগৎ ? হৃদয়ের
পায়ে পড়ুক লুটিয়া শিশু নিজ খেলাধূলা নিয়ে।
তবু গর্ব্ব—তবু চাই বাক্যবাণে দিতে উড়াইয়া
এ শ্যাম ধরিত্রীখানি—ধরাবক্ষে মানবের হিয়া।

এস ফিরে, এস ধরা চির মধুময়ী—
ল'য়ে সাথে প্রাণময় পরিজন তব,
হৃদয় ফিরায়ে দাও মোরে ; যত সব
সুখদুঃখ, প্রেমপ্রীতি, স্নিগ্ধ অনুভব
ফিরে দাও সব ; আমি পুনঃ ভুঞ্জে লই
অতটুকু দীর্ঘসুখ অধরে তোমার।
আনন্দে বিষাদে গর্ব্বে মগ্ন হ'য়ে রই
অন্তহীন আলিঙ্গনে তব ; অভিমান
গেঁথে দিক্ কণ্ঠে বক্ষে অশ্রু-মুকুতার
স্বচ্ছ হার ; নিশিদিন ম্লানিয়া বয়ান
বিরহ ঢালুক তপ্ত বেদনার ভার ;—
তাও ভাল,—তাও শান্তি, তাও রসায়ন !
এস ধরা, ফিরে যাও নীরস দর্শন।

এস ধরা, এস ফিরে মধুময় অঞ্চলে তোমার
মোর এ তাপিত প্রাণ সন্তর্পণে রাখ ঘুমাইয়া ;
স্নেহভরে মেখে দাও চোখে তব মায়ার অঞ্জন।
আগ্রহে উচ্ছল প্রাণে আত্মহারা করি দরশন
তোমার বিচিত্র রূপঃ দেখি ফুল্ল কুসুমসম্ভার
ফুলবক্ষে তরল শিশির, শিশিরে অরুণ গিয়া
মেখে দিক্ সুবর্ণচুম্বন ; দক্ষিণের সমীরণ
বহুক লহরে, সরমে সরসী টেনে দিক্ বুকে
সফরী রতনে আঁকা তরঙ্গ অঞ্চল ; অভিমানে
শতদল-দলে অলি অভিযোগ করুক গুঞ্জনে ;
মরাল-স্খলিতগতি নাচুক গো রসাবেশ সুখে ;
মধুসখা উঠুক কুহরি প্রেমের পঞ্চম তানে !—
এস ধরা, এস হিয়া, এস চক্ষে মায়ার অঞ্জন ;
ফিরে যাও, দুরে যাও উচ্চশিরা নীরস দর্শন !
২১-৫-৯৭।

শ্রীনলিনীকান্ত সেন।

বীরবল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ গোপাল ভাঁড় ও দিল্লীর বাদসাহ আকবর শাহের সভাসদ্ বীরবলের মনোমোহকর অবসর রঞ্জক গল্প অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। যদিও বীরবল প্রথমে ভাঁড় সাজিয়াই প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের পদচ্ছায়া লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পরিণামে স্বীয় তীক্ষ্ণ-মনীষা-বলে আকবর শাহের একজন প্রধান অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

মহানুভব বাবর অসাধারণ প্রতিভা বলে ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ঐ সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপিত করেন এবং মহাত্মা আকবর সেই সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির,—প্রকৃতি পুঞ্জের আন্তরিক প্রীতির

উপর সংস্থাপিত করেন। আকবর শাহের পরেও ভারতবর্ষে প্রায় দেড়শত বৎসর মোগল রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল; তৎপর সাম্রাজ্য ইংরাজবণিকদের করায়ত্ত হইয়াছে। মোগলগণ যোদ্ধ্‌বেশে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন; প্রকাশ্য সম্মুখ যুদ্ধে ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাভূত করিয়া ভারতসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইংরাজগণ বণিগ্‌বেশে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কূট অর্থনীতিশাস্ত্রের সাহায্যে, ভারতবাসীদিগের অশন-বসনের দ্রব্য সম্ভার করায়ত্ত করিয়া, ক্রমে ক্রমে নানা উপায়ে ভারতের সর্ব্বেশ্বর প্রভু হইয়াছেন। আকবর শাহের রাজত্ব কালেই ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়, বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যসমিতি—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়া, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন। আকবর শাহের ন্যায় মোগল বাদসাহগণ ন্যায়পরতা, মুসলমান ও হিন্দুর প্রতি তুল্য প্রীতি-ব্যবহার, ভারতবর্ষকে জন্মভূমি জ্ঞানে ভারতে বাস, রাজকীয় কার্য্যে ও সৈন্যবিভাগের প্রধান প্রধান পদে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানগণকে নিযুক্ত করিয়া ভারতবাসীর অন্তঃকরণের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন। ইংরাজগণ ভারতবাসীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের কৌশল ও মূলধন হস্তগত করিয়া ভারতবাসীর স্থূলশরীরের উপর রাজত্ব করিতেছেন। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখিত বীরবলের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বীরবল একজন ভাট ব্রাহ্মণ ও তাঁহার প্রকৃত নাম ব্রহ্মদাস ছিল। তিনি শাহ আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগেই ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মস্থান কল্পী হইতে ভট্টবেশে রাজধানীতে আগমন করেন। তিনি সম্রাটের পরিচিত হইয়াই তাঁহার বিদূষক হইলেন। প্রথমে তিনি অতি নিঃস্ব ছিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই শাহ আকবরের অনুগ্রহভাজন হন। তিনি অনুক্ষণ বাদসাহের সদনেই বাস করিতেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সম্রাটের একজন প্রধান অমাত্য হয়েন। শাহ আকবর প্রথমে তাঁহাকে রাজকবি (কব্‌রে) উপাধিদ্বারা বিভূষিত করেন। তৎপর তাঁহাকে রাজা বীরবর (সাহসী) উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তিনি রাজা বীরবর নামেই পরিচিত হইতেন। *

---

* কিন্তু তাঁহার লোক-বিখ্যাত 'বীর বল' নামেই আমরা প্রবন্ধের নাম করণ করিয়াছি।

আঁকবর শাহের উপর রাজা বীরবরের অসীম ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ প্রভাবেই বাদসাহের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। শাহ আকবর 'ঐশ্বরিক ধর্ম্ম' নামে এক অভিনব ধর্ম্মমত আবিষ্কার করেন। তিনি সেই নূতন ধর্ম্মের প্রেরিত পুরুষ হয়েন। রাজা বীরবর সেই ধর্ম্মের প্রধান শিষ্য হইলেন। রাজা বীরবর আকবর শাহের প্রিয় পাত্র হইলেও তিনি মুসলমান গণ ও হিন্দুগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে বিধর্ম্মী জ্ঞানে "অভিশপ্ত" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

নগরকোটের (কাঙ্গরা উপত্যকা) রাজা জয়চাঁদ বাদসাহের অপ্রিয়-ভাজন ও বন্দী হইলে সম্রাট রাজা বীরবরকে নগরকোট জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন। সম্রাট লাহোরের শাসনকর্ত্তা হুসেনকুলীখাঁর প্রতি নগর-কোট অধিকার করিয়া রাজা বীরবরকে প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিলেন। খাঁ সাহেব বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত, হস্তী, উষ্ট্র ও কামান লইয়া নগরকোটের দুর্গ অবরোধ করিলেন। রাজা জয়চাঁদের পুত্র বিধিচাঁদ অতীব সাহসের সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। নগরকোট হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। পর্ব্বের সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দুযাত্রিগণ নগর-কোটের দেবীমন্দিরে বহুমূল্য উপহার ও স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিত। আক্রমণ-কারী সৈন্যগণ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পূজারীদিগকে হত্যা করিল; দেবী-মন্দিরের সুবর্ণ-চন্দ্রাতপ বাণবিদ্ধ করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিল এবং দেবীমন্দিরের উপহার প্রাপ্ত অসংখ্য গাভী হত্যা করিয়া তাহাদের শোণিতদ্বারা মন্দিরের প্রাচীর রঞ্জিত করিল। রাজা বীরবরের জন্যই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় হিন্দুগণও রাজাকে অভিশপ্ত করিলেন।

হুসেনকুলীখাঁ নগর অধিকার করিয়া বিধিচাঁদের প্রাসাদের পুরভাগে এক বৃহৎ কামান সন্নিবিষ্ট করিলেন। এই সময় বিধিচাঁদ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এমন সময় হুসেনকুলীখাঁ লাহোর হইতে সংবাদ পাইলেন যে, মীর্জ্জা ইব্রাহিম-হুসেন ও মীর্জ্জা মামুদ হুসেন পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্য হুসেনকুলীখাঁ বিধিচাঁদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। বিধিচাঁদ নাবালক ছিলেন, তাঁহার পক্ষে তাঁহার খুল্লতাত ও অভিভাবক রাজা গোবিন্দ চাঁদ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করি-লেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি সংস্থাপিত হয়। বিধিচাঁদ দেবীমন্দিরের এক বৎসরের আয় পাঁচমণ স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিলেন। আবুল ফজল্ আকবর নামাতে সন্ধির সর্ত্ত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

(১) রাজা জয়চাঁদের একটি দুহিতা আকবর শাহের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইবে।

(২) বাদসাহের উপযুক্ত উপঢৌকন স্বর্ণমুদ্রা প্রেরিত হইবে।

(৩) রাজার একটি পুত্র প্রতিভূ স্বরূপ আগ্রায় প্রেরিত হইবে।

(৪) বাদসাহের আদেশ ছিল যে, নগরকোট রাজ্য বীরবরকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে, সেই জন্য বীরবরকে বহুসংখ্যক মুদ্রা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

এই সন্ধিস্থাপনের পরক্ষণেই হুসেনকুলীখাঁ রাজা বীরবরকে সঙ্গে লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুলতানের সন্নিকট মীর্জ্জাদের সহিত যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে রাজা বীরবর অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন; এই জন্য তিনি মুসাহিব-ই-দানীশ্বর (বুদ্ধিমান মন্ত্রী) এই উপাধিতে ভূষিত হয়েন।

তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মীর্জ্জা ইব্রাহিম হুসেন গুজরাটে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিলে, শাহ আকবর স্বয়ং রাজা বীরবরকে সঙ্গে লইয়া ঐ বিদ্রোহ দমন করিতে গমন করেন। তিনি আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া অতি অল্প কালের মধ্যে ৪৫০ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ নবম দিবসে গুজরাটের পত্তন নামক স্থানে উপনীত হয়েন এবং ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাগত হয়েন।

শাহ আকবর সময় সময় রাজা বীরবরকে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর পদে নিয়োগ করিয়া নানা স্থানে পাঠাইতেন।

মহানুভব বাবরের স্বলিখিত জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, এই সময়ে হিন্দুস্থানে তিন জন প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ভাথ প্রদেশের রাজা তাঁহাদের অন্যতম। শাহ আকবরের রাজত্বকালে রাজা রামচাঁদ ভাথের রাজা ছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী ও সাহসী বীরপুরুষ এবং অসাধারণ সঙ্গীত-বিদ্যা-পারদর্শী ছিলেন। রাজা বীরবরও সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ভাথরাজ রামচাঁদ কলিঞ্জর নামক গিরিদুর্গ আকবর শাহের সেনাপতি মজ্নু খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন এবং স্বীয়পুত্র বীর বাহাদুরকে প্রতিভূ স্বরূপ আগ্রায় প্রেরণ করেন। বাদসাহ রাজার ওজস্বিতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনিবার জন্য রাজা বীরবর এবং জেনখাঁ কোকাকে প্রেরণ করেন। ভাথরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাদসাহের সহিত

সাক্ষাৎ করিলে বাদসাহ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া ছিলেন। ভাথ-রাজ সঙ্গীত বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ও প্রসিদ্ধ দানশীল ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন ভাথরাজের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ভাথরাজ একদিন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক ক্রোড় টাকা দান করিয়া ছিলেন। মিঞা তানসেন ভাথরাজের নিকট হইতে আসিয়া সম্রাট আকবর শাহের কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরবর দাদার পুরের রাজা লৌন কিরণের দুহি-তাকে বাদসাহের অন্তঃপুরে লইয়া আসিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। রাজা লৌন কিরণ তাঁহার দুহিতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বাদসাহের নিকট প্রার্থনা জানাইলে, বাদসাহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কন্যাকে আনিবার জন্য বীরবরকে প্রেরণ করেন।

হিন্দুস্থানের মুসলমান নৃপতিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আলাউদ্দীন খিলিজি হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। গুজরাট রমণীগণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী। আলাউদ্দীন গুজরাটরাজ রায় করণের মহিষী কৌলা দেবীকে তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানেই ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী করত তাঁহার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অঙ্কশায়িনী করেন। কৌলা দেবীর কন্যাও অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ তনয় খিজির খাঁ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁদের প্রণয় কাহিনী পারস্য কবি আমীর খসরুর কাব্যে বর্ণিত আছে। কৌলা দেবীর প্রভাবেই আলাউদ্দীন অনেকাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এই আলাউদ্দীনই চিতোর রাজমহিষী পদ্মিনীর বিষ্ঠামূত্র-ক্লেদপূর্ণ স্থূল শরীরের বাহ্য রূপ লাবণ্যে আত্মহারা হইয়া পদ্মিনী লাভার্থ চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

শাহ আকবরও অনেক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু রাজা বীরবরের প্রভাবেই তিনি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

রাজা বীরবরের প্রভাবেই শাহ আকবর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন; এমন কি হিন্দু ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপও নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি মিতাচারী ছিলেন; এবং মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। তিনি সুরাপান করিতেন না, কিন্তু অহিফেণ সেবী ছিলেন। তদীয় পিতা হুমায়ুন অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিতেন। মহানুভব বাবর অতিরিক্ত সুরাপান করিতেন,

এবং সুরাপান করিয়া মধ্যে মধ্যে কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইতেন। সুপ্রসিদ্ধ পানিপথের যুদ্ধের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে বাবর তাঁহার সমস্ত সুরাপাত্র ও পানপাত্র ভগ্ন করিয়াছিলেন।

শাহ আকবর রাজা বীরবরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই জন্য দরবারের অনেক ওমরাহ তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসংখ্য বারবিলাসিনী নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগমন করিয়া রাজধানী পরিপূর্ণ করিয়াছিল। শাহ আকবর তাহাদের জন্য 'সয়তান-পুর' নামক এক পল্লী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই পল্লীর জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ও সেক্রেটারী নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা এই পল্লীর শান্তি রক্ষা করিতেন। এবং যে সকল ব্যক্তি ঐ সমস্ত বারবিলাসিনীদিগের গৃহে গমনাগমন করিত, তাহাদের নাম ধাম রেজিষ্টারী করিয়া রাখিতেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন নর্ত্তনকারিণী (খেমটাওয়ালী) রাত্রিযোগে কাহারও গৃহে যাইতে পারিত না। অতিরিক্ত সুরাপান, অশ্লীল গান ও অশান্তিকর কার্য্যের জন্য দণ্ডের বিধান ছিল। ডেপুটীর নিকট আবেদন না করিয়া ও দরবার হইতে অনুমতি না লইয়া কেহই সয়তানের পল্লী হইতে কোন কুমারীকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিত না। উচ্চবংশীয় ইন্দ্রিয়াসক্ত যুবকবৃন্দ স্বীয় স্বীয় নাম গোপন করতঃ এই পল্লীতে যাইয়া কুক্রিয়ায় রত হইত; বাদশাহ তাহা জানিতে পারিলে কঠিন দণ্ড প্রদান করিতেন। বাদশাহ নিজে সয়তান পল্লীর প্রসিদ্ধ বারবনিতাদিগকে ডাকাইয়া আনিতেন, ও কে তাহাদিগের কৌমার্য্য নষ্ট করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতেন। তন্মধ্যে এক রূপসী প্রকাশ করে যে, রাজা বীরবরই তাহার কৌমার-হর। বীরবর তখন রাজধানীতে ছিলেন না, তাঁহার নিজ জায়গীর কেরা পরগণায় ছিলেন। তিনি এই ঘটনার কথা শুনিয়া যোগী বা সন্ন্যাসী হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন, এইরূপ প্রকাশ করায় শাহ আকবর তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য পত্র প্রদান করিলেন। রাজা বীরবর বাদসাহের সহিত দেখা করিলে বাদসাহ পূর্ব্ববৎ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার দেখাইলেন। রাজা বীরবর বাদসাহের নবপ্রণীত ধর্ম্মমতের চারি ডিগ্রীর ও চারি ধর্ম্ম-মূলসূত্রের পারগামী ছিলেন। এই চারি ডিগ্রী যথা,—বাদসাহের জন্য সম্পত্তি, জীবন, মান ও ধর্ম্ম উৎসর্গ করা। চারি মূল সূত্র যথা,—জ্ঞান, সাহস, সত্য ও ন্যায়।

আফগানিস্থানের যুদ্ধে রাজা বীরবর সেনাপতি হইয়া জেনখাঁ কোকার সাহায্যার্থ গমন করেন। সেই যুদ্ধে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরবরের প্রাণ বিয়োগ হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী।

স্ত্রী-শিক্ষা

বর্ত্তমানকালে "স্ত্রীশিক্ষা" লইয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। একদল বলিতেছেন,—"স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত।" আর একদল বলিতেছেন,—"সাবধান! সাবধান! নারীজাতিকে কখনও শিক্ষা প্রদান করিও না। লেখাপড়াই নারীজাতির সর্ব্বনাশের মূল।" এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা আদৌ স্বীকার করেন না; উহারা চিরদিন নারী-জাতিকে অশিক্ষিতাবস্থায় রাখিতেই প্রয়াসী। যিনি যাহাই বলুন, যে শিক্ষার গুণে মানব পশুত্বের পরিবর্ত্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষাই যে নারীজাতিকে সর্ব্বনাশের কূপে নিমজ্জিত করে,—এরূপ বলিয়া এমন গুরুতর বিষয়ে প্রথমেই সরাসরি বিচার চলে না।

সৃষ্টিকর্ত্তা এই সুখ-দুঃখ-সমন্বিত পরিবর্ত্তন-শীল ধরণীপৃষ্ঠে প্রত্যেক জীব-জন্তুর মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সংসারের দুইটী অঙ্গ। এই অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে একাঙ্গ সবল ও কর্ম্মঠ এবং অপরাঙ্গ (স্ত্রীজাতি) স্বভাবতঃ কিছু দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। এই দুই অঙ্গের সামঞ্জস্য বিধান ব্যতিরেকে সংসার যে কদাপি পূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না, তাহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তি উভয় শক্তিরই সমান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যতদিন মোস্‌লেম মহিলা ও বালিকারন্দ অন্তঃপুরের গভীর গহ্বরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া অশিক্ষারূপ শৃঙ্খল পরিধান করিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারা যে পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। আরও একটা কথা আছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে একত্রিত হইয়াই এক বস্তু (পুরুষ) উৎপন্ন হয়। সুতরাং একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটি কখনও প্রকৃত

সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারিবে না। আমরা আমাদের একাঙ্গ দুর্ব্বল রাখিয়া কিরূপে পূর্ণাঙ্গতা ও উন্নতি লাভ করিব? প্রকৃত উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমাদিগের এই দুর্ব্বল ললনাঙ্গকে জ্ঞানরূপ পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা শক্তিশালী করিতেই হইবে। বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলালোক-প্রাপ্ত উন্নতি-সোপানারূঢ় ব্যক্তিবর্গ কি তাঁহাদিগের ললনাবৃন্দকে বাদ দিয়াই এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন? কখনও নহে। তাঁহারা তাঁহাদের নারীকুলের হস্ত ধারণ করিয়াই একযোগে এরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয়দিগের ত কথাই নাই, বঙ্গীয় ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ানগণ যে আজ এত উন্নত, ইহার যথার্থ কারণ,—তাঁহাদের স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা। আজ মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মগণ যে সভ্যতার জয়পতাকা হস্তে চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রভাব ও ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রীজাতির সুশিক্ষাই তাগর মূল নহে কি?

স্ত্রী হইতেই সংসার। সাংসারিক সুখ-দুঃখের একমাত্র নিদান "স্ত্রীজাতি"। স্ত্রীজাতিই গৃহের লক্ষ্মী; এ লক্ষ্মী ব্যতীত গৃহ শ্মশান। শাস্ত্রে আছে,—"নগৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" অতি সত্য সরল কথা। গৃহী হইতে হইলে সকলেরই এই গৃহ-লক্ষ্মী-স্ত্রীর প্রয়োজন। সংসারক্ষেত্রে কি রাজা, কি প্রজা কেহই নিরবচ্ছিন্ন সুখী নয়। এখানে প্রিয়জন-বিরহে পাগল-প্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতে হয়; পুত্রশোকে হায় হায় করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতে হয়; রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়! এই দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসার মাঝারে স্ব স্ব গৃহই একমাত্র পরম রমণীয় ও আরামের স্থল। তাই আমরা দেখিতে পাই, নববধূ শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়-গমনবাক্য-শ্রবণ করিলে পরমানন্দিতা হইয়া থাকে; শ্রমজীবী কুলী মজুরগণ দিবসে প্রভুর বাটীতে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যা সমাগমের প্রারম্ভেই ব্যগ্রতা সহকারে দ্রুত পাদবিক্ষেপে প্রফুল্লান্তঃকরণে সঙ্গীত করিতে করিতে স্ব স্ব পর্ণ কুটীরাভিমুখে গমন করে। বাটীর নাম স্মৃতি পথারূঢ় হইলে প্রবাসীর মন স্বতঃই উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠে। দূর দেশে থাকিয়া রাজা রাজপ্রাসাদের নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুল হন, দরিদ্র ভিক্ষুক পর্ণকুটীরের জন্যও তাদৃশ ব্যাকুল হয়। এই সংসার মরুমধ্যস্থ গৃহ একটি সুশীতল সলিল-পূর্ণ সরোবর। সংসার মরুর মরীচিকা-ভ্রমে পতিত হইয়া, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, মানব এইখানে উপস্থিত হয়, এবং গৃহ সরোবরের সুশীতল পানীয় পান করিয়া, যাবতীয় কষ্ট বিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকাল অতুল

সুখ শান্তি লাভ করিয়া থাকে। সংসারে গৃহ—স্বর্গের ক্ষুদ্র আদর্শ! ইহা যে এত মধুময়, ইহার কারণ একমাত্র স্ত্রীজাতি। পণ্ডিতগণ মানব জীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোত্তম। এই গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় সুখ নারীজাতির গুণেই হইয়া থাকে।

স্ত্রীই- ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ সাধনের মূল। যে স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের এতাদৃশ অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ, সেই পরমারাধ্যা প্রিয়তমা চিরসঙ্গিনীদিগকে চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া যদি শুধু আমরাই আলোকের দিকে অগ্রসর হই, তাহাতে ফল ত কিছু হইবেই না, বরং তাহাতে যে প্রকৃত উন্নতির আশা অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়? উন্নতিলাভ করিতে হইলেই আমাদের মহিলাবৃন্দকে জ্ঞানালঙ্কার দ্বারা সুশোভিতা করিয়া লইতে হইবে; তাহাদিগকে শুধু স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া রাখিলেই আশা সফল হইবে না।

"নারী হিতে পুরুষের হিত সুনিশ্চয়,
উন্নত বা অধোগত একত্রে উভয়।"

স্ত্রীজাতি আমাদের জননীজাতি। স্ত্রীজাতির উপরেই আমাদের সমগ্র হিতাহিত নির্ভর করিতেছে। গৃহই মানবের শিক্ষার সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র। সন্তান জীবনের উষাকালে যে শিক্ষা লাভ করে, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই শিক্ষার ফল তাহার জীবনে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া যায়। মাতাই সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলাধার; আবার মাতাই সন্তানের অধঃপতনের কারণ। যে জননীর উপর সন্তানের এতদূর কল্যাণাকল্যাণ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাকে কি পরিমাণে সুশিক্ষিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণা, নীতিজ্ঞা, চরিত্রবতী প্রভৃতি হওয়া আবশ্যক, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

মাতৃহৃদয় প্রেমের খনি। মাতার সুস্নিগ্ধ প্রেমতরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া ধরণীর বহু শত ত্রিতাপ-তাপিত জীব উত্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিয়া থাকে। কিন্তু যদি মাতা অশিক্ষিতা থাকিয়া নানাবিধ কুশিক্ষা দ্বারা সন্তানকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন, তাহা হইলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে নিশ্চয়ই নানাবিধ পাপ কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে।

প্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ন, কবি কাউপার, গ্রে, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, সার সৈয়দ আহম্মদ, প্রাতঃস্মরণীয় মওলানা

কেরামত আলি সাহেব প্রভৃতি মহাজনবর্গের জীবন তাঁহাদিগের মাতার সুশিক্ষালোকিত উন্নত হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ বই আর কিছুই নহে। পূর্ব্বকালে মুসলমানগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি একান্ত মনোযোগী ছিলেন। তাই তখন তাঁহাদের তদ্রূপ উন্নতিও হইয়াছিল। এখন আমরা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। আমাদের অধঃপতন হইবে না ত কাহার হইবে? একজন জাপানী মাতা সরলান্তঃকরণে গর্ভজাত পুত্রকে বলিবেন,—"সম্রাট দেশের পিতা; তুমি তাঁহার অনুগত হইবে, স্বদেশ প্রেমিক হইবে, তাঁহার জন্য মরিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে। দেশের জন্য স্বজাতির জন্য তোমার প্রাণ যায় যাউক, আপনাকে দেশ হিতের নিমিত্ত অর্পণ কর।" কিন্তু একজন মোস্‌লেম জননী শিক্ষা অথবা ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত পুত্রকে কদাচ কাছ ছাড়া করিতে চাহিবেন না। তিনি বলিবেন,—"বাছা! তোর লেখাপড়া শিখিয়া কাজ নাই। তো'কে কাছছাড়া করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? তুই চিরমূর্খ হইয়া আমার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিয়া থাক্।" পল্লীগ্রামে এইরূপ জননী শত শত বিদ্যমান রহিয়াছেন। এরূপ জননীর অধীন থাকিয়াও আমরা যদি অবনতির চরমসীমায় পদার্পণ না করি, তবে তাহা স্বভাবের বিপরীতই হইবে!

প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া যায়, অন্তঃকরণে উদারভাবের সঞ্চার হয়। ইহার ফলে আপন পর ভুলিয়া স্বজাতির জন্য, স্বদেশের জন্য, জগতের জন্য খাটিতে ইচ্ছা জন্মে। তখন সে হৃদয় সুশিক্ষালোকে প্রতিফলিত হইয়া কুশিক্ষান্ধকার রাশিকে প্রবল ঝটিকার ন্যায় বিতাড়িত করিয়া দিতে সক্ষম হয়। যে স্ত্রীজাতি আমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী ইত্যাদি সমস্ত সম্বন্ধে সম্বদ্ধা, যাহাদের উপর আমাদের সমস্ত সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সেই স্ত্রীজাতি অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারাপন্না থাকিলে সমাজের উন্নতিরআশা কতদূর সম্ভবপর, তাহা একটি বালকেও বুঝিতে পারে। তাই বলি, শুধু আমরা শিক্ষিত হইলেই সমাজ উন্নত হইবে না, দুর্ব্বলা ললনাকুলকেও জ্ঞানরূপ "শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা" সেবন করাইতে হইবে।

মাতৃদোষেই যে বালক বালিকার সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বাল্যজীবনে পিতার অপেক্ষা মাতার প্রভাবই সন্তানের উপর বেশী থাকে। এরূপ অবস্থায় মাতৃকুলের সুশিক্ষার বিধান না করিলে আমাদের ভাবী বংশধরগণেরই বিষম ক্ষতি হইবে। মাতৃকুলের এই অস্বাভাবিক অসুবিধা দূর না করিলে আমাদের ভবিষ্য সমাজের যে ভদ্রস্থতা নাই,

তাহা বুঝিতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। করুণাময় জগদীশ্বরও স্ত্রীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার সে আদেশের অন্যথাচরণ করিয়া কি ঘোর প্রত্যবায়ভাগী হইতেছি না? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেরই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু এই হতভাগিনী মোস্‌লেম মহিলাকুলের কি পরিবর্ত্তন হইবে না? একদিন যে অদৃশ্য অগম্য স্থান অতল সমুদ্র গর্ব্ভে অবস্থিত ছিল, বিচিত্র পরিবর্ত্তন অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে সমুন্নত সুদৃশ্য সৌধমালাশোভিত অথবা বিহগকণ্ঠ-মুখরিত ভ্রমর-গুঞ্জরিত মনোহর উপবন কিম্বা সুপ্রশস্ত রাজপথ পরিশোভিত সমৃদ্ধ নগররূপে রূপান্তরিত করিয়া শ্রীশালী করিতেছে; কিন্তু আমাদের মাতৃকুল আজ পর্য্যন্ত যে তিমিরে, সে তিমিরে! কেন? আমাদের মহিলাকুলের অন্তররাজ্য কি চিরদিনই শ্রীহীন থাকিয়া যাইবে? ন্যায়বান পরমেশ্বর স্ত্রীজাতির সুখ-দুঃখ মোচনের ভার পুরুষের উপরই অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। এমত অবস্থায় এই কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন ও নীরব রহিয়া আমরা কি পাপভাগী হইতেছি না? তবে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তি যত্নতঃ" এই বাক্যটি কি শুধু বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপোক্তি? এরূপ উদাসীনতায় আমাদের সমাজের যথেষ্ট ক্ষতিই হইয়াছে। এখনও মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে যত্নবান হউন, প্রার্থনা করি।

শেখ আব্দুস্ সামাদ।

মোগল সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

(৩)

ভারতবর্ষের অধিপতি হুমায়ুনের পৌত্র ও আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর প্রজা এবং প্রতিবাসী উভয়েরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া ত্রয়োবিংশ বর্ষ শান্তিতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী তদীয় দুই পুত্রের নিকট তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়! জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে পরাজিত করতঃ রাজ-তক্ত অধিকার মানসে লাহোরের নিকট এক শক্তিশালী

সৈন্যদল গঠন করেন। * সম্রাট পুত্রের এবম্বিধ অবাধ্যতায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ে এক বিপুল বাহিনী লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হন এবং তাঁহাকে পরাজিত করতঃ বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। ঐ সঙ্গে যুবরাজের পক্ষভুক্ত বহুতর সম্রান্ত ব্যক্তিও শৃঙ্খলিত হন। অতঃপর বাৎসল্য-স্নেহে অভিভূত হইয়া সম্রাট পুত্রের জীবনরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অক্ষিদ্বয় উৎপাটিত হইল। অন্ধ অবস্থায় পুত্রকে সম্রাট নিরন্তর সকাশে রাখিতেন। এই সময় সম্রাট অন্ধপুত্রের জ্যেষ্ঠ তনয় বৌলকিকে † সিংহাসন প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বৌলকির আরও কতিপয় ভ্রাতা ছিল, কিন্তু তাহারা তৎকালে নিতান্তই শিশু। এদিকে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান খোররম নিজ আশা-লতাকে নির্ম্মূল ও ভ্রাতুষ্পুত্রের আশা-লতাকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে নির্ম্মূল করিতে এবং পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায়ের প্রতিই আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। তাঁহার এই অনুবর্ত্তিতাই তাঁহার ভাবী উন্নতির কারণ হইল। কারণ এইভাবে পিতার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করতঃ অন্ধ যুবরাজকে—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশ ডেকানে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি পিতাকে বুঝান যে, যে বস্তু তাঁহার প্রীতিকর নয়, বরং প্রভূত ক্লেশের কারণ, তাহা চক্ষের সম্মুখে রাখার পরিবর্ত্তে অন্তরালবর্ত্তী করাই ভাল। যুবরাজ নিজেও অন্ধ হওয়ায় জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বচ্ছন্দ চিত্তে ডেকানে কাটাইতে পারেন, যেহেতু তথায় তিনি আরও একাকী হইতে পারিবেন। সম্রাট পুত্রের দুরভিসন্ধি ভেদ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নিজের গোপনীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নিমিত্ত যুবরাজ অন্ধ ভ্রাতাকে করতলাগত করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অদ্ভুত প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত লোক-লোচনের দূরান্তরালবর্ত্তী করিয়া রাখিলেন।

অন্ধ যুবরাজের মৃত্যুর পর সুলতান খোররম 'শাহ-জাহান' (পৃথিবীর

* যুবরাজ খসরু।

† যুবরাজ দাওয়া বেকো।

অধিপতি) উপাধি পরিগ্রহ করেন এবং অধিকৃত উপাধি-গৌরব রক্ষার মানসে সৈন্যসংগ্রহ করতঃ ভ্রাতার আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে অর্থাৎ পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া রাজদণ্ড অধিকার করিতে চেষ্টিত হইলেন। অন্ধ-পুত্রের হত্যায় এবং নিজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় সম্রাট মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার এই অসমসাহসিকতার জন্য লাঞ্ছিত করিতে একদল শক্তিশালী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহী যুবরাজ পিতার বিপুল বাহিনীর সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবেন না আশঙ্কা করিয়া, কতিপয় অনুচর সহ ডেকান পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হন। এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন। ইহার পর তিনি ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন। সম্রাট স্বয়ং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ও রণ-নিপুণ যোদ্ধাসহ বিপক্ষতাচরণ করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হওয়ায় এবং পুত্রগণের ব্যবহারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ায়, শাহজাহানকে মনস্কামনা পূর্ণ করিবার পূর্ণ-স্বাধীনতা দিয়া, পথিমধ্যে নশ্বর-কায়া পরিত্যাগ করেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বে সদাশয় সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী আসফ খাঁর হস্তে পৌত্র বৌলকিকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন। বৌলকিই রাজ্যের আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া তৎপ্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন। এবং সুলতান কোমরমকে * বিদ্রোহী ও উত্তরাধিকারীর অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্রাট আসফ খাঁকে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লন যে, যাহাই কেন ঘটুক না, তিনি বৌলকিকে কখনও স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ডালি দিবেন না। আসফ খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত শাহজাহানের বিবাহ হয়। তিনি তৎকালে চারিটী পুত্র এবং দুইটী পুত্রী প্রসব করিয়াছিলেন। কাযেই শাহজাহান যাহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তৎপ্রতিই আসফ খাঁর লক্ষ্য ছিল। এবং তজ্জন্যই তিনি মুমূর্ষ সম্রাটের সম্মুখে বৌলকিকে সিংহাসন প্রদান করিবেন বলিয়া কোনরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন না।

সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে চারিদিকে শোক-পারাবার উথলিয়া উঠে। রাজ্যের প্রধান আমীর ওমরাহগণ একত্র হইয়া শিশু সুলতান বৌল-

---

* যুবরাজ খোররম হইবে।

কিকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাঁর দুইটি ভ্রাতা (Cousins-german) ছিল; তাঁহারা সম্রাটের আদেশ ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হন। * সায়েস্তা খাঁর পিতা এবং শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁর ক্রূর দৃষ্টি এই দুই যুবরাজের প্রতি পতিত হওয়ায়, তাঁহারা নিজ জীবনের, শিশু সম্রাটের জীবনের ও রাজ্যের আশঙ্কা করেন এবং তদ্বিষয়ে ভ্রাতাকে—শিশু সম্রাটকে সাবধান করিয়া দেন। বালক সম্রাট সংসারের কিছুই জানেন না। তিনি সরল প্রাণে ভ্রাতৃগণের আশঙ্কার কথা আসফ খাঁর নিকট ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ কথা সত্য কিনা? ইহাই তাঁহার ভ্রাতৃগণের জীবনের এবং স্বরাজ্যের পরিপন্থী হইল। আসফ খাঁ তদ্দণ্ডেই যুবরাজ দ্বয়কে অবিমৃষ্যকারী এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়া, সম্রাটের প্রতি নিজের অনুরক্তির কথা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিবেন, প্রতিশ্রুত হন। যাহা হউক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় আসফ খাঁ যুবরাজ দ্বয়ের প্রতি কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদিগকে করতলগত করেন; পরে গোপনে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া উন্নতি পথের কণ্টক বিনাশ করিলেন। এই ঘটনার পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য বিভাগে এবং রাজ্যের উপর প্রভুত্ব থাকায় আসফ খাঁ শাহজাহানের পক্ষীয় লোককেই অধিকাংশ সেনাপতি পদে ও ওমরাহ পদে বরণ করেন এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে বাজিমাৎ করিবার ও বালক সম্রাটকে প্রবঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে রটনা করেন যে, শাহজাহান মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু কালীন অনুরোধ,—পিতা জাহাঙ্গীরের সমাধি পার্শ্বে তাঁহার মৃতদেহ যেন সমাধিস্থ করা হয়;—তন্নিমিত্ত তাঁহার শব আগ্রায় আনীত হইতেছে। সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক করিয়া আসফ খাঁ স্বয়ং শিশু সম্রাটকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, মোগল বংশের যুবরাজের মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; সুতরাং সম্রাট যেন অগ্রবর্ত্তী হইয়া শব আনয়ন করেন। এপর্য্যন্ত শাহজাহান প্রকাশ্য ভাবেই অগ্রসর

* বর্ণিয়ো লিখিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর মোস্‌লেম ধর্ম্মের প্রতি বীতস্পৃহ থাকায়, তাঁহার শাসনকালে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং সম্রাটের আদেশে এই দুই যুবরাজকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বর্ণিয়ো লিখিয়াছেন,—These Fathers the Jusuits entertained great hopes of the progress of Christianity in the time of king Jehan-Guire, because of his contempt of the Mahumetan Law, and the esteem he professed to the*christian, even giving way to two of his nephwes to embrace the christian religion...." P. 271.

হইতেছিলেন। আগরায় রক্ষিত সৈন্যদলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি একটি শবাধারে প্রবিষ্ট হন। তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলাচলের জন্য একটি ছিদ্র ছিল। এই শবাধার একটি তাম্বুর তলে লইয়া যাওয়া হইলে, আসফ খাঁর দলের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারিবৃন্দ শব সমাধিস্ত করিবার ছলে একত্র হইলেন। এই সময় বালক সম্রাটও সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে আসিয়াছিলেন। আসফ খাঁ ইহাই মাহেন্দ্র-ক্ষণ ভাবিয়া শবাধারের মুখ উদ্ঘাটন করিতেই শাহজাহান বহির্গত হইয়া সৈন্যগণকে দর্শন দিলেন। তাহারা, তাহাদের দলপতিগণ এবং রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করতঃ অভিবাদন করিলেন। সুতরাং শাহজাহানের নাম মুহূর্ত্তমধ্যে একমুখ হইতে অন্যমুখে প্রচারিত হইতে থাকায়, সাধারণ্যে তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী শাহজাহানের প্রতিই প্রসন্ন হইলেন। বালক সম্রাট পথিমধ্যে অকস্মাৎ এই সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জীবন রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ই তিনি চিন্তা করিতে পারিলেন না। এইরূপে বৌলকি স্বজন ও অনুচরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন-পর হইলেন। শাহজাহান তাঁহার অনু-শরণ করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করায় বহুদিন বৌলকিকে ফকিরের বেশে ভারতবর্ষে বিচরণ করিতে হয়। অবশেষে তিনি পারস্যে গমন করেন। তথায় শাহ সেকি কর্ত্তৃক তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হন। শাহ তাঁহার উপযুক্ত পেনশনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। *

শাহজাহান এই ভাবে জবরদস্তিতে সিংহাসন অধিকার করতঃ যাঁহারা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বালক সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। এইরূপে তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগ নানা অবৈধ ও নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ হয়, ইহাতে তাঁহার শুভ্র যশঃ-সৌরভ কলঙ্ক কালিমাচ্ছাদিত হইয়া আছে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগও এতদপেক্ষা কম শোচনীয় নহে। যে রাজ-সিংহাসন শাহজাহান আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া অধিকার করেন, সেই সিংহাসন হইতে

* এলফিন্‌ষ্টোন্‌ Olearins Ambassadar's Travels এর বিবরণী অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—"Dawar sheko (also called Bolaki), who hadbeen set up for king by Asof khan, found means to escape to Persia, where he was aftwardrs seen by the Holstein ambassadors in 1 ."

তিনি জীবিতাবস্থাতেই পুত্র আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিচ্যুত হইয়া আগরার পাষাণ-কারায় বন্দী হইয়া থাকেন। ৩)

দারা সোম নগরের সমতল ক্ষেত্রে সহোদর আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বক্স কর্ত্তৃক পরাজিত এবং সৈন্য বিভাগের প্রধান সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় সৈনিকগণের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া অবশিষ্ট ধনসামগ্রী সহ লাহোর রাজ্যে প্রস্থান করেন। সম্রাট জয়োদ্দীপ্ত পুত্রদ্বয়ের কার্য্যে বাধা দিতে যাইয়া আগরা প্রাসাদে বন্দী হন। তথায় বসিয়া তিনি পুত্রগণের কার্য্য পর্য্যালোচন করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব—মুরাদ বক্স হইতে নিরুদ্বেগ হইয়া আগরায় প্রবেশ করতঃ শাহজাহানের অলীক মৃত্যু সংবাদে বিশ্বাস করিবার ভান করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব যতই এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, সম্রাট ততই জীবিত আছেন বলিয়া প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষমতা ও সৌভাগ্য উভয়ই আওরঙ্গজেবের পক্ষভুক্ত হইতে দেখিয়া এবং পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হওয়ায়, সম্রাট প্রাসাদের কর্ত্তা ফজল খাঁর দ্বারা পুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। সম্রাট ঐ সঙ্গে আদেশ করেন যে, আর বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া আওরঙ্গজেব যেন সত্বর নিজের শাসন প্রদেশ ডেকানে গমন করেন। তিনি যদি এই আজ্ঞা নীরবে পালন করেন, তবে সম্রাট তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আওরঙ্গজেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;—তিনি ফজল খাঁকে বলিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—তাঁহার পিতা—সম্রাট পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তদ্ধেতু নিজের জন্য সিংহাসন অধিকার করিতে তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। কারণ অপরাপর ভ্রাতৃবৃন্দের অপেক্ষা তিনিই এই পদের উপযুক্ত পাত্র। যদি তাঁহার পিতা জীবিত থাকেন, তবে তৎপ্রতি প্রগাঢ়ভক্তি প্রদর্শন করিতে তিনি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক এবং তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করতঃ নিজকে বিপন্ন করিতে তিনি সাহসী নন। সম্রাট যে জীবিত আছেন, তাহা নিশ্চিত জানিবার জন্য তিনি একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার পদ চুম্বন করিতে ইচ্ছুক; তাহা হইলেই তিনি স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবেন। ফজল খাঁ সম্রাটকে এই কথা জানাইলে সম্রাট প্রকাশ করেন যে, আনন্দের সহিত তিনি আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য ফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব পিতা শাহ-

জাহান অপেক্ষাও চতুর। তিনি ফজল খাঁকে * বলিলেন যে, প্রাসাদে যে সৈন্যদল আছে, তাহা বাহির করিয়া নিজের লোকজন থাকিবার ব্যবস্থা না করিলে, তিনি একপদও অগ্রসর হইবেন না। কারণ তাঁহার ভয় হয়, পাছে তিনি শত্রু পুরীতে প্রবেশ করিয়া বিপদগ্রস্ত হন। তৎকালে কি করা সঙ্গত কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সম্রাট তাহাতেই সম্মত হন। এইরূপে শাহজাহানের প্রাসাদ হইতে সমস্ত সৈন্য দূরে সরাইয়া আওরঙ্গজেব স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মোহাম্মদের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য পিতৃ প্রাসাদে প্রেরণ করেন। আওরঙ্গজেব পুত্রকে আদেশ করেন যে, পিতার দেহ যে রকমেই হউক, অধিকার করিতে হইবে। এই ভাবে সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে এবং পিতার দেহ স্বপক্ষের লোকের দৃষ্টির মধ্যে আসিলে আওরঙ্গজেব নানা রূপ টাল বাহনা করিয়া সম্রাড়্দর্শনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি প্রচার করিলেন যে, জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এসময় সম্রাটকে দর্শন করিলে শুভ হইবে না। এই অছিলায় তিনি শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবার অপেক্ষায় আগরা হইতে ২।৩ লীগ দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার লোকজন ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। পিতা-পুত্রের এই ব্যবহার,—পুত্রের হস্তে পিতার ক্লেশ যত সত্বর শেষ হয়, তাহাই ঘটাইবার জন্য তাহারা ঔৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য আওরঙ্গজেব ব্যস্ত নহেন; তিনি তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া কার্য্য পণ্ড করিতে পারেন না। তাই দারাশাহ যে সকল ধনরত্ন ফেলিয়া গিয়াছেন, পিতার সেই সকল ধন সামগ্রী অধিকার করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতার অতিপ্রিয়া, নিজের সহোদরা বেগম সাহেবাকে পিতার নিকট রাখিবার নিমিত্ত ঐ প্রাসাদেই তাঁহাকে আওরঙ্গজেব বন্দী করেন। † তৎপর পিতার বদান্যতায় বেগম সাহেবা যে সকল ধন সম্পত্তির অধিকারিনী হইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই নিজে অধিকার করিলেন।

পুত্রের এবম্প্রকার ব্যবহারে শাহজাহান অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করেন এবং যে সকল রক্ষী তাহাতে বাধা প্রদান করে, তাহাদিগকে

---

* বর্ণিয়ো বলেন যে, ফজল খাঁ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক সামান্য খানসামার পদ হইতে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

† অনেকে বলেন, পিতার প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও ভালবাসা প্রযুক্ত বেগম সাহেবা স্বেচ্ছাক্রমেই বন্দী হন।

হত্যা করেন। ইহাতে আওরঙ্গজেব তাঁহার অবরোধের আরও কড়াকড়ি বন্দোবস্ত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, একাল পর্য্যন্ত অসংখ্য অনুচরের মধ্যে একজনও শাহজাহানের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নবোদিত ভাস্করের প্রতি চক্ষু ফিরাইল; সকলেই আওরঙ্গজেবকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল। জীবিত থাকা সত্ত্বেও শাহজাহানের কথা কাহারও স্মৃতি পথে উদিত হইল না! এইরূপে মহা প্রতাপান্বিত নরপতি বন্দীশালায় শোচনীয় ভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে আগরা-দুর্গে অমর জগতের যাত্রী হন। টাভারনিয়ারেরও ইহাই শেষ ভারত-প্রবাস।

শাহজাহান জাহানাবাদ নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিতে পারিয়াছিলেন না। তজ্জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত স্থান আর একবার দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার অবসর দেন নাই। তিনি বলেন, যদি সম্রাট জলপথে যাইয়া দেখিয়া আসেন, কিম্বা জাহানাবাদ দেখিয়া তথাকার প্রাসাদেই বন্দী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে যাইতে দিবেন, নতুবা নহে। পুত্রের এই কথায় সম্রাটের মনে দারুণ ঘৃণার সঞ্চার হয়। এই ঘটনাই সত্বর তাঁহার মৃত্যু আহ্বান করে। তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইবা মাত্র আওরঙ্গজেব দ্রুতপদে প্রাসাদে গিয়া পিতার জীবিতাবস্থায় যে সকল ধনরত্নাদি অপহরণ করিতে পারিয়া ছিলেন না, তৎ সমুদয় অধিকার করেন। যে সময়ে বেগম সাহেবা বন্দী হন, সেই সময়ে তাঁহার নিকট কিছু ধনরত্ন ছিল। এক্ষণে পিতার ধনরত্ন হস্তগত করিয়া আওরঙ্গজেব এক অদ্ভুত উপায়ে ভগিনীর ধন গ্রহণ করিলেন। তিনি মুখে ভগিনীর প্রতি মহা সমাদর ও সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া জাহানাবাদে যাত্রা করেন। কিয়দ্দিবস পর বেগম সাহেবার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল। যিনি শুনিলেন, তিনিই বলিলেন—বিষ-প্রয়োগেই তাঁহাকে লোকান্তরিত করা হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

শিবাজী-উৎসব ও মুসলমান জাতি।

ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই জাতিই প্রধান। এই দুই জাতির মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব থাকাই যে উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাতে এই দুই মহাজাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বন্ধন দৃঢ় থাকে, তজ্জন্য অনেক মহাশয় ব্যক্তি নানা উপায় উদ্ভাবন করত কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন ইহা সুখের বিষয় বটে। মঙ্গলময় ইঁহাদের চেষ্টা ফলবতী করুন।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুভ্রাতাই বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহারাই অগ্রণী বলিয়া বোধ হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা কংগ্রেস-মহাসমিতিতে, স্বদেশী আন্দোলনে, শিবাজী-উৎসবে মুসলমান দিগকে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। কংগ্রেস মহাসমিতিতে অথবা স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। শিবাজী-উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, কেবলমাত্র তাহাই সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ইতিহাস-পৃষ্ঠায় শিবাজী যেরূপ ভাবে চিত্রিত, সেই শিবাজীর-উৎসবে মুসলমানগণের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, পাইওনিয়র, মুস্ক ও মিল্লত এবং সুধাকর পত্রিকায় অনেকেই লেখনী-সঞ্চালন করিতেছেন। তদ্দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ইতিহাস-বর্ণিত শিবাজীর উৎসবে মুসলমানের যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুভ্রাতৃগণ যেরূপ ভাবে শিবাজী-উৎসব করিতেছেন, তাহাতে আমাদের যোগ দেওয়া বিধেয় কিনা? কলিকাতা মহানগরীতে মহা আড়ম্বরের সহিত যে শিবাজী-উৎসব বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সম্পাদিত হইল, তাহাকেই আমরা আদর্শ স্বরূপ গণ্য করিতে পারি। এই শিবাজী-উৎসবেও মুসলমানদের যে যোগ দেওয়া আদৌ উচিত নহে, তাহার নিম্নলিখিত কারণাবলী প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিবাজী-উৎসব সম্পূর্ণ ইসলাম-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও হিন্দু ভাবাপন্ন। উৎসবের প্রারম্ভে সিংহবাহিণী ভবানীর পূজা ; হিন্দুভ্রাতৃগণ প্রথমে ভবানীর পূজা সম্পন্ন করিলেন ; পরে বক্তৃতাদি হইল এবং সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্মমতে উৎসব সমাপ্ত করিলেন। যে উৎসবের আদি অন্ত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত দেব-দেবীর পূজার্চ্চনায় পরিপূর্ণ, সেই উৎসব ইসলাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মূর্ত্তিপূজা ইসলাম-ধর্ম্মে একবারেই নিষিদ্ধ। এমন কি, মূর্ত্তিপূজকদের সহিত মুসলমানের আলাপ পরিচয় ও আচার ব্যবহার করাও সম্পূর্ণ অনুচিত। হিন্দুভ্রাতৃগণ যেরূপ ভাবে শিবাজী-উৎসব সম্পন্ন করিলেন, তাহাতে এইরূপ সম্প্রদায়িকত্ব পূর্ণভাবে বিরাজমান ; সুতরাং তাহাতে মুসলমানগণ স্বীয় ধর্ম্মবিধি পদদলিত করিয়া কিরূপে যোগ দিতে পারে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। হিন্দুভ্রাতৃগণ এ স্থলে বলিতে পারেন যে, মুসলমানগণ হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত মূর্ত্তিপূজাদিতে যোগদান না করিয়াও শিবাজী-উৎসবে যোগ দিতে পারেন। তাহাতে আমাদের উত্তর এই যে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই যুক্তি দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ; কারণ,—উল্লিখিত যুক্তি মতে মুসলমানগণ দুর্গা বা কালী পূজায় যোগ না দিয়া নাচ তামাসায় যোগ দিতে পারেন। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সেই রূপ করিতে গেলে পৌত্তলিকতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দেওয়া হয় ; সুতরাং স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ মুসলমান কখনই তাহাতে যোগ দিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস মহাসমিতি যেমন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার এবং স্বদেশী আন্দোলন যেমন রাজনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, শিবাজী-উৎসবও তদ্রূপ এক রাজনৈতিক উৎসব। রাজনীতি বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য। হিন্দু-ভ্রাতৃগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রগামী হইয়াছেন ; পক্ষান্তরে মুসলমানগণ এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুভ্রাতৃগণ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইংরাজরাজের রাজনীতিতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত আছেন ভাবিয়াই গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে এরূপ নানা আন্দোলন করিতেছেন। সেই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসী যদি কোন রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে, মুসলমান যে তাহার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহা নহে ; কিন্তু সুফল ও কুফলের মধ্যে হিন্দুভ্রাতৃগণই

সুফল উপভোগ করিবেন এবং কুফলের ভাগটা মুসলমানের ভাগ্যেই প্রদত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এখনই দেখুন না কেন, এই যে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, ইহাতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই অধিকতর লাভবান। মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে মুসলমানগণের প্রবেশাধিকার কতদূর, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এক কথায়,—তৎসমুদায় হিন্দুভ্রাতৃগণের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতেছি, রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দেওয়ার সময় এখনও মুসলমান-দের উপস্থিত হয় নাই।

আর এক কথা। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—দেশের যিনি শত্রু ছিলেন, শিবাজী তাঁহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ছিলেন। দেশের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলে শিবাজীর হস্তে হিন্দু-মুসলমান কাহারও নিস্তার ছিল না। হিন্দুভ্রাতৃগণ যদি শিবাজীর সেই নীতি অবলম্বন ও অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে শিবাজী-উৎসব করিয়া থাকেন, তবে তাহা হইতে আমাদের দূরে থাকাই শ্রেয়স্কর। কারণ,—সর্ব্বাগ্রে ইংরাজরাজকেই দেশের শত্রু বিবেচনা করিয়া তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন। আমরা মুসলমানগণ কখনই সেরূপ উৎসবের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারিব না। যেহেতু, যিনি দেশের রাজা,—যিনি দেশের অধীশ্বর, তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমাদের ধর্ম্মনীতির বহির্ভূত। শিবাজী-উৎসবকে সেইজন্য অনেকে সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

তারপর ইহা একরূপ স্বীকার্য্য যে, হিন্দু সাধারণ মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন এবং মুসলমানকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অবশ্য উদার চরিত, উন্নতমনা হিন্দুভ্রাতৃগণের প্রতি একথা খাটে না। মুসলমানকে হিন্দুরা শত্রু বলিয়া মনে করেন, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শিবাজীর পূর্ব্বোক্ত নীতি অনুসরণকারী হিন্দুভ্রাতৃ-গণের হস্তে মুসলমানদের যে দুর্দ্দশা বা লাঞ্ছনা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? শিবাজী মুসলমানদের শত্রু ছিলেন; সুতরাং হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ও বিবাদ জাগাইয়া তোলাও শিবাজী-উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। যদি তাহাই প্রকৃত হয়, তবে শিবাজী-উৎসবে মুসলমানগণ যতই যোগ না দেয়, ততই ভাল।

তৃতীয়তঃ— ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে, হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করাই

শিবাজীর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জন্য শিবাজী না করিয়াছেন, এমন কার্য্যই নাই। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের শিবাজীর জীবন ব্যাপী লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া,—তাঁহার অন্তরের অন্তস্তর-নিহিত ভাবে-অনুপ্রাণিত হইয়াই যে শিবাজী উৎসবে মাতিতেছেন, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। নহিলে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ভবানীর পূজা সম্পাদন করত শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন না। তবেই দেখা যাইতেছে, যে উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, তাহাতে কোন স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান মুসলমানই যোগ দিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার হউক, আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু মুসলমানেরা তাহার সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ সম্পূর্ণ অক্ষম। যে উৎসবে হিন্দুধর্ম্মের সংশ্রব আছে, যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায়তা করে, সেরূপ উৎসবে মুসলমানের যোগ দেওয়া মহা পাতকের কথা; কারণ উহাতে প্রকারান্তরে হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিস্তৃতি পক্ষেই সাহায্য করা হয়।

অতএব এতদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, হিন্দুভ্রাতৃগণ যে ভাবে, যে প্রকারে শিবাজী-উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে মুসলমানের যোগ দেওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ শিবাজী-উৎসব-প্রসঙ্গে বিগত আষাঢ় মাসের—'প্রবাসী' পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

'প্রবাসী' সম্পাদক লিখিতেছেন :——

"গত মাসে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবটি দূরদর্শিতার সহিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে করিতে না পারিলে ইহা হইতে ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে মনে হইতে পারে যে শিবাজী মুসলমানের শত্রু; সুতরাং শিবাজী উৎসবের অর্থ হিন্দু মুসলমানের বিবাদ জাগাইয়া তোলা, এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে উৎসব করিলে এইরূপ ফলই হইতে পারে। কিন্তু শিবাজী উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ হওয়া উচিত। শিবাজীর সময়ে তাঁহার দেশের প্রধান শত্রু ছিলেন কতকগুলি মুসলমান। তখন তাঁহাদিগকে বিদেশী অত্যাচারী বা দেশদ্রোহী মনে করিবার কারণ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদের শত্রুতা করিয়া ছিলেন। শিবাজী স্বদেশদ্রোহী হিন্দুকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। আমরা তজ্জন্য

শিবাজী-চরিত্র হইতে এই উপদেশ লাভ করি যে, যে কেহ দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু, সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, আমাদিগকে প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য্যের বিরোধী হইতে হইবে। * * * * * শিবাজী-উৎসব রাজনৈতিক উৎসব। কলিকাতার উৎসবের বন্দোবস্তকারীরা মুখে ইহা স্বীকার করিলেও ইহাকে অনেকটা হিন্দুসাম্প্রদায়িক উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন বটে যে, যাঁহারা মূর্ত্তি পূজক নহেন, তাঁহারা সিংহবাহিনীর পূজা বাদ দিয়া উৎসবের অন্যান্য অংশে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কাজ এরূপ চুল চিরিয়া করা যায় না। ইহা কতকটা নিরামিষ ভোজীকে মাছের ঝোলের মাছ বাদ দিয়া আলু খাইতে বলার মত। মনে করুন, কতকগুলি মুসলমান যদি আকবরকে বা অন্য কোন মুসলমান রাজাকে ভারতের একজন সর্ব্বজন-বন্দনীয় বীর মনে করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব করেন ও বকর-ঈদের মত গোহত্যাকে ঐ উৎসবের অঙ্গ করেন ও বলেন যে, হিন্দুরা গোহত্যা ব্যতীত উৎসবের অন্যান্য অংশে যোগ দিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুরা উহাতে যোগ দিতে পারেন কি? নিশ্চয় পারেন না। এই জন্য শিবাজী-উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক করা উচিত। মাছিমারা কেরানীর ন্যায় শিবাজী যাহা করিতেন, তাহারই নকল করিলে কোন ফল হইবে না। তাঁহার জীবনের মূলনীতি অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা শিবাজীর হিন্দু অহিন্দু অনুরাগী ভক্ত মাত্রকেই ভবানীর পূজা করিতে হইবে, (উৎকৃষ্ট রাইফল পরিহার করিয়া) তরবারি ধরিতে হইবে, 'বাঘ নখ' দ্বারা বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া শত্রুর পেট চিরিয়া দিতে হইবে, সন্দেশের ঝুড়ির ভিতর বসিয়া দিল্লী হইতে পলাইতে হইবে বা চারিটি বিবাহ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।" *

ও-আলি।

* এই প্রবন্ধের মতের সহিত আমরা এক মতাবলম্বী হইতে পারি নাই। শ্রদ্ধেয় লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন যে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যেই কোহিনূরের প্রচার। বারান্তরে আমরা এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইব। কোঃ সঃ।

সোলতান মাহ্‌মুদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

যেই সঙ্কল্প, পরক্ষণেই কার্য্যারম্ভ,—ইহাই মাহ্‌মুদ চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। এরূপ প্রকৃতি বশতঃ তিনি অচিরেই ভ্রাতৃ-বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। তিনি স্বয়ং সমর-বিশারদ এবং প্রভূত বিক্রমশালী ছিলেন; আপনার সৈন্যগণকেও তাদৃশ সমর সচিবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ছিল না। তিনি আপনার যোদ্ধৃগণসহ রণ-দুন্দুভি বাজাইয়া, যোধরাবে আকাশ মণ্ডল শব্দায়মান করিয়া বীরদর্পে নাচিতে নাচিতে অমিত সাহসে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে এস্‌মাইলও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ভ্রাতার যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ শ্রবণে আপনার বিশাল অনীকিনী সহ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এস্‌মাইল যদিও বীরত্বে ও কার্য্যদক্ষতায় পিতার সমকক্ষ ছিলেন, তথাপি প্রকৃত পক্ষে বলিতে হইলে, তখন পর্য্যন্ত তাদৃশী কার্য্যদর্শিতা ও পরিপক্কতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। যাহাহউক, উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইলে ভীষণ যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। বীরগণের সদম্ভ পাদক্ষেপে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল, হয়-হস্তি পদাতিক-অশ্বারোহী সমর-সমুদ্রের গভীর আবর্ত্তে পতিত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল! কতজন বা সমর-সাধ মিটাইয়া শ্লথ-কলেবরে যদৃচ্ছা ভাসিয়া চলিল। জয়-পরাজয় বিধাতার ইচ্ছাধীন! পবিত্র কোরাণ শরিফেও উক্ত হইয়াছে, "খোদা যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন (প্রসন্ন হন), তাহার সম্মান (এজ্জত) বৃদ্ধি করেন ও যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন (বিরূপ হন), তাহাকে অসম্মানের পিচ্ছিল পঙ্কে নিক্ষেপ করেন।" সাফল্য লাভ করিব,—এই আশায় বুক বাঁধিয়া এ সংসারে সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; কিন্তু কয়জনে সেই মধুর ফল আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? কাহার ভাগ্যে কি সংঘটিত হইবে, কে বলিতে পারে? এই যে ভ্রাতৃযুগল আজ ভাগ্য পরীক্ষায় উন্মত্ত, কুহকিনী আশার কুহকে ইহাঁদের মধ্যে কেহই কি পশ্চাৎপদ হইব বলিয়া মনে ভাবিতেছেন? কেহই নহে; কিন্তু ঐ দেখুন,—চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, নিশ্বাসের গতি ফিরিতে না

ফিরিতেই বিচারপতি বিধাতা জয়-মুকুট মাহ্‌মুদের শিরে পরাইয়া দিলেন! তখন দশদিক্ বিকম্পিত করিয়া মাহ্‌মুদের বিজয়-ভেরি নিনাদিত হইতে লাগিল; গজনীর নহবত-খানায় মাহ্‌মুদের গৌরব-ডঙ্কা বাজিতে লাগিল; রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশে মাহ্‌মুদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল! এস্‌মাইলের সমস্ত আশা-ভরসা ভস্মস্তূপে পরিণত হইলেও তাঁহার সেই যুবক-হৃদয় দমিত হইল না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন না; কিন্তু অবশেষে সুলতান মাহ্‌মুদ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

মোজাম্মেল হক্।

সমাজ-নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মানব সমাজের উন্নতি কাহাকে বলে? সমাজস্থ জনগণের মনুষ্যত্ববৃদ্ধি করার নাম সমাজোন্নতি। পশুত্বের উপর মনুষ্যত্বের প্রাধান্য স্থাপন করাই সমাজের উদ্দেশ্য। মনুষ্য ভাব নিধি,—নানা ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। নৈতিকবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সৌন্দর্য্যস্পৃহাবৃত্তি, বাসনা বা কামবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি নিচয় মনুষ্যকে চালিত করিতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ধর্ম্মবিশ্বাস, নীতি-শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য, নৌ-চালন, রাজ্যশাসন প্রভৃতির কোন একটির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে অন্যান্য গুলিরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, মানবপ্রকৃতির বৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বৃত্তির অধিক উন্নতি হইলে মানবজাতির উন্নতি হয় কি না? অর্থাৎ তৎ সঙ্গে সঙ্গে অপর সৎ প্রকৃতিগুলির উন্নতিও অনি-বার্য্য কি না? অনেক সমাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরই এই মত যে, বুদ্ধিবৃত্তির অত্যন্ত উন্নতি হইলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কার্য্যকরণ পক্ষে স্বয়ং একটি দুর্ব্বলবৃত্তি হইলেও ইহা অন্যান্য বৃত্তির চালক এবং ইহা একার শক্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য না

করিয়া অন্যান্য বৃত্তির একতাসম্পাদন করিয়া একতার বল সঞ্চয় করে। বাসনা বা কাম, ভাব ও প্রবৃত্তি, বুদ্ধি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে অধিক শক্তি সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক অবস্থায় বাসনা বা কাম, ভাব ও প্রবৃত্তি, সমুদয় শক্তিসহকারে—শক্তির পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা অশ্ব; বুদ্ধিই তাহাদের চালক। প্রতি ব্যক্তিতে বিবেকবুদ্ধি অপেক্ষা কাম, হিংসা, দ্বেষ, লোভ মোহ এবং ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ অধিক শক্তি-শালী; কিন্তু এই রিপুগণের কার্য্য হইতেই বিরোধ সংঘটন হয়;—বুদ্ধির কার্য্য একতা সম্পাদন করা। সমাজে একতার প্রয়োজন; সুতরাং বুদ্ধি সর্ব্ব রিপুগণকে সুপরামর্শ দিয়া স্বীয় অধীনে রাখিয়া এক উদ্দেশ্যে একত্র কার্য্য করিতে নিযুক্ত করে। নহিলে দুর্ব্বলবুদ্ধি সমাজ শক্তিহীন হয়। এক বিশ্বাস ও এক মত না হইলে রিপুগণ একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারে না; পরস্পরের সহিত বিরোধ ঘটায়,—বুদ্ধিই একতা সম্পা-দন করে। এই জন্য ব্যষ্টিভাবে রিপুগণ প্রবল শক্তিযুক্ত হইলেও সমষ্টিভাবে কার্য্য করিতে হইলে বুদ্ধিই অতিশয় শক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। মানবের পশুপ্রকৃতির (যেমন আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন) ও বাসনার উত্তেজনাতেই প্রথমে বুদ্ধি উত্তেজিত হয় এবং সমাজের প্রথম অবস্থায় পশুপ্রকৃতিও বাসনা বুদ্ধির পন্থা নির্ণয় করিয়া দেয়। কিন্তু কালসহকারে বুদ্ধি নিজের শক্তি বুঝিতে পারিয়া স্বাধীনতা গ্রহণ করে ও পশুপ্রভৃতি এবং বাসনাকে নিজের মতে চালিত করে। সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ ও বাসনা পূরণ করিতে হইলে সমবেত কার্য্যের প্রয়োজন এবং সমবেত কার্য্য এক সাধারণ বিশ্বাসমূলক। সুতরাং জগতের সমস্ত মানবিক সমাজ কতকগুলি মূল বিশ্বাস বা মতের উপর স্থাপিত; সেই বিশ্বাস বা মত অনুমিতি দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং সেই বিশ্বাস বা মত অন্যান্য বৃত্তি নিচয়কে একই বাসনাপূরণার্থ নিয়োজিত করে। এই জন্য মানব সমাজের বিশ্বাস ও মতের ইতিহাসই মানবজাতির ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ।

সমাজিক বিজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে মহাত্মা অগস্ত কোমৎ একটি উদাহরণ দিতেন। ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে ভারত-বাসীকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন দ্বারা এমন উপায় আবিষ্কৃত হইবে, যদ্দ্বারা ইংরাজ ভারতবাসীকে ন্যায্য অধিকার দিতে বাধ্য হইবেন।

এই "স্বদেশী আন্দোলন" সেই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কিনা, তাহা কে বলিবে ?

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সমাজে স্থিতিভাবাপন্ন ও গতিশীল এই দুই প্রকার শক্তি কার্য্য করিতেছে। জাতির জন্ম, শৈশবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম আছে। সমাজের সত্তা বা অস্তিত্ব থাকিলে তাহার গতির বিষয় (উন্নতির কি অবনতির দিকে) চিন্তা করা যায়। যদি কোন সমাজই না থাকে, তাহা হইলে তাহার উন্নতির কথা উঠিতে পারে না। "ইণ্ডিয়ান্ নেশন্" (ভারতীয় জাতি) নামক কোন জাতি গঠিত না হইলে তাহার উন্নতির কি চেষ্টা হইবে ? সমাজ বা জাতির সত্তা গঠিত হইলে সেই সমাজের বা জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় চিন্তা করা যায়। সেই সমাজ বা জাতি কোন্ উত্তেজক প্রবৃত্তি দ্বারা কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সমগ্র ভারতকে এক জাতি বা সমাজে পরিণত ও গঠিত করিতে হইবে। ইহাই জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য। সমগ্র ভারত-বাসীর এক বিশ্বাস ও এক সাধারণ মত হওয়া চাই। এবং এক উত্তেজক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া চাই।

ভূমণ্ডল এখন নানা দেশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার এক এক দেশে এক এক প্রকার শাসন কার্য্য প্রচলিত আছে। এক শাসনাধীনে যত লোক বাস করে, তাহারা এক জাতি বা সমাজ। যেমন মানব-প্রকৃতিতে সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির স্পৃহা বলবতী, সেইরূপ সমাজে বা জাতিতেও জাতীয় সুখ বা সামাজিক সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ নিবৃত্তির স্পৃহাই কার্য্য করীশক্তি। মানবের পক্ষে কোন্‌টি প্রকৃত সুখ, তাহার বিচার নীতিবিজ্ঞানে আছে। সাধারণতঃ চিরস্থায়ী সুখই 'সুখ' নামে অভিহিত হয়। চিরস্থায়ী ভালবাসার বস্তুতে সুখাশা স্থাপিত করিতে পারিলেই মানব সুখী হয়। সমাজ বিজ্ঞানেও দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক সুখ প্রাপ্তির আশাই সমাজকে পরিচালিত করে। অন্যায় আচার, অত্যাচার, পুরুষ বা নারীদিগকে ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা, যথাসুখে ধর্ম্ম আচরণে বাধা দেওয়া, স্বাধীন চিন্তা করা, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা ও স্বাধীন ভাবে সভা-সমিতি করার ও কথা কহার বাধা দেওয়া, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যের স্বাধীনতা নষ্ট করা প্রভৃতিতে অত্যন্ত দুঃখ হয় ; এই জন্য সেই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সমাজের বা জাতির প্রত্যেক লোক সচেষ্ট হয়।

জাতি বা সমাজ গঠনের সাধারণ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার কারণ অনেক ; তন্মধ্যে এক ভাষা, একরূপ আহার বিহার ও পরিচ্ছদ, এক ধর্ম্ম, একই পূর্ব্বপুরুষের বা আদর্শ পুরুষের প্রতি ভক্তি ও অনুকরণের চেষ্টা, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া, এক দেশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, একরূপ নীতির আচরণ, একরূপ রুচি ও জাতীয় কবিত্ব, একরূপ কলা বিদ্যায় (সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতির) আনন্দ উপভোগ, এক শাসনাধীনে বাস, দেশবাসী শাসন কর্ত্তার অধীনে বাস এবং কৃষি-বাণিজ্যের একতা—এই কয়েকটি প্রধান। ভারতবর্ষে ইহার সমস্ত কয়েকটিরই অভাব। কেবল এক শাসনাধীনে বাস আছে, তাহাও আবার বিদেশীয় শাসন ;—অর্থাৎ বিদেশবাসী এক জাতি কর্ত্তৃক অপর দেশ শাসন। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর মান বৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি নিজকে যতদুর গৌরবান্বিত বোধ করেন, ইংরাজগণ বুয়ার দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করায় তজ্জন্য ইংরাজের প্রজা ভারতবাসী আপনাকে ততদুর গৌরবান্বিত বোধ করেন না। শারীরিক, আর্থিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি বিধানের উপকরণরাজি সমগ্র ভারতবাসীর সাধারণ নহে। সুতরাং ভারতবর্ষে "ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেস্" ব্যতীত অপর কোন প্রকার জাতি বা সমাজ গঠিত হইতে পারে না। যে মহাপুরুষের মস্তিষ্ক হইতে সর্ব্বপ্রথমে এই জাতীয় মহাসমিতির চিন্তা প্রসূত হইয়াছে, তিনি ভারতমাতার কৃতী-সন্তান,—তাঁহার চরণে আমার শত শত নমস্কার। বঙ্গকবি বিলাপ করিতে করিতে হতাশ্বাশ হইয়া বলিতেছেন,—"কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ? গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী ! আর কি ভারত সজীব আছে ?" বাস্তবিকই ত ভারত সজীব নাই, ভারতীয় জাতি বা সমাজ এখনও সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালী-জাতি গঠিত হইতেছিল, কারণ পূর্ব্ব লিখিত সাধারণ প্রবৃত্তির অনেক গুলিই বর্ত্তমান্ আছে। তদুপরি ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু হায় ! বিধাতা যে সুখের আশায় বাদ সাধিলেন। আমরা কি আসামে যাওয়ার জন্য দুঃখিত হইয়াছি ? তাহা নহে। আমাদিগকে মঘের মুলুকে পাঠাও না কেন ? কিন্তু হে রাজ্যেশ্বর ! আমাদের "বাঙ্গালী-জাতি" বা "বাঙ্গালী-সমাজ" নামে যে দিব্যসৌধ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া "ভগ্নকারী" নাম গ্রহণ করিও না !

জাতি বা সমাজ কিরূপে গঠন করিতে হয়, তাহার ভিত্তি কি, এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন ; কারণ মানব জন্মগ্রহণ করিয়াই কোন না কোন সমাজ-ভুক্ত হইয়া থাকেন। জাতি নির্ম্মিত হয় না ;—প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে জন্মিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রানু-সারে মানব ঋণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগত ঋণ তিন প্রকারের ;—দেব-ঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। যজ্ঞাদি করিয়া দেবঋণ শোধ করিতে হয় ; অপত্যোৎপাদন করিয়া পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করত পিতৃঋণ এবং শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা ঋষিঋণ শোধ করিতে হয়। মানব সমাজে আবদ্ধ হইয়া এই তিন ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রথমে সমা-জের অভ্যুদয় কিরূপে হইল, তাহা না দেখিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থিত সমাজের বা জাতির উন্নতির উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য।

ইয়ুরোপীয় সমাজ বা জাতির সহিত ভারতীয় সমাজ বা জাতির তুলনা হইতে পারে না। ইয়ুরোপীয় সমাজ এক অবস্থায় একরূপে গঠিত হইয়াছে ; ভারতীয় সমাজ বা জাতি অন্য অবস্থায় পতিত হইয়া অন্যরূপ গঠিত হইতেছে বা হইবে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সমগ্র ভারতবর্ষে এক জাতি কখনও ছিল না, এক রাজা ছিল না, এক ধর্ম্ম ছিল না, এক ভাষা ছিল না এবং অধিবাসীদিগেরও একরূপ রাজনীতি ছিল না। সুতরাং ভারতীয় জাতি নামে এক জাতি ইংরাজ শাসনাধীনে প্রথম দেখা দিয়াছে। এই জাতির এক সাধারণ প্রবৃত্তি এক গভর্ণমেণ্ট, এই গভর্ণমেণ্টও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্ট। ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লিয়ামেণ্ট সভাই প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট। ভারতবর্ষে ঐ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্ট আছেন। সুতরাং ভারতীয় জাতি স্বাধীনভাবে উন্নত বা অবনত হইতে পারে না; ভারতীয় জাতির ভাগ্য ইংরেজজাতির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে একত্র গ্রথিত যেমন কোন অর্থনীতিজ্ঞ পুরুষ ভারতের অর্থনীতির সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, সেইরূপ কোন সমাজ বিজ্ঞান শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া ভারতীয় সমাজের বা জাতির উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন না। আমি 'ইণ্ডিয়ান্ নেশনকে'ই ভারতীয় জাতি বা সমাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

"দেশ দেশবাসীর জন্য" এই মহান্ সত্য স্বীকৃত না হইলে জাতিরও উন্নতি হইবে না, অর্থনীতিরও উন্নতি হইবে না। হয় ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের এক

প্রদেশ মনে করিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতকে একত্র শাসন করিতে হইবে, নচেৎ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, কেপ্ কলোনীর ন্যায় ভারত স্বায়ত্ব শাসন প্রচলিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারত গবর্ণমেণ্টকে মহাপুরুষ মহম্মদের (দঃ) কফিনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে; কারণ ইহার দায়িত্ব কোথায়ও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ভারত কি ভারতবাসীর জন্য শাসিত হইতেছে কিম্বা ইংলণ্ডবাসীর জন্য শাসিত হইতেছে? যদি ইংলণ্ড ও ভারত একই দেশ হয়, তাহা হইলে ভারতীয় জাতিও ইংরাজ জাতি একই হইয়া যায় এবং তাহা হইলে এইরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের অগম্য অত্যদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া শাসনপ্রণালীর মধ্যেও পড়িতে হয় না। ইংরাজ জাতি কোন্ মতে গঠিত হইয়াছেন? ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে,—যে দিন রাজা জন্ রাণীমিডে ম্যাগ্না চার্টা দস্তখত করেন সেই দিন হইতে ইংরাজ জাতি একজাতি রূপে গঠিত হইয়াছেন এবং সেই দিন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংরাজ জাতির ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। ইংরজ জাতি যখন গঠিত হয়েন, তখনও পার্লিয়ামেণ্ট সভা গঠিত হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকালে প্রথম আহুত হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ বিশেষ অবস্থায় পতিত হইয়া এক জাতিরূপে গঠিত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীজানকীনাথ পাল।

কৈফিয়ত

বহুদিন পরে আবার "কোহিনুরের" লাবণ্যময়ী জ্যোতিতে হৃদয় উৎফুল্ল হইল বটে, কিন্তু গতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যার পত্রিকায় শ্রাবণ ও ভাদ্রের "অর্চ্চনার" সমালোচনা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলাম। দেখিলাম,—আমার "ধর্ম্মদ্বেষিতা" নামক প্রবন্ধটি "একদেশ দর্শিতা-কলুষিত"; এবং ইহা হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে,—"হিন্দুলেখকগণ" চিরদিনই "মুসলমান ধর্ম্মকে বিদ্বেষচক্ষে" দেখেন; এবং "এ প্রবন্ধে মুসলমানহৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এমন অনেক অসত্য কথা আছে।"

আমি সমালোচনায় ভীত নহি। যতদিন মনুষ্য সমাজে রুচিভেদ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে পরস্পর পরস্পরের মতামত-সমালোচনা করিতে হইবে। এ অধীনের রচনা সম্বন্ধেও সমালোচক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং ত্রুটি হইয়াছে মনে করিলেও উত্তম মধ্যম দুই একটা কথা বলিতে ছাড়েন না। আমি সে কথা লইয়া আন্দোলনও করি না বা আমার উপর অযথা তিরস্কার বর্ষিত হইয়াছে ভাবিলেও তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস করি না। কিন্তু যখন 'কোহিনুরের' মত পত্রিকায় দেখিলাম,—আমার লেখা পড়িয়া মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ দুঃখিত হইতে পারেন, তখন তাঁহাদিগকে এই কৈফিয়ত দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য যদি সামান্য পরিমাণেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। এই কৈফিয়ত পাঠ করিয়াও যদি কেহ বিবেচনা করেন,—আমি মুসলমান সমাজের নিকট অপরাধী, তাহা হইলে আমার বিনীত নিবেদন, আমার স্বকৃত পাপের জন্য মুসলমান ভ্রাতৃগণ যেন আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণকে দোষী বিবেচনা না করেন।

প্রথমতঃ "ধর্ম্মদ্বেষিতা" নামক প্রবন্ধটি অসত্য কথায় পূর্ণ কিনা, সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। আমার অদৃষ্ট দোষে সমালোচক মহাশয় একটি ব্যতীত "অসত্য কথা" উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং যে কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সে কথাটি অসত্য কিনা, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"ধর্ম্মদ্বেষিতা" নিবন্ধন খ্রীষ্টসমাজে কিরূপ অযথা নরহত্যা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া "অর্চ্চনায়" লিখিয়াছিলাম;—"পরে মহম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্ম্মে কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল অঙ্গ লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল।" এই বাক্যের সমালোচনায় সমালোচক বলিয়াছেন;—"মুসলমানেরা যে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল,—কাহারও ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য নহে, লেখক মহাশয় কি তাহা অস্বীকার করিবেন?" "স্বধর্ম্ম রক্ষার" জন্য মুসলমান কেন, সকল জাতিই যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমি অস্বীকার করি না। পরধর্ম্মাবলম্বীকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য রণলিপ্ত হইবার ব্যবস্থা মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কিনা, তাহা জানি না। কিন্তু কাহারও ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য মুসলমান যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই, তাহা আমি স্বীকার করি না। যদি সমালোচনার আবেগটা কিয়ৎ

পরিমাণে প্রশমিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়টি স্থিরভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এ কৈফিয়তের আবশ্যক হইত না। সমালোচক মহাশয় লিখিবার সময় ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। তিনি কি বলিতে চাহেন, হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীদিগের দ্বারা প্রাচীন মুসলমান আফগান বা তাতারদিগের ধর্ম্মনাশ হইবার কোনওরূপ আশঙ্কা ছিল? মহম্মদ কাসিম, মামুদ গজ্‌নী, মহম্মদ ঘোরী পুনঃ পুনঃ হিন্দুস্থানে অভিযান করিয়া সংখ্যাতীত লোক হত্যা করিতেন কি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য? না,—হিন্দুস্থানী কাফেরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য? আমরাত জানি, মুসলমান লেখকগণ বলেন, —মুসলমান বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ইস্‌লাম-প্রচার। যদি সমালোচক মহাশয় একথা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে মামুদ্‌ গজ্‌নী, মহম্মদ ঘোরী, টাইমুরলঙ্গ, এমন কি আমাদের পূর্ব্ব সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতিকে পশুশক্তিতে অনুপ্রাণিত নরঘাতক ভিন্ন অপর কিছু বলিতে পারি না। তাঁহারা আপনাপন বিবেচনা মত সাধু উদ্দেশ্যে শোণিতপাত করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা করি।

পরধর্ম্মনাশ করিয়া ইস্‌লাম প্রচার করিবার জন্য প্রাচীন মুসলমানগণ অসি ধরিতেন, সে বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। হজরতের মৃত্যুর পরই তাঁহার প্রিয়দয়িতা আয়েষার পিতা আবু বাকরের খলিফতে ১২ হিঃ অব্দে তিনি মহম্মদীয় সর্দ্দারদিগকে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র পাঠাইয়া ছিলেন;——

"পরম করুণাময় জগদীশ্বরের নামে! আব্‌দাল্লা অথেক ইবনে আবু কহফা সমুদায় সত্যবিশ্বাসীদিগকে স্বাস্থ্য সুখ এবং জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ! ইহাদ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সিরিয়া প্রদেশ কাফেরদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমি বিশ্বাসীদিগের একদল সৈন্য তথায় পাঠাইতে ইচ্ছা করি এবং আপনাদিগকে স্মরণ করাইতে ইচ্ছা করি যে, সত্যধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা মাত্র।" *

সারাসান (Saracen) দিগের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে খাস মুসলমান ইতিবৃত্তকারগণ কি বলেন, শুনুন——

মহম্মদ আলির "কচ-নামা" নামক ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে, সিন্ধুজয় করিয়া

* "Lives of the successors of Mohomet" wy Washington Irving Ch. III

মহম্মদ কাসিম তাঁহার প্রভু হাজ্জাজকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্থলে লেখা ছিল ;—"দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহার যোদ্ধৃগণ এবং প্রধান কর্ম্মচারী-বৃন্দ নিহত হইয়াছে, কাফেরগণ ইস্লামে দীক্ষিত হইয়াছে বা ধ্বংশ হইয়াছে। পৌত্তলিক মন্দিরের পরিবর্ত্তে মস্‌জিদ্‌ এবং অপরাপর উপাসনা স্থল নির্ম্মিত হইয়াছে ইত্যাদি।" সিন্দুবাসী হিন্দুদিগের দ্বারা মুসলমানদিগের স্বধর্ম্মের কি ভয় ছিল, তাহা ত কোনও ইতিহাসেই পাইলাম না। বরং সে সময় হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্বই অবগত ছিল না, ইতিহাস পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

আমীর সুবক্তগিনের হিন্দুস্থান-অভিযান সম্বন্ধে উট্‌বীর "তারিখে এয়ামনী"তে * লিখিত হইয়াছে ;—"তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষে যাত্রা করিতেন।" মামুদ গজ্‌নি কর্ত্তৃক জয়পালকে পরাস্ত করিয়া লামঘান যুদ্ধের পর উট্‌বীর মতে, "তিনি উহা জয় করিলেন ; ইহার আশে পাশে যে সকল স্থলে কাফেরগণ বাস করিতেন, তথায় অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং পৌত্তলিক মন্দির সকল ধ্বংশ করিয়া তিনি তথায় ইস্লাম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।" সমালোচক মহাশয় কি ইহাকেও স্বধর্ম্মরক্ষা বলেন ?

হোসেন নিজামী কর্ত্তৃক প্রণীত "তাজ-উল-মাশীর" নামক ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। লেখক বলেন,—যাহাতে তদ্দেশের রায় (পিথৌরা) তামস এবং অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সত্যপথ দেখিতে পান, তজ্জন্য মহম্মদ ঘোরী আজমিরে দুত পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য দৌত্য সফল হয় নাই এবং মহম্মদ ঘোরীর সহিত "বায়সমুখ হিন্দুগণ হস্তিপৃষ্ঠে শ্বেত শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুরক্তে যুদ্ধস্থল প্লাবিত হইয়াছিল।"

হিন্দুস্থানের পক্ষপাতী আব্দুল্লা ওয়াসাফও তাঁহার "তাজিয়াতুল আমসার" নামক গ্রন্থে সুলতান আলাউদ্দীনের যুদ্ধেরও উদ্দেশ্য যে এইরূপ ছিল, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। "যুদ্ধের সময় মুসলমানেরা নির্দ্দয়ভাবে দক্ষিণে এবং বামে হত্যা ও নিধন করিতে লাগিল।"

নিরপেক্ষ কবিশ্রেষ্ঠ আমীর খস্‌রু আলাউদ্দীন খিলিজী সম্বন্ধে "তারিখে আলাই" নামক ইতিহাসে চিতোর জয় বর্ণনায় বলিয়াছেন ;—"ত্রিংশসহস্র

* এই সকল ইতিবৃত্তগুলির পরিচয়ের জন্য গত বর্ষের নবনুরে মৎলিখিত "মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

হিন্দুকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দিয়া তিনি চিতোর শাসনভার তাঁহার পুত্র খিজির খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন।”

টাইমুরলঙ্গের স্বরচিত গ্রন্থ “মলফুজাতি টাইমুরি”তে তিনি বলিয়াছেন ;— “আমার হিন্দুস্থানের অভিযানের উদ্দেশ্য কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করা।” তাহার পর সে যুদ্ধের কি ফল হইয়াছিল, তাহা পাঠে বোধ হয় সমালোচক মহাশয়েরও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে! শিয়া ও সুন্নি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদিগের মধ্যেই যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও সমালোচক আপনিই বলিতেন, “মহম্মদীয়গণ উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল অঙ্গ লোহিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন।”

এ সম্বন্ধে অপর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। ইতিহাসের এই সকল বিস্মৃত কথা গুলার পুনরাবৃত্তি আমাদের আধুনিক সমাজের পক্ষে অমঙ্গল কর। তবে আপনার সমালোচনা আমাকে সমাজ দ্রোহিতার দোষে দোষী করিয়াছেন ; তাই এত কথা বলিলাম।

তাহার পর আমি উক্ত প্রবন্ধে “মুসলমান ধর্ম্মকে” কিরূপে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীন মুসলমান জগতে যদি কতকগুলি মুসলমান বীর আপন ধর্ম্মে অপরকে জোর করিয়া দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার সহিত “মুসলমান ধর্ম্মের” কি সম্পর্ক, তাহা ত বুঝি না। উদ্ধত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীকে নিগ্রহ করেন। তাহা বলিয়া কি কেহও খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারে? সকল মুসলমান যদি কোরানের সমগ্র উপদেশ মত কার্য্য করিত, হিন্দুর জীবন যদি শাস্ত্রানুসারে গঠিত হইত, বাইবেলের নীতিমত যদি খৃষ্টান জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে এ পৃথিবী স্বর্গ-সদৃশ হইত, সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে এক, আর আমরা করি আর। তাহা না হইলে আর পৃথিবী পৃথিবী কিসে? সুতরাং আমি যখন বলিয়াছিলাম, মহম্মদীয়গণ এককালে উক্তরূপ কার্য্য করিয়া ছিল, তখন মুসলমানের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই। সে অনধিকার চর্চ্চা করিবার মৎসদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের কোনও বাসনাই ছিল না। যদি মুসলমান ধর্ম্মকে আমার মত শত শত হিন্দু লেখক প্রকৃতই “বিদ্বেষ চক্ষে” দেখেন, তাহা হইলেও মুসলমান ধর্ম্মের পবিত্রতা সমভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কেবল তাহারাই অধঃপতিত হইবে, আমার এই বিশ্বাস।

সমালোচক মহাশয় যদি সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন, যে সকল মুসলমানকে ধর্ম্মদ্বেষী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কেন অপরের মত সহ্য করিতে পারে না, তাহাই মাত্র বলিয়াছি। ইহাতে ত সাধারণের যেরূপ কঠোর জ্ঞান আছে, তাহা দূরীভূত করিয়া ঐরূপ খৃষ্টান বা মুসলমানের চরিত্রের কৈফিয়ত দিয়াছিলাম। প্রাচীন মোস্লেম বীরদিগকে ইউরোপীয়গণ যেরূপ কুভাবে বর্ণিত করেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য আমার ছিল। কিন্তু ভাল করিতে গিয়া যদি "পাপাচরণ ও নিষ্ঠুরতা" প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার ভাগ্যেরই দোষ বুঝিব।

'অর্চ্চনা'র ১৭৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি ঃ—"উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে, অপরকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার বাসনা খৃষ্টীয় প্রভৃতি উপাসকের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে উদয় হইতে পারে।" এই যুক্তির সারাংশ নিম্নলিখিত ভাবে প্রকটিত করিয়াছি ঃ—"মুসলমান ভাবে,—হায়! হায়! কাফের! দুর্লভ মানব জনমটা কেন বৃথা নষ্ট করিলে! রসুলের নাম গ্রহণ করিয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে না ত করিলে কি? আর যে কখনও এজীবন পাইবে না! এই জীবনের কার্য্য কলাপেই যে তোমার ভবিষ্যৎ অনন্ত আবাস স্থল নির্ণীত হইবে! সর্ব্বনাশ আমি যে তোমায় নরকে যাইতে দিব না। ইস্লাম গ্রহণ কর (না?) ত তোমারই হিতার্থে আমি তোমায় ক্লেশ দিব, আজব-খানায় বন্দী করিব।" আমার বিশ্বাস, সমালোচক এই অংশ পাঠ করেন নাই।

তাহার পর আমার প্রবন্ধ কিরূপে এক দেশদর্শী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। সমালোচক মহাশয় কি দেখেন নাই, আমি বলিয়াছি ঃ—"খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আদি আবিষ্কারক দ্বয় সংস্কারাপন্ন আপন আপন বর্ব্বর স্বদেশবাসী দিগের হস্তে কিরূপে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, এই দুইজন মনীষির জীবনী পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। * * * প্রথমদীক্ষিত মোস্লেমগণ পৌত্তলিক আরববাসী দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিল।" হিন্দু দিগের সম্বন্ধে বলিয়াছি ঃ—"আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত হই, প্রাচীন হিন্দু জাতি হিমালয় ও সাগর পরিখার মধ্যে বাস করিয়া হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিতে কুণ্ঠিত হইত। আপনজাতি ব্যতীত অপর সকল জাতিকে ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত এবং তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম, ভারতবর্ষ প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা আখ্যাদিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিত।" অপর স্থলে বলি-

য়াছি ঃ—"বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থান সময়ে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের সময়ে ভারতবর্ষে দুইটি প্রতিযোগী ধর্ম্মে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছিল এবং সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্মেরই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা শুনা গিয়াছে। আমাদেরই বঙ্গভূমে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের কলহের কথা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই।"

আমার 'ধর্ম্মদ্বেষিতা' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং এই কৈফিয়ত পড়িয়া সমালোচক ব্যতীত অপর কোনও মুসলমান বাঙ্গালী যদি বুঝেন, "এ প্রবন্ধে মুসলমান হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এমন অনেক অসত্য কথা আছে," তাহা হইলে আমি বাস্তবিকই মর্ম্মপীড়িত হইব। অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত—

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত।

'কৈফিয়তের' উত্তর।

"ধর্ম্ম-দেষিতা" প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার উত্তরে মাননীয় কেশব বাবুর এই বিস্তৃত কৈফিয়ত আমরা সাধারণ্যে প্রচারিত করিলাম।

আমরা এতদিন তাঁহাকে হতভাগ্য মুসলমান জাতির প্রতি একজন আন্তরিক প্রীতিমান লোক বলিয়াই মনে করিতে ছিলাম; কিন্তু আজ সকলে আমাদের সেই চিরপোষিত বিশ্বাসের ভ্রান্ততা দেখুন! এই "বারো হাত কাকঁুড়ের তেরো হাত ডাঁটা"য় তাঁহার যে মনোভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার লেশমাত্রও স্থান পাইতে পারে কি? যাহা হউক, ইহা এ দেশের জল বায়ুর দোষ কিনা, বুঝিতে পারিলাম না!

এই কৈফিয়তে তিনি বলিতে চাহেন যে, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করেন নাই; বরং তাঁহার এই উদ্দেশ্য যে, মোস্‌লেম বীরদিগকে ইউরোপীয়গণ যেরূপ কুভাবে বর্ণিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করা। বাস্তবিকই যদি তাঁহার এই ইচ্ছা থাকে, তবে এই সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার মনোভাব ও কার্য্যের গতি পরস্পর বিপরীত গামী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যেই মহাত্মা (আবু বকর) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সর্ব্ব প্রধান বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকেই তিনি একজন পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল ইউরোপীয় স্বার্থ-

পর ইতিহাস-লেখকদিগের তিনি প্রতিবাদ করিবেন বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ঘোর ইস্‌লাম-বিদ্বেষীকেই তিনি authority স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পর তাঁহার সর্ব্ব প্রধান চারিজন শিষ্য ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তররূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা ইস্‌লাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

খৃষ্টান এবং মুসলমান লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কোরানের নবম অধ্যায়টি সর্ব্ব শেষে অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ হজতে মোহাম্মদ (দঃ) এর ক্ষমতা যখন সর্ব্বোচ্চ সীমায় পঁহুছিয়াছিল, তখনই ঐ অধ্যায়টি অবতীর্ণ হয়। উহাতে লিখিত আছেঃ—"যাহারা শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং মোহাম্মদকে নির্ব্বাসন করিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছে এবং যাহারা বিনা কারণে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে কি তোমরা ভয় করিবে এবং তাহাদিগের সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ করিবে না?" "যদি পৌত্তলিকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাকে সাহায্য কর,—যেন সে পরমেশ্বরের বচনগুলি শুনিতে পারে; পরে তাহার নিজ নিরাপদ স্থানে যাইতে দেও; কারণ তাহারা তোমার ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।" "যত (দিন) পর্য্যন্ত তাহারা তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলে, সেই পর্যান্ত তুমিও তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার রক্ষা কর।" মুসলমান-বিজেতৃগণ এই সকল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই দিগদিগন্তরে ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। অবশ্য তৈমুর এবং নাদির সাহার ন্যায় কয়েকজন মুসলমান বীর হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোকহত্যা করিয়াছে; যেইরূপ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধীনে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল; যেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জেঙ্গিস খাঁ এবং হালাকু খাঁ মধ্য-এসিয়াতে নির্দ্দয়তার একশেষ করিয়াছিল; যেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কর্ত্তৃক লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধোপলক্ষে হত হইয়াছিল, সেইরূপ কয়েকজন মুসলমান দিগ্বিজয়ীর কার্য্যও যে নিন্দনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেশব বাবুর স্মরণ রাখা উচিত যে, ধর্ম্মের নামে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, মুসলমানেরা তাহার শতাংশের একাংশও করে নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ঘোর শত্রু জর্জ সেল সাহেবই কোরানের উপক্রমণিকায় এই ভাবে লিখিতেছেনঃ—"য়িহুদী এবং খৃষ্টানগণ মুসলমানগণ হইতে

অনেকাংশে ধর্ম্ম-বিষয়ে বেশী নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে।" (১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) লাহোর কলেজের Philosophy র প্রফেসার Thomas Arnold সাহেব তাঁহার "Preaching of Islam" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—"যদিও মুসলমান রাজারা অনেকানেক যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহারা যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতেন, বর্ত্তমান সময় ব্যতীত ইউরোপেও কোন সময়ে সেইরূপ উদারতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না।" যে সবক্তগিনকে কেশব বাবু নিষ্ঠুরতার অবতার প্রমাণ করিতেছেন, তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ একজন হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম জয়সিংহ। কেশব বাবু যে আওরঙ্গজেবকে নরপিশাচ আখ্যা প্রদানে উদ্যত, তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারীর মধ্যে যশোবন্ত সিং প্রভৃতিযে ছিলেন, তাহা আর বলিবার দরকার করে না। হিন্দুদের উদারতা সম্বন্ধে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যখন ইংরাজ রাজত্বেও হিন্দু ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কল্যাণে গবর্ণমেণ্ট-আফিস মুসলমান-শূন্য হইয়াছে, তখন জ্ঞানী মাত্রেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, যদি এই দেশে হিন্দুরাই রাজত্ব করিত, তবে মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্পেনের মূর দিগের ন্যায় ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতে হইত কিনা। হিন্দুরা মুসলমানগণ হইতে সহস্র উপকার পাইলেও তাহা স্মরণ করিবার দরকার নাই; দোষ কোন্‌টি ছিল, তাহাই দেখাইয়া দিতে হইবেক। এই ত গেল হিন্দু ভ্রাতাদের মুসলমান-প্রীতি!

ইস্‌লাম ধর্ম্ম রক্ষা করা এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবমাননা করিলে অবমাননাকারীর সমুচিত শাস্তি বিধান করা কোরানের আদেশ। চীনে কিম্বা আফ্রিকায় খৃষ্টান মিশনারি হত্যা হইলে যেরূপ সমস্ত খৃষ্টান-জগৎ একত্র হইয়া হত্যাকারীদিগের শাস্তির জন্য চীনের সম্রাটের বিরুদ্ধে কিম্বা আফ্রিকার কোন সর্দ্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেইরূপ মুসলমান প্রজার কিম্বা মুসলমান দূতের অথবা মুসলমান বণিকের প্রতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা কোন অত্যাচার সংঘটিত হইলেও তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য শত শত যুদ্ধ ঘোষণা করা গিয়াছে। যুদ্ধ সময়ে মুসলমানের হাতে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে,——যুদ্ধ সময়ে সাধারণতঃ এইরূপ ঘটিয়াই থাকে; কিন্তু যুদ্ধের পর কোরানের আদেশ মতে এবং খলিফাদের উপদেশ মতে বিধর্ম্মীদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করা যায় নাই। হজরত ওমরের একজন খৃষ্টান ক্রীতদাস ছিল। তিনি সময়ে সময়ে তাহার নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মের

মাহাত্মা প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু সে কিছুতেই তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল না। অবশেষে তিনি তাহাকে এই কথা বলিলেন,—“আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি করিলাম। শেষ ফল ঈশ্বরের হাতে। তাহার দোষের জন্য আমি দায়ী নহি।”

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, মোহাম্মদ কাসেম, সবক্ত-গিন, মোহাম্মদ গজনবী, মোহাম্মদ ঘোরী প্রভৃতি দিগ্বিজয়িগণ তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্যই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজির হিন্দুদিগকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ দেওয়ার কারণ বিদ্রোহ-দমনই বটে ; ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই বলিয়া তিনি কখনও ঐরূপ আদেশ দেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী পরশুরাম বিদ্রোহ-দমনার্থ ক্ষত্রিয়দিগকে ভারতবর্ষে যেরূপ সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন ; খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী অষ্ট্রিয়-সম্রাট হাঙ্গেরিয়াবাসী দিগকে বিদ্রোহ দমন জন্য যেরূপ হত্যা করিয়াছিলেন ; ইংরাজ-রাজ সময় সময় যেরূপ অনেক লোককে হত্যা করিয়াছেন ; প্রত্যেক রাজা যেরূপ এই কারণে নরহত্যা করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না, আলাউদ্দীনের ন্যায় কোন কোন মুসলমান রাজাও সময় সময় সেইরূপ নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মোটের উপর দেখা যায়, রাজনৈতিক কারণই উক্তরূপ হত্যাকাণ্ডের মূল। কিন্তু মুসলমান-দের দুরদৃষ্ট যে, তাহাদের দ্বারা কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শিত হইলে তখন বলা হয় যে, “জোর করিয়া মুসলমান করিবার জন্যই ঐরূপ নির্দ্দয়তা করা গিয়াছে।” বলপূর্ব্বক এককে অন্য ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা পূর্ব্বকালে খৃষ্ট ধর্ম্মে যেরূপ হইয়াছে, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে,—অন্য কোন ধর্ম্মে তাহার শতাংশের একাংশও দেখা যায় নাই।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁহার একজন দূতকে বসোরা-বাসীরা হত্যা করিয়াছিল বলিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গ্রীক সম্রাটের বিরুদ্ধে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হজরত আবুবকর (রাজিঃ) ঐ গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। অবশ্য ঐ খৃষ্টান কাফের নরঘাতক গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপর মুসলমানগণ রাজত্ব স্থাপন করত তাহাদিগকে কোরা-নের উপদেশগুলি শুনাইবেন, এই উদ্দেশ্যে আবুবকর (রাজিঃ) মুসলমান-

দিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—"সত্যধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ কর।" ইহাতে কেশব বাবু কি দোষ দেখিতে পাইলেন বুঝিতে পারিলাম না।

হজরত ওমর (রাজিঃ) (যাঁহার সময়ে সিরিয়া, পারস্য ও আফ্রিকা মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল) ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মৌলানা শিব্‌লী নোমানীর লিখিত 'হজরত ওমরের জীবনচরিত' পাঠ করিলে সকলেই সহজে জানিতে পারেন। উক্ত মৌলানা সাহেব "হজিফা বিন্নে ইমান" নামক গ্রন্থকারের লিখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—"হজরত ওমর (রাজিঃ) আদেশ দিয়াছিলেন, যে সকল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক মুসলমানদের অধীনে বাস করিতেছে, তাহাদের ধর্ম্ম যেন পরিবর্ত্তিত করা না যায় এবং তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক আচার ব্যবহারে যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয়।" জর্জ্জাল নামক স্থান বিজয়ের পর এই অঙ্গীকার লিখিত হয় ঃ—"বিধর্ম্মীদের জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি রক্ষা করা যাইবেক এবং ইহার মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তনও যেন করা না হয়।" হজরত ওমর (রাজিঃ) মৃত্যুর অল্পক্ষণ পুর্ব্বে যে আদেশ দেন, ইমাম বোখারী, বহিকিও জাহেজ নিম্নোক্ত ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—"ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে যে অঙ্গীকার আছে, তাহা পূর্ণকর এবং শক্র হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কর এবং তাহাদের ক্ষমতার অতীত কোনরূপ কার্য্য তাহাদের দ্বারা করাইও না।" মুসলমান বীরগণের ব্যবহার ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কিরূপ ছিল, তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা পাঠে বিশেষরূপ প্রমাণিত হইবেক। সিরিয়া দেশ জয় করিবার সময়ে খৃষ্টান শক্রদের ভয়ে নানা কারণে 'হমছ' নামক সহর ত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে দেমস্ক নগরে যাইতে হইয়াছিল। তখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আবু-ওবেদা কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন যে,—"খৃষ্টানগণ হইতে যে জিজিয়া লওয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে ফেরত দেও ; কারণ শক্রদিগ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা এইক্ষণ আমাদের নাই এবং তাহাদের উপকার জন্য এই জিজিয়া খরচ করিবার সুযোগ ও এখন আমাদের নাই।" খৃষ্টানগণ মুসলমানদের এইরূপ মহানুভবতা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বলিল ঃ—"হে পরমেশ্বর ! মুসলমানদিগকে পুনরায় এই সহরে ফিরাইয়া আন।" তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ অপেক্ষা মুসলমানগণকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহা ত ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। "জিজিয়া"

শব্দের অর্থ কি, তাহা হিন্দু ভায়ারা কি এখন পর্য্যন্তও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট "রোড সেস্," "পাব্লিক ওয়ার্ক সেস্" প্রভৃতি নানা রূপ টেক্স প্রজা হইতে উঠাইয়া প্রজার উপকারে ব্যয় করিয়া থাকেন। "জিজিয়া"ও ঠিক সেই রূপ টেক্স ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুসলমান প্রজারা আইনতঃ যুদ্ধে যাইতে বাধ্য ছিল। এই জন্য তাহাদিগকে "জিজিয়া" টেক্স দিতে হইত না; অন্য পক্ষে তাহাদিগ হইতে "জকাত" লওয়া হইত।

আলেকজেন্দ্রিয়া নগর যখন মুসলমানগণ অধিকার করে, তখন অনেক গ্রীক খৃষ্টান এবং কিবতি খৃষ্টান যুদ্ধে ধৃত হইয়াছিল। সেনাপতি আমরু-বিল-আছ হজরত ওমরের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, এই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে কি করা যাইবেক? হজরত ওমর (রাজিঃ) এই মর্ম্মে তাহার উত্তর দিয়াছিলেনঃ—"যাহারা মুসলমান হইতে চাহে, তাহারা মুসলমান হউক; যাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে থাকিতে চাহে, তাহারা ঐ ধর্ম্মে থাকুক। কিন্তু তাহাদিগকে জিজিয়া দিতে হইবেক।" (ইতিবৃত্ত-লেখক তাবেরির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

কেশব বাবু তথাপি যদি বলিতে চাহেন যে.. তরবারি ব্যতীত ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে নাই, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, চীন দেশে এবং বোর্ণিও, সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষস্থ দ্বীপ পুঞ্জে ইস্লাম ধর্ম্ম কি প্রকারে প্রচারিত হইয়াছে? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা এইক্ষণ প্রায় ৭ কোটি। অবশ্য কেশব বাবু অবগত আছেন যে, কোন মুসলমান দিগ্বিজয়ী বীর চীনদেশে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে নাই। তবে ঐ খানে কি প্রকারে এত অধিক পরিমাণে লোক ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল? আমরা বলিতে চাহি যে, আরব বণিকেরা অতি উদার নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম-বিজাতীয়দের নিকট এইরূপ ভাবে প্রচারিত করিতে লাগিল যে, শেষোক্ত ব্যক্তিগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়াই তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এ সম্বন্ধে উক্ত Arnold সাহেবের লিখিত 'Preaching of Islam' গ্রন্থ দৃষ্টিপাত করিলে মুসলমানধর্ম্মবিস্তার সম্বন্ধে সকলের ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে, আশা করা যায়।

লেখক যে মুসলমানদের প্রতি স্বভাবতঃ বিরাগী, তাহা এই কৈফিয়ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। ব্যক্তি বিশেষের কৃত কার্য্যের সহিত ধর্ম্মবিধির সম্বন্ধ কি এবং তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দনীয় বা দায়ী হইবে কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেশব বাবুর মুসলমান-হিতৈষিতার ভান এই

কৈফিয়ত হইতে আপনিই মুখোশ-মুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই জানেন যে সকল জাতির মধ্যেই পরধর্ম্মবিদ্বেষী লেখক বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন। তদ্রূপ লেখকেরা পর-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ প্রকাশে শাস্ত্রের অবমাননা করিতে কখনও কোন দেশেই কুণ্ঠিত হন না; বরং তাহা করিতে পারিলেই আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন। এইবঙ্গে (তথা ভারতেও) হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই ঐরূপ লেখক বিস্তর ছিলেন ও আছেন। অপরের সহিত বিতর্ক স্থলে সেইরূপ বিদ্বিষ্টহৃদয় লেখকদের নজির উপস্থিত করা কুটিলনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তদ্রূপ নীতি সাধুজন সম্মত কিনা, ঘোর সন্দেহের বিষয়। কেশব বাবু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহার-জীবোচিত যথেষ্ট কুটিলতারই পরিচয় দিয়াছেন বটে।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা তাঁহার উপস্থাপিত নজিরগুলি সরল নীতি মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এ ক্ষেত্রে সরল পথে থাকিয়া নিরপেক্ষ authority র আশ্রয় গ্রহণ করিলেই সব হাঙ্গামার অবসান হইত। মুসলমান লেখক হইলেই যে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিতে হইবে, এমন কোন কথা কোন আইনে নাই। সকল জাতির মধ্যেই অকাল কুষ্মাণ্ড ও গোঁড়া লোক বিদ্যমান, তাহা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। তাঁহার স্বজাতীয় লেখকের উক্তি হইতেই যদি আমরা তাঁহাদের বিষয়-বিশেষের অসারতা প্রদর্শন করি, তাঁহারা তাহা বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? দেখিয়া অতীব দুঃখ হইল যে, কেশব বাবু প্রভূত পরিশ্রম সহকারে—কেবল আমাদের Dark Side টাই অঙ্কিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু মুসলমান-প্রীতি-অঞ্জনে অনুরঞ্জিত হইলে আজ নিশ্চয়ই আমাদিগকে এত বাক্য ও মসীব্যয় করিতে হইত না। এরূপ মক্ষিকা-বৃত্তি-অবলম্বন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে-সম্প্রীতি স্থাপনের একান্তই অন্তরায়। এবং ইহা অশেষ অমঙ্গলের হেতু ও বিশেষ দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। শুধু রাজপুরুষের ভেদনীতি নহে, অনেক হিন্দু প্রধানতঃ এই ভেদসংঘটনের জন্য দায়ী। Survival of the fittest নীতি মতে অনিবার্য্য পরাভব স্বীকার ভিন্ন দুর্ব্বল ও অধঃপতিত মুসলমানদের আর উপায় কোথায়? কেশব বাবুর কৈফিয়ত পাঠে আমরা কেন, কোন মুসলমানই বোধহয় সন্তোষলাভ করিতে পারিবেন না। এখন বুঝিতেছি, অতি কুক্ষণেই 'কোহিনুরে' কেশব বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। উপস্থিত আলোচনা 'কোহিনুরে'র উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পথেই গিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয় আলোচনার উপযুক্ত স্থান 'কোহিনুর' নহে বলিয়া আমরা এখানেই ইহার সমাপ্তি বিধান করিতে চাহি। আশা করি, কেশব বাবু "সত্যং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই নীতিবাক্যানুসরণেই ভবিষ্যতে আপন লেখনীর গতি স্থির করিবেন। অলমিতি বাহুল্যেন।

সমালোচক।

সমাজ-নীতি।

---*---

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমরা ইংলণ্ডের ও জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ইংলণ্ডবাসী ও জাপানবাসীর অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি। ইংলণ্ডে কোন প্রধান ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান করিতে হইলে সাধারণ লোকে তাঁহার গাড়ী টানিয়া থাকে। আমরাও তাহা অভ্যাস করিতেছি। নেল্‌সনের জলযুদ্ধ-জয়োল্লাসে আমরাও বার্ষিক আমোদে মত্ত হইতে মনন করিতেছি; কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে,—"যতদিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার অবস্থা জাপের সম," ততদিন জাপবাসীর অনুকরণ করা বাতুলতা মাত্র। জাপান স্বাধীন; চীনদেশ স্বাধীন, চীন জাপানের অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে। ইংরেজ স্বাধীন, জাপান স্বাধীন। জাপান ইংরেজের অনুকরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে। ক্যানাডায় স্বায়ত্ত-শাসন আছে; ক্যানাডা ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের উপর আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছে। ইংলণ্ডের মিষ্টার চ্যাম্বারলেইন, মিষ্টার ব্যাল্‌ফোর্ প্রভৃতি ক্যানাডার পণ্যদ্রব্যের উপর প্রতিহিংসামূলক শুল্ক (১) স্থাপন করিবার জন্য যত্ন পাইতেছেন। কিন্তু ভারতের ও ইংলণ্ডের মধ্যে এইরূপ হইতে পারে না; কারণ ভারত ভৃত্য, ইংলণ্ড প্রভু। এইজন্যই বলিতেছিলাম, সমাবস্থ না হইলে অনুকরণ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। সমাজ প্রাকৃতিক নিয়মে যেরূপ গঠিত হইয়াছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল আচরণ করিয়া তাহার উন্নতি করিতে হইবে।

জাপানের অর্থসচিব এক স্থানে বলিয়াছেন যে, চীন শীঘ্র কোন উন্নতি করিতে পারিতেছে না; কারণ চীন স্বাধীনতা শব্দের ভুল অর্থ, অর্থাৎ 'যথেচ্ছাচার' অর্থ বুঝিয়াছেন (২)। আমাদেরও সাবধান থাকিতে হইবে যে, আমরা যেন যথেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা মনে না করি। সমাজের উন্নতি করিতে হইলে যথেচ্ছাচার অবলম্বনীয় নহে; সমাজের বিধান মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

---

(১) Retaliation tax.

(২) Misunderstood license (disorderly behaviour) for liberty.

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে যে সমাজ সংস্করণ সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে, ঐ সমিতির গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় ধার্য্য হইয়াছে :— (১) স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিবিধান ; (২) মাদক-নিবারিণী সভা স্থাপন ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা ; (৩) প্রায়শ্চিত্ত করিলে পুনরায় সমাজে গ্রহণ ; (৪) দ্বাদশ বৎসর বয়সের নীচে কোন বালিকার বিবাহ ও অষ্টাদশ বৎসর বয়সের নীচে কোন বালকের বিবাহ না দেওয়া ; (৫) বিধবাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব নষ্ট না করা ও বিধবাশ্রম স্থাপন করা ; (৬) সর্ব্বজাতির বিভিন্ন শাখার একত্র সমন্বয় করা ; (৭) বিদেশ-ভ্রমণের উৎসাহ দেওয়া ; (৮) বহুবিবাহ নিবারণ ; (৯) সমাজের নীচজাতিসমূহের প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা ও তাহাদিগকে উপযুক্ত সামাজিক সম্মান প্রদান করা; (১০) অন্তঃপুরের অবরোধ প্রথার কিঞ্চিৎ শিথিলতা সম্পাদন করা ইত্যাদি।

সাধারণ কথায় সমাজ বা জাতি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা সেই-রূপ অর্থে সমাজ বা জাতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি না, আমরা সমাজ বা জাতি শব্দের পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

ইংরেজ জাতি বা সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, ভারতীয় জাতি বা সমাজ সেই ভাবে গঠিত হয় নাই। ইংলণ্ডের রাজশক্তি, ভূম্যধিকারিগণের শক্তি, বণিক-সম্প্রদায়ের অধিকার ও শ্রমজীবীদিগের অধিকারের উপর অর্থাৎ শাসন-নীতির উপর জাতি বা সমাজের সত্তা নির্ভর করিতেছে। শাসন-নীতিই সমাজোন্নয়নের প্রকৃতি কারণ। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে ও গৌরদেশে যখন এক হিন্দু-সমাজ বা জাতি ছিল, তখন ধর্ম্মনীতিই সমাজোন্নয়নের প্রকৃত-কারণ ছিল, অর্থাৎ ধর্ম্মনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি ও ধর্ম্মনীতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বা জাতির অবনতি হইয়াছিল। পরে যখন হিন্দুসমাজ মুসলমান সমাজের সংঘর্ষে আসিল, তখনও পূর্ব্বনীতির অধিক ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কারণ মুসলমান সমাজও ধর্ম্মভিত্তির উপরই গঠিত ছিল। এখনও দেখা যায়, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত হিন্দু অস্পৃষ্ট জাতির জল পান করিতে সম্মত হয় না এবং যদি কোন মুসলমানের ভোজসভায় বহুদূরবাসী অন্য দেশের প্রজা অজ্ঞাত-কুলশীল কোন মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্য পরিচয় না লইয়াই সকলে একত্র বসিয়া তাহার সহিত আহারাদি করিয়া থাকেন। এই জাতীয়তা সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর অবস্থিত। জাপান বা ইংলণ্ডের জাতীয়তা সাধারণ রাজশাসনরূপ ভিত্তির উপর অবস্থিত। ইংরেজ বা জাপানীরা ধর্ম্মমতকে জাতি বা সমাজ-গঠনের কোন অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ মনে করেন না। সুতরাং

ইংরেজ বা জাপানীয় সমাজের সহিত ভারতীয় সমাজের তুলনা চলে না। সমাজ-বন্ধন বা 'জাতি গঠনের যে সমস্ত প্রকৃত-কারণ আছে, তন্মধ্যে কোন একটী কারণ অধিক পরিমাণে উত্তেজক হইলেই অপর কারণগুলিই অবস্থাভেদে এক-এক রকম গতিশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। জাপানী-মাতা পুত্রকে যুদ্ধে যাইবার সুবিধা দিবার নিমিত স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে পারেন; হিন্দুমাতা তাহা পারেন না। কিন্তু হিন্দুমাতা ধর্ম্মের জন্য অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে পারেন। ইংরেজ সৈনিকগণ শত্রুপক্ষকে দুর্ব্বল করিবার জন্য বারুদপূর্ণ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া নিজেরা ভস্মীভূত হইতে পারেন এবং মৃত্যুকালে বলিয়া থাকেন,—"ধন্য জগদীশ্বর! আমি রাজসেবা করিতে পারিলাম"। হিন্দু সৈনিকগণ শত্রুপক্ষের সম্মুখে অবস্থিত গাভীসমূহকে রক্ষার জন্য অম্লানবদনে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন এবং মৃত্যুর সময় বলিতে পারেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা,—তুমিই আমাকে দিয়া গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করিলে।" এক ক[illegible] বলিতে গেলে, উভয় জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য এক নহে। ইংরেজের দেশহিতৈ[illegible] অর্থে রাজভক্তি, আমাদের দেশহিতৈষিতার অর্থ ভগবানের প্রতি ভক্তি। [illegible] কেহ সমাজের বা জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সমাজের সাহায্য লইয়াই তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন হইবে না। জাতীয় মহাসমিতির 'জাতি' শব্দের এক অর্থ এবং জাতিসংস্করণ সভায় 'জাতি' শব্দের অন্য অর্থ। জাতিসংস্করণ সভা স্থাপন করিতে হইলে তাহা সর্ব্বজাতীয় বৃহৎ সভা মহাসমিতির আনুগত্যে স্থাপন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

ইংরাজ জাতির বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। ফ্রান্সে নরম্যাণ্ডী ও আন্‌জাউ নামক দুইটী প্রদেশ আছে। নরম্যাণ্ডীর অধিবাসিগণ ইংরেজকে জয় করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলে নর্ম্ম্যান্‌দিগের প্রভূত ক্ষমতা হইল নর্ম্মান্‌গণ ইংলণ্ডের ভূম্যাধিকারী হইলেন; রাজসরকারের সমস্ত উচ্চপদ একচে[illegible] করিয়া লইলেন—ইংরেজগণ ভৃত্য ও নর্ম্মান্‌গণ প্রভু হইলেন। তৎপরে অ[illegible] প্রদেশের অধিবাসী ইংলণ্ডের রাজা হইয়া নর্ম্মান্ ও ইংরেজের উপর স[illegible] চার আরম্ভ করিলেন; রাজসরকারের উচ্চ পদে আন্‌জাউবাসীদি[illegible] লাগিলেন; কারণ আন্‌জাউর নিকট নরম্যাণ্ডী ও ইংলণ্ড উভ[illegible] অত্যাচারে নর্ম্মান্‌গণ ও ইংরেজগণ "অতএব" বন্ধুতায় আবদ্ধ[illegible] রাজা জন্‌কে দিয়া 'ম্যাগ্‌না চার্টা' সহি করাইয়া লইলেন। ইংরেজগণ পরস্পর মেশামিশি করিয়া একজাতি অর্থাৎ[illegible]

হইলেন। তদনন্তর, রাজা, ভূম্যধিকারী ও শ্রমজীবিদিগের পরস্পরের ক্ষমতার সীমা লইয়া গোলযোগ হইতে থাকে; ইহার মধ্যে আবার প্রধান প্রধান ধনী বণিকগণ যোগ দিলেন। ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদিগের ও বণিকদের অধিকাংশই "লিবারেল্" (উদারনৈতিক) এবং ভূম্যধিকারীদিগের অধিকাংশই "কন্‌সার্‌বেটিভ্" (রক্ষণশীল) হইলেন। এইরূপ বিভাগই বহুবৎসর চলিতে থাকিল। আজকাল জগতের অনেক স্থলেই মূলধনের সহিত শ্রমের বিবাদ চলিতেছে। মূলধন অধিক লাভ চাহে, শ্রম অধিক পারিশ্রমিক চাহে। ইংলণ্ডেও নীরবে ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯০৬ সালের জানুয়ারীমাসে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনয়নের সময় এই শোণিতপাতহীন জাতীয় পরিবর্ত্তন স্ফুরিত হইয়াছে,—"লেবারাইট" (শ্রমজীবীদিগেরদল) নামক এক তৃতীয় পক্ষ যুটিয়াছেন। এই দল রাজনীতির পক্ষপাতী নহেন; উদারনৈতিক, রক্ষণশীল, আমদানীশুল্কের পক্ষপাতী, প্রতিহিংসামূলক শুল্কস্থা[illegible]নের পক্ষপাতী, আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় দল, সমস্ত দলের মতাবলম্বী লোকই এ[illegible]দলের সভ্য হইতে পারেন। ইঁহাদের মত এইরূপ:—(১) এই দলের সভ্য[illegible] উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীল, কোন দলেরই স্বার্থের পোষকতা করিবেন না; (২) শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে দরিদ্র ছাত্রদিগের আহার যোগাইবার জন্য বাধ্য করিবেন; (৩) কর্ম্মবিহীন শ্রমজীবীদিগের বিরুদ্ধে যে আইন আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা; (৪) রাজসরকার হইতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ; (৫) মিউনিসিপালিটীসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; (৬) বাণিজ্য-সমিতি বিষয়ক আইনের ধারা সংশোধন এবং "পিকেট্" (To picket) করিবার ক্ষমতা প্রদান।

(মন্তব্য—আমাদের দেশে "বয়কট" অনেক স্থানে "পিকেট্" বলিয়া অপরাধ [illegible] ব্যস্ত হইতেছে। বলপূর্ব্বক অন্যকে এক-ঘ[illegible]রিয়া করা, দ্রব্য খরিদ করিতে বাধা [illegible]ওয়া এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত)।

[illegible]ই দলের একজন প্রধান সভ্য মিষ্টার জন্ বার্ণস্, যিনি বিলাতে লোকাল [illegible] বোর্ডের সভাপতি, তিনি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—"আমি [illegible]স্থমনা এবং সর্ব্বোপরি অশিক্ষিত শ্রমজীবী-দিগের স্বাভাবিক জ্ঞান [illegible] এ পর্য্যন্ত এই দেশের গভর্ণমেণ্ট উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের [illegible] ছিল। আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমি পার্লিয়ামেণ্ট রূপ উপায় [illegible]জনৈতিক অসমতা, সামাজিক অত্যাচার ও শ্রমজীবীদিগের [illegible]ব। আমি কোন শ্রেণীবিশেষের তোষামোদ করিব না;

কিন্তু সমগ্র সমাজের উপকারার্থ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব। আমার লক্ষ্য এই যে, কর্ম্মাভাবে শ্রমজীবীরা যে কর্ম্মশালায় দণ্ডিত হয়, সেই দণ্ড-গৃহের সংখ্যা হ্রাস করা; শ্রমজীবীদিগের আবাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; অল্প ভিক্ষা কিন্তু অধিক বেতন; অধিক আমোদ কিন্তু অল্প মদ্যপান; সহরকে ক্ষুদ্রায়তন করা, কিন্তু কৃষক পল্লীর বিস্তৃতি সম্পাদন করা। ইহার ফল এই হইবে যে, অধিক বলবান্ পুরুষ, অধিক বলবতী নারী এবং অধিক সুস্থকায় সন্ততি জন্মিবে। আমি যুদ্ধের বিরোধী এবং অপরের ন্যায্য অধিকার আক্রমণের বিরোধী।

এই জগতীতলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা ঘোষণা করাই কাল্পনিক সামাজিক দলের উদ্দেশ্য। ইহাঁরা বলেন, ঈশ্বর ভূমি, জল ও বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন। জলে ও বায়ুতে সর্ব্ব মনুষ্যের সমান অধিকার। সৃষ্ট ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিও হয় না, হ্রাসও হয় না; সুতরাং এক অলস ভূম্যধিকারী অপরিমিত ভূমির স্বামী হইবে, আর অপর একজন সুস্থকায় বলিষ্ঠ শ্রমজীবী কৃষক চাষ আবাদ করিবার জন্য এক বিঘা ভূমির অধিকারীও হইবে না,—ইহা ঐশ্বরিক নিয়মের বহির্ভূত। ইহাঁদের নাম "সামাজিক দল" হইলেও ইহাঁরা সমাজবিধ্বংসকারী,—সমাজের বিপ্লবকারী।

সাধারণ সুখ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই মানবগণ অথবা জীবগণ সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। "নিত্যানেকসমবেতত্বং জাতিত্বং", নিত্য অনেক লোক একত্র সমবেত হইয়া বাস করিলেই জাতি গঠিত হয়। একত্র সমবেত হইবার উদ্দেশ্য,—সাধারণ সুখ-বৃদ্ধি। মানব বা অন্য প্রাণী একাকী বাস করিলে শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে আত্মরক্ষার্থ জন্তুগণ একত্র হইয়া বাস করে। মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকাগণ বহুসংখ্যক একত্র হইয়া ঘনভাবে বাস করে। তাহাদের ঘনবসতির কারণ এই যে, তাহারা সমাজগঠন-প্রণালী অবগত আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বাসস্থান নির্ম্মাণে ব্যাপৃত, কেহ আহার্য্য সঞ্চয়ে নিযুক্ত, কেহ বা শত্রুহস্ত হইতে আত্মসমাজ রক্ষার্থ বিব্রত। এইরূপ তাহাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ আছে; কিন্তু সকলই অনেক পরিমাণে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া সমগ্র সমাজের উপকারার্থ কর্ম্ম করে। মানব সমাজই বলুন, আর ইতর প্রাণীগণের সমাজই বলুন, সকল প্রকার সমাজগঠনের উদ্দেশ্যই একরূপ,—সাধারণ সুখ অর্জ্জনের জন্য ব্যক্তিভাবে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। এস্থানে সমগ্র সমাজকেই এক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে এবং ঐ সমাজভুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিকে সমাজশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-শরীরে উদর,

আছে, মস্তিষ্ক আছে, হস্তপদ আছে। সমাজেও ঐ সকল অঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যক্তিগণ আছেন। মনুষ্য শরীরের সামান্য একস্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ অসুখ বোধ করেন। মানব-সমাজরূপ দেহীও যদি সমাজস্থ সামান্য এক ব্যক্তির দুঃখ হইলেও দুঃখ বোধ করিয়া সেই দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই জানা যায়,—সমাজ জীবিত আছে, সমাজের বোধশক্তি আছে, সমাজ গতিশীল ও উন্নত। সমাজের সুখবৃদ্ধি করিতে হইলে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যদ্দ্বারা সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির সুখবৃদ্ধি হইতে পারে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে,—মানব-প্রকৃতির উন্নতির প্রকৃতি কারণ ও সমাজোন্নতির প্রকৃতি কারণ একরূপ নহে। সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ মতে উন্নত হইতে চেষ্টা কর,—সমাজ তাহাতেই উন্নত হইবে, এরূপ বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। সমগ্র সমাজের সাধারণ সুখ বর্দ্ধনের উপায় স্থির করিয়া তদনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই সামাজিক ও দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নচেৎ সমাজ বা জাতির দুঃখ দেখিয়া বিলাপ করিলে অথবা দুঃখ মোচনের উপায় না দেখিয়া মুহ্যমান্ হইয়া আত্মহত্যা করিলে কিম্বা সমাজ বা দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সমাজে বা ভিন্ন দেশে যাইয়া বাস করিলে, পূর্ব্ব সমাজ বা জাতির কোনই উপকার হয় না। এই প্রকার প্রকৃতির লোকসকল সমাজশরীরের নখ ও কেশ স্থানীয়। তাহাদের বৃদ্ধি বিনাশের জন্যই হইয়া থাকে। মধুমক্ষিকা বা পিপীলিকা তাহার সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমাজের কল্যাণার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, তদ্দ্বারা সমাজ প্রভূত ক্ষমতা-শালী হয় এবং সেই ক্ষমতাবলে যে পরিমাণে সুখ অর্জ্জিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত চেষ্টাবলে কখনই হইতে পারে না। ইহাকে বলে, "একতাই শক্তি"। যদি ইংলণ্ডের শ্রমজীবিগণ ইংরেজজাতীকে এক সমাজভুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে নিজদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া সমগ্র জাতির সাধারণ সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। আর যদি সঙ্কীর্ণমনা হইয়া নিজেরা মূল সমাজ হইতে বিভিন্ন হইয়া শুধু শ্রমজীবী-সমাজ নামক ক্ষুদ্র সমাজে আবদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে উদরের হিংসা করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-বর্গের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, সেই দুরবস্থা পুনরায় অভিনীত হইবে ভিন্ন ইংরেজ-জাতীর কোন প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আমরা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঘটনা-চক্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ মাত্র করিব। আমরা ইংরেজ সমাজ নামক বৃহৎ শরীরের কোন অঙ্গই নহি; সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখে ইংরেজসমাজ-শরীরে কণ্টক-মাত্রও বিদ্ধ হয় না। তবে 'মানুষ মানুষের ভ্রাতা' এই সর্ব্বজনীন নীতি অবলম্বন করিয়া ইংরেজ সমাজ আমাদের দুঃখে কিঞ্চিৎ ক্রন্দন করিতে পারেন। কিন্তু

ইংরেজসমাজ যখন দেখিবেন যে, ইংরেজসমাজ বা জাতির সুখসচ্ছন্দতা বিধানের জন্য ভারতের কিঞ্চিৎ রুধির গ্রহণের আবশ্যক হইয়াছে, তখন উদারনৈতিক দলই বলুন, রক্ষণশীল দলই বলুন, অথবা নবগঠিত শ্রমজীবীর দলই বলুন, কেহই তদ্বিষয়ে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইংরেজের কথা এই, বিশুদ্ধ নীতি শুধু শুক্রগ্রহে বা শনৈশ্চর গ্রহেই খাটিতে পারে, মানব জগতে মানব সমাজে সমাজবিশেষের বিশেষ সুখ বর্দ্ধনার্থ সার্ব্বভৌম নীতিকে পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাযন্ত্রে চড়াইয়া সেই নীতির অংশ বিশেষকে কর্ত্তন করিতে হইবে; তৎপর সেই নীতিকে সমাজসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং আমরা "ন্যায়, সত্য, বিশ্বপ্রেম" প্রভৃতি সুললিত বচন বিন্যাস করিয়া মধুর বিলাপধ্বনি করিলেও কেহই তাহা শুনিবে না; অথবা—

"শুনিয়া না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে,
জানাইব আমি যাতনা যত।"

শ্রীজানকী নাথ পাল।

কবিতা-কুঞ্জ।

একটী তারার প্রতি।

নিশি আসিবার আগে প্রতি সন্ধ্যাবেলা
খুলি পূর্ব্ব-নভ-দ্বার নীরবে একেলা
কোমল মধুর আলো প্রকাশি কৌতুকে
কে তুমি চাহিয়া থাক হাসি-ভরা মুখে?
যেই দূর দেশে তুলি বাঁধিয়াছ ঘর,
সেথায় হয় না কিগো কাহারো অন্তর
যাতনা-পূরিত এই ধরণীর প্রায়
পলে পলে বিমর্দ্দিত আশা নিরাশায়?
তোমা হেরি স্বদেশের কথা মনে পড়ে;
সান্ধ্য-দীপ জ্বালি নিত্য প্রেয়সী কাতরে
যেমতি রহিত চাহি দূর-পথ-পানে
বুক-ভরা প্রণয়ের সুমোহন টানে!
কাঁপিত সে দীপ-শিখা;—প্রিয়া-দিঠি শুধু
জাগিত চাঞ্চল্য-হীন তব মত বঁধু!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত

সন্ধ্যায়।

হয়ে এলো সন্ধ্যা ; পড়ে টিপি টিপি জল ;
বহিতেছে সন্ স্বনে পবন চঞ্চল।
তখনো জ্বালেনি দীপ। অন্ধকারে ঢাকা—
নীরব শয়ন-কক্ষে প্রেমিক সে একা।
জননী বলিলা ডাকি,—"বৌমা শীঘ্র করে
প্রদীপটী দিয়ে এসো তোমাদের ঘরে।"
হস্তে ঢাকি বধূ যত দীপ লয়ে আসে,
আধ পথে নিভে যায় চঞ্চল বাতাসে।
ঢাকি দীপ শেষে শুভ্র অঞ্চলের মাঝে
আনে প্রিয়া আঁখি দুটী মুকুলিত লাজে।
ফুটেছে আলোক স্পর্শে বক্ষ কোকনদ ;
ঘোমটা যেতেছে উড়ি, এ কিগো বিপদ !
কি মোহিনী লীলা ! ঘরে না আসিতে আলো
প্রেমিক-হৃদয়-কক্ষে জ্যোছনা ফুটিল !

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক।

কবির প্রতি।

থাম, থাম, ওগো কবি গেয়োনা প্রেমের গান,
হয়েছে অনেক, আর শুনিতে চাহে না প্রাণ,
তুলোনা বীণায় তব মধুর কোমল ধ্বনি,
তন্দ্রালস হয় হৃদি এ কল ঝঙ্কার শুনি'।
নির্জ্জীব হয়েছে চিত্ত উদ্যম উৎসাহ হীন,
কত কাল আর বল এরূপ কাটাব দিন ?
শুনে' শুধু প্রেম-গীতি দায়িত্ব গিয়াছি ভুলি'
ক্ষুদ্র প্রণয়ের পায় উচ্চ আশা দিছি বলি !
গাও আজ নব সুরে নবীন আশার গান
গভীর আবেগে পুন উঠুক মাতিয়া প্রাণ।
শিথিল অসাড় চিতে ঢাল উদ্দীপনা সুরা
অচিরে নিদ্রিত জাতি নবোৎসাহে দিবে সারা।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মজুমদার।

মতীচূর-সমালোচনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

তিনি বলিয়াছেন,—"আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি ; তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। * * আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। * * * মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, সেইরূপ অন্তঃপুরে থাকিয়া ললনাকুলও ইচ্ছা করিলে অনেক মহৎকার্য্য করিতে পারেন।" এ ত বেশ কথা। সমাজবন্ধন ঠিক রাখিয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে যেরূপ উন্নতি উপযুক্ত, তাহাতে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আছে। সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকিলে সেরূপ সমাজের সংস্কার অবশ্যই করণীয় ; কিন্তু গ্রন্থের সকল স্থলে ত ঠিক এরূপ ভাব বুঝা যায় না। "পুরুষের স্বামিত্ব স্বীকার না করিলেই ত পুরুষের সমকক্ষতা হয়" ; "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও,—নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জ্জন করুক",—এরূপ কথায় কি সমাজবন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝায় ? যাহা বুঝায়, তাহাতে এই বুঝি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর মূলমন্ত্র স্ত্রী-স্বাধীনতা।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ; কিন্তু এ স্বাধীনতার একটা প্রকার আছে। স্ত্রী এবং পুরুষ জন্ম সময়ে কেহ কাহারও অধীন হইয়া আইসে নাই ; তবে কেন মানব-সমাজে স্ত্রীজাতি সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের অধীন হইয়া রহিয়াছে ? আর তাঁহারা পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবেন না ! "অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি !" এইবার তাঁহারা জাগিবেন ! ইহাই এ স্বাধীনতার প্রকার ; কিন্তু এ প্রকার সাম্য, এ প্রকার স্বাধীনজাগরণ যে অস্বাভাবিক, আমরা নিম্নে তাহাই বুঝাইতেছি।——

স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম এই দ্বিবিধ ভাবে প্রশ্নগুলির মীমাংসা চেষ্টা করিতে হইবে। স্বভাবতঃ দেখা যায়, স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মকালে কতক সমান

হইলেও পরিপূর্ণতার পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, শারীরিক বলে স্ত্রী ততই পুরুষাপেক্ষা হীনাবস্থায় দাঁড়ায়। যদি বলা যায়, সমাজবিধিবশে বল চর্চ্চার অভাবে স্ত্রী পুরুষাপেক্ষা হীনবল হয়; কিন্তু প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল জীব গঠিত হয়, তাহাদেরও স্ত্রী পুরুষ-তুলনায় দুর্ব্বলা হয়। গো, অশ্ব, হস্তী, মেষ প্রভৃতি পশু এবং গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল হীন শ্রেণীস্থ মনুষ্যেরা স্ত্রী-পুরুষে সমভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদেরও পুরুষ স্ত্রী-অপেক্ষা অধিক বলবান্। য়ুরোপ ও আমেরিকার আদর্শে অনেকে স্ত্রী স্বাধীনতা চাহেন। আচ্ছা, তত্তদ্দেশের স্ত্রী কি পুরুষের সমান শক্তিসম্পন্না? সুতরাং দেখা যায়, পুরুষ-অপেক্ষা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা। অতএব শারীরিক শক্তি বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে সমতা কল্পনা করিলেও সত্যতায় ইহা অসম্ভব। স্ত্রীর প্রকৃতিই যে এ সাম্য-বিষয়ে তাঁহার প্রধান প্রতিকূল।

যদি স্ত্রী ও পুরুষে শারীরিক শক্তি-বিষয়ে বিষমতা থাকিল, তাহা হইলেই উভয়ের কার্য্যও ঠিক সমান হইতে পারে না।

তবে জ্ঞানের কথা। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু সময় পুরুষের যতটা আয়ত্ত, নানাকারণে স্ত্রীর ততটা নহে। কাজেই আদিকাল হইতে উভয়ে সমানভাবে জ্ঞানালোচনায় রত হইয়া থাকিলেও সময়ের ব্যতিক্রমে স্ত্রী স্বভাবতঃই পশ্চাতে পড়িবেন। অতএব এ পথেও স্ত্রী একমাত্র স্বভাবের নিয়মেই পুরুষের মুখাপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর একটা প্রশ্ন আছে।। পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই স্ত্রীর জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। ভাল, শিক্ষা কি? যাহার যে কর্ম্ম, সে সেইরূপ কর্ম্মে যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবম্বিধ জ্ঞান-বিধানের নামই ত শিক্ষা? স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ম্ম যদি সমান না হইল, তবে শিক্ষার সাম্য কিরূপে সম্ভব?

বিশেষতঃ জ্ঞানের দুইটা আকৃতি রহিয়াছে—জ্ঞান এবং বিশ্বাস। জ্ঞান অতি পরিশ্রম সাপেক্ষ, বিশ্বাস সহজে অবলম্বনীয়। কারণ জ্ঞান নিয়ত পরীক্ষার বিষয়ীভূত, বিশ্বাস তাহা নহে। এই জন্যই প্রধানতঃ পুরুষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন, স্ত্রী তাহাতে বিশ্বাস করেন। কতকে জ্ঞান অর্জ্জন করিবে,

কতকে তাহা বিশ্বাস করিবে,—ইহাই রীতি এবং স্বভাব। নতুবা প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে সংসার অচল হইত। পুরুষ জাতিগতভাবে কঠিন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং স্ত্রী সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে নানাদিক্ দিয়া সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়াছে।

প্রকৃতির বৈষম্য স্বাভাবিক; স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যও স্বভাবজ। অধিকন্তু স্ত্রী জ্ঞান-বলে সর্ব্বকালে পুরুষাপেক্ষা স্বভাবতঃই যেমন ভিন্ন-শক্তি, তেমনই হীন-শক্তি। গ্রন্থরচয়িত্রী বলেন, স্ত্রীজাতি হীনশক্তি হইয়াছেন 'আলস্যের দোষে' *। ভাল, সমগ্র সংসারের স্ত্রীজাতি কি একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া আলস্যাভিভূতা হইয়া বসিয়াছিলেন? নতুবা সেই অতি-আদি যুগে স্ত্রী-পুরুষ যদি সমান শক্তি লইয়া, সম-অবস্থাতেই সৃষ্ট হইয়াছিল, তবে স্ত্রী পুরুষের অধীনা না হইয়া, পুরুষ স্ত্রীর অধীন হইল না কেন?

আর যদি তাহাই না হইয়াছে, এত যুগের পর এত যুগের সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম কি সম্ভবপর?—না একদিনে সমগ্র সংসারের রমণী জাগিয়া উঠিয়া এ বিধি-শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধীন হইলে সে স্বাধীনতা দুই দিনের অধিক স্থায়ী হইবে? 'আলস্য' ঘুচাইলেও স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রীকে আবার পুরুষেরই অধীন হইতে হইবে!

তবে "পুরুষ স্ত্রীর 'স্বামী' আর স্ত্রী পুরুষের 'দাসী' হইল কেন" এবং "পুরুষ 'প্রেমদাস' না হইয়া 'স্বামী' হইল কেন" এই যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সে স্বতন্ত্র কথা। স্বভাব ইহার প্রথম কারণ হইলেও কৃত্রিমতা ইহার প্রধান কারণ। সভ্যতা,—যাহার জন্য সমগ্র সংসার লালায়িত, তাহা কৃত্রিম। স্বাভাবিক অসভ্যাবস্থা হইতে কৃত্রিম উপায়ে সমাজ-নিয়মের সৃষ্টি করিয়া মানবজাতি সভ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। স্বভাবের নিয়মে স্ত্রী যে বয়সে গর্ভধারণের ক্ষমতা

---

* বাস্তবিক আলস্যের দোষে নহে। এক শারীরিক দুর্ব্বলতা, দ্বিতীয়তঃ অন্তরের বিশিষ্টতায় এরূপ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?" থাকিবে না কেন? সবই আছে। বরং স্নেহ, দয়া, স্ত্রী, ধৈর্য্য ও প্রণয়াদি কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি পুরুষাপেক্ষা অনেক বেশীগুণে আপনাদের আছে। এই সকলের আধিক্যদোষই ত স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করিয়াছে। ঐ সকল বৃত্তির প্রত্যেকটিই যে মানুষকে আত্মহিতে উদাসীন এবং পরের অধীন করিয়া দেয়।

(লেখক।)

পান, পুরুষ কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় তাহার দ্বিগুণ বয়সে সন্তানোৎপাদনক্ষম হইয়া থাকেন। এই হেতু সভ্য সমাজ কৃত্রিম বিধানদ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে বয়ঃকনীয়সী স্ত্রী এবং গরীয়ান্ পুরুষে বিবাহানুষ্ঠান বিহিত করিয়াছেন *। এই বয়সাধিক্য—সুতরাং জ্ঞান-মান-বলাধিক্য হেতু পুরুষ স্ত্রীর নিকট স্বামী-রূপ সম্মান্য অভিধান পাইয়া থাকেন। ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই ;—বরং এজন্য সমুচিত বিনয়ে তাঁহার চরিত্র সমধিক সুভূষিতই হয়।

একে অন্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা স্বীকার না করিলে সমাজ থাকে না। যমজ ভ্রাতৃযুগলে কে কাহার অধীন ? কিন্তু তাহাদের মধ্যেও একে অপরকে জ্যেষ্ঠ স্বীকার না করিলে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়।—তখন বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামীর নিকট কনিষ্ঠা স্ত্রী একটু মাত্র ন্যূনতায় সম্মতা না হইলে গৃহ এবং সমাজ রক্ষা পায় কৈ ? শুধু সভ্য নহে, অসভ্য সমাজেও স্ত্রীর এ ন্যূনতার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃতি ও সমাজসিদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত বিধি।

লেখিকা বলেন,—"একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী, আবার ডাক্তার ও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী ?" 'স্বামী' কথাটা কি ? পরিণয়াবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ †। তন্মধ্যে 'স্বামী' পুরুষের এবং 'পত্নী' রমণীর বিশেষ সংজ্ঞা। বিশেষসংজ্ঞা বলিয়াই ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার পরস্পরে সাহায্যকারী হইলেও কেহ কাহারও (সামাজিক অপর সংজ্ঞা 'বন্ধু' ভিন্ন) স্ত্রী বা স্বামী হন না ; অথবা বিবাহ না হইলে পরস্পর সহায়তা করিলেও স্ত্রী-পুরুষ কেহ কাহারও স্ত্রী বা স্বামী হয় না।

আর 'স্ত্রী দাসী' সত্য সত্যই "দাসী" নহেন। তিনি স্নেহে জননী, সংসার নির্ব্বাহে সঙ্গিনী এবং সেবায় ‡ দাসী স্বরূপিণী হইবেন। আবার, স্বামী যেমন 'স্বামী' তেমনি 'প্রেমদাস'ও বটেন।—তিনি প্রেমদাস নহিলেন কিসে ? কিন্তু স্ত্রী যেমন সর্ব্বত্রই 'দাসী' নহেন, স্বামীও সর্ব্বত্রই 'প্রেমদাস' নহেন। সর্ব্বত্র 'দাসী' এবং 'প্রেমদাস' হইয়া থাকিলে আবার সমাজ টিঁকিত না। তবে

* সমাজে ইহার যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সংখ্যানুপাতে তাহা নিতান্তই সামান্য। আর তাহা কি প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্মত ? (লেখক।)

† এ অর্দ্ধাঙ্গ কিরূপ, তাহা পরে উল্লেখ করিব।

‡ স্ত্রী পুরুষের সেবা করিবেন কেন, সে কিরূপ সেবা, তাহাও পরে বলিব।

(লেখক।)

গ্রন্থকর্ত্রীচিত্রিত 'দাসী' যে বর্ত্তমান মৃত সমাজের দোষে এবং এরূপ সমাজের সংস্কার যে আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তারপর অলঙ্কার। "অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন" ইহা নূতন কথা। সমাজবন্ধন যাহাদের মধ্যে নিতান্ত শিথিল; সেই প্রকৃতি-ক্রোড়লালিতা অসভ্যজাতীয়া রমণীগণ মধ্যে পুষ্পাভরণ এবং ধাতব অলঙ্কারের ব্যবহার কি দাসত্বের নিদর্শন, না সৌন্দর্য্যের বেশভূষা * ? তবে একথা সত্য, সৌন্দর্য্য-বোধ বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই অলঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল, ধাতব পদার্থের মহিমায় তাহা ক্রমে মানুষের সম্পত্তি মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অলঙ্কার কখনও দাসত্বের নিদর্শন হয় নাই ;—এখনও উহা সম্পত্তি এবং সৌন্দর্য্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয় †। লেখিকা করুণ মধুর ভাষায় লিখিয়াছেন,—"পরিমিত ব্যয় করা গৃহিনীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগ্য পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক-একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিনী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না

---

* এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে পুরুষে কেন অলঙ্কার পরে না? পরে বৈ কি?—কিন্তু সে অলঙ্কার অন্যরূপ। তাহাদের সাধারণ বেশ ভূষার মধ্যে যে একটু পারিপাট্য, তাহাই তাহাদের পক্ষে প্রচুর অলঙ্কার। কেননা যে সমস্ত বহু পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য পুরুষকে করিতে হয়, তাহাতে স্ত্রীজন-সুলভ অলঙ্কার পরিয়া পুরুষের পক্ষে কার্য্য করা বিড়ম্বনীয় হইয়া পড়ে। উত্তর-পশ্চিমাদি অঞ্চলের স্ত্রী-অলঙ্কারের সহিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের গহনার তুলনা করিলে এ তথ্য বুঝা যাইবে। আরও বৈচিত্র্য দেখুন,—পুরুষের গুম্ফাদি দুই একটি স্বভাবদত্ত অলঙ্কার রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি স্পৃহায় যে কেশ বৃদ্ধি করিবার এবং নানাভাবে রচনা করিবার জন্য স্ত্রীলোকের শত যত্ন, পুরুষ তাহাকে অপেক্ষাকৃত খাট করিয়া ছাটিয়া রাখেন ; কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য স্পৃহার তৃপ্তি হয়। এই খানেই সৌন্দর্য্য লিপ্সার এবং অলঙ্কারের বৈষম্য বেশ বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের সুদীর্ঘ কুন্তলদামকেও কি গ্রন্থকর্ত্রী দাসত্বের নিদর্শন মনে করেন?

আর এক প্রশ্ন উঠিয়াছে,—'স্ত্রী-অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষের পক্ষে হীনতাসূচক কেন?' কঠোরকর্ম্মা সাহসী পুরুষে স্ত্রী-অলঙ্কার বা স্ত্রীবেশ ব্যবহারে স্ত্রী সুলভ কোমলতা আসিতে পারে, এই জন্য ইহা নিষেধ। স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী জাতীয় বেশ ব্যবহার করাই কর্ম্মোদ্ধারকল্পে কর্ত্তব্য ; তাহার বৈপরীত্যে সমাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়। তবে পুরুষের কর্ম্ম কঠোর কেন হইল, স্ত্রীর কেন হইল না, তাহার আভাষ পূর্ব্বে একটু দিয়াছি, পরেও দিব। (লেখক।)

† সধবার 'লৌহবলয়' ব্যবহার একটা আচারগত প্রথা। (লেখক।)

করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটু কাটব্য বলিবেন, কিন্তু সহানুভূতি করেন কৈ? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকাদ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা একসময়ে চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুণু রুণু রবে কাঁদিতে থাকে *"—যদি গহনা 'দাসত্বের নিদর্শন' হইত এবং স্ত্রী সর্ব্বথা 'দাসী' হইতেন, তবে এমন কটুভাষিনী, সহানুভূতিহীনা একটা 'দাসী'র মন রাখিবার জন্য হতভাগ্য স্বামীবেচারার প্রাণপণ পরিশ্রমলব্ধ শোণিততুল্য অর্থরাশির এত সহজে এমন শোচনীয় ব্যবস্থা হইত না।

অলঙ্কার যে 'দাসত্বের নিদর্শন' নহে, তাহার আর এক প্রমাণ "উল্কী"। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে প্রচুর ছিল,—অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও প্রচুর।—সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় পুরুষেরাপর্য্যন্ত 'চাইনীজ-ইঙ্ক' দ্বারা সর্পবেষ্টিত নোঙ্গর, ক্রুশ ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ভুজসৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। ইহা দাসত্বের, না সৌন্দর্য্যের নিদর্শন?

গহনা 'সধবার নিদর্শন' হইয়াই যে 'দাসত্বের নিদর্শন' হইয়াছে, ইহা কিসে বুঝা যায়? স্বামী বিয়োগ হইলে শোকের প্রবলতায় বিধবার সৌন্দর্য্যলিপ্সা থাকে না। বিশেষতঃ যখন গ্রন্থকর্ত্রী স্বীকার করিতেছেন যে,সমাজ-বিধিতে আছে,—"বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে!) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়;" তখন স্বামীবিয়োগের পর হৃদয়ে শোকশল্য লইয়া বিশ্বাসী স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌন্দর্য্যসজ্জার ইচ্ছা হওয়া একান্তই অসম্ভব। স্বামী এবং স্ত্রীর বেশভূষাপারিপাট্য মুখ্যতঃ পরস্পরের মনোরঞ্জনার্থ। সুতরাং একের অভাবে অপরের বেশভূষা সম্পাদন শুধু অনাবশ্যক নহে, সামজিক হিসাবে গর্হিত ও বটে†। দৃষ্টান্ত,—সন্ন্যাসী এবং চিরকুমারী

---

* 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধ।

† পুরুষও পত্নীবিয়োগে বেশভূষার পারিপাট্যে অল্পাধিক উদাসীন হয়েন। তবে কঠোর-কর্ম্মা কঠিনহৃদয় পুরুষ বহিঃসংসারের কঠোর কর্ত্তব্যে পড়িয়া অধিক অধীর হন না এই মাত্র। (লেখক।)

অথবা বালবিধবায়। যিনি চিরকুমারী, তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্য সভা-সমাজে অনর্থকর, দৃষ্টিকটু এবং অসঙ্গত। যে বালবিধবা,—স্বামী কি, ভাল বুঝে নাই, পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার প্রাণধরিয়া খুলিয়া লইতে পারেন না। যত দিন বালিকা সবিশেষ বুদ্ধিমতী হইয়া আপনি অলঙ্কার ত্যাগ না করে, ততদিন তাহার অলঙ্কার ব্যবহারে কেহই বাধা দেন না। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্না এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াও (পুনর্ব্বিবাহিতা না হইলে) সে বিধবা যদি অলঙ্কার ত্যাগ না করেন, তখন সমাজ হইতে——সেই আত্মীয়স্বজন হইতেই——সহস্র আপত্তি উঠিয়া থাকে। সেইরূপ স্ত্রীগ্রহণবিমুখ সন্ন্যাসী যদি পরিপাটি বেশে সাজিয়া সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে সন্ন্যাসীতে কে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইবে?—না সে সন্ন্যাসীর সমাজমধ্যে আদর-অভ্যর্থনা হইবে? ইহা হইতেই অলঙ্কার ব্যবহারের মর্ম্ম স্থূলতঃ বুঝা যায়।

অতঃপর সীতার কথা। "নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতাদেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। * * * * * * দেখিলে, ভগিনীগণ! ভারতবর্ষ এইরূপে নারীজাতির পূজা করে! তোমরা যদি সতীকে আদর্শ ভাবিয়া আপন আপন চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমরা কি হইতে পার? কেবল অসাধারণ প্রেমময়ী এবং পাষাণতুল্যা ধৈর্য্যময়ী।" বেশ ত। সতীর আদর্শ শিখিবার জন্যই ত সীতার চিত্র। এই জন্যই ত সীতার তুলনা সীতা। সংসারের সকল বিষয়েই যে এক সীতাকে আদর্শ ধরিতে হইবে ভারতবর্ষ কি তাহাই বলে? সীতার প্রতি রামের ব্যবহার সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিচার করা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে স্থূলতঃ ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিপুল প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থের জন্য প্রকৃত রাজাকে ব্যক্তিগত সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দিতে হয়। রাম তাহা করিয়া রামের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের কাছে ইহা ভিন্ন আর পথ ছিলনা।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

বর্ষা।

নিবিড় জলদ-মালা
গগন র'য়েছে ছেয়ে;
অভিনব সাজে আজি
সেজেছে প্রকৃতি মেয়ে!
রাত দিন ঝম্ ঝম্
গুরু গুরু গরজন;
একি মনোহর রূপ
অপরূপ দরশন!
যে বাসে না বাসে ভাল,
আমি বড় ভালবাসি—
বরষার মেঘমাঝে
মধুর বিজলী-হাসি।
নীলিম আকাশ তলে
থরে থরে মেঘ মালা—
চঞ্চল বালক মত
ছুটে ছুটে করে খেলা।
জানালায় থাকি ব'সে
আকাশের পানে চেয়ে
ছোট ছোট মেঘ গুলি
উড়ে উড়ে যায় ধেয়ে।
দেখিবারে সেই খেলা
আমি বড় ভালবাসি;
তাইত দেখিতে সদা
নিতুই এখানে আসি
কত দিন কত নিশি
জাগরণে কেটে যায়;
আমি বড় ভালবাসি
বরষার নীলিমায়।
দুইকুল ভরা নদী
তর তর বয়ে যায়;
সমস্ত সলিল রাশি
কল কল রবে ধায়।
কূলে কূলে ভরা জল
উছলিয়া পড়ে রূপ;
বরষার বারি ধারা
পড়ে তায় টুপ টুপ!
মেঘের উপরে মেঘ
সুনীল আকাশ' পরে
অনিমিষে দেখি কিবা
লুকো চুরি খেলা করে!
কি নূতন সাজে আজি
সেজেছে প্রকৃতি রাণী!
শ্যামল বসন দিয়ে
সাজায়েছে ধরা খানি।

শ্রীউষা প্রমোদিনী বসু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কার্ত্তিক সংখ্যা "কোহিনুর" ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত হইবে। ২রা কার্ত্তিক পত্রিকা গ্রাহকগণের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। যিনি না পাইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় পোষ্ট আফিসে অনুসন্ধান করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রভাত-মঙ্গল।

০০০

ওই উদয়-অচল-শিরে
নব তপন উদিল কি রে !
শিখরে-শিখরে মিহির আভা বিকীরি' উঠিছে ধীরে !
দিগ্বলয়ে মেঘের রেখা,
তাহে, ফুটিছে কণক পুলক-লেখা,
লতাপল্লবে ঠিকরি' কিরণ নাচিছে নিঝর-নীরে !

শীত সৈকত শ্যাম কান্তার হরষে হাসিছে আজি,
গৃহে-গৃহে উঠে শুভ প্রভাতী দ্রুত রভসে বাজি' !
কুঞ্জে-কুঞ্জে পিককুহরণ,
আঁচল দোলা'য়ে নাচে সমীরণ,
নূতন বেশে প্রকৃতি হাসে মুকুলে-পুষ্পে সাজি' !

হিমানী হইতে কুমারী-কূলে জেগেছে কি নব আলা,
টুটিয়া গিয়াছে ঘুমের ঘোর, জুড়েছে ছিন্ন মালা।
ভ্রাতা দিয়াছে ভ্রাতায় কোল—
গগনে উঠেছে হরষরোল,
জ্বালানিবারণ হাসিছে পবন প্রেম-শীকর ঢালা !

মরণ ঠেলিয়া জীবন জেগেছে, মিলন উঠেছে মাতি'
হৃদয়ে প'শেছে সুপ্রভাতে পূত ত্রিদীব-ভাতি।
আজি, বুঝেছে বেদনা বুঝেছে কর্ম্ম
উদার ক'রেছে হৃদয়-মর্ম্ম,—
দিগন্ত হ'তে একই কেন্দ্রে জু'টেছে অযুত সাথী।

যুগযুগান্ত নিহিত শক্তি জাগা'য়ে উঠেছে বীর,
কালের উরসে গোপন বীজে নব অঙ্কুর-শির !

উষার এ আলো স্বর্ণ-আশীষ
পড়ে ভারে-ভারে তা'রি চারিদিশ।
জীবন-তটিনী তুলিয়াছে ঢেউ আকুলে ভাসা'য়ে তীর।—
চিরচঞ্চল চপল আশা সহসা হ'য়েছে থীর!!

শুন মায়ের ললিত হরষ-গান
কত সান্ত্বনাময় আশীষাহ্বান,—
আজি, সন্তান-প্রাণে সঞ্চারে সুধা, বিশ্ব হরষে ঘিরে!
ওগো!—অযুত যুগের ত্রিদীব-উষা ভারতে এসেছে ফিরে'!!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

জাতীয়-জীবন।

——o*O*o——

ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা আজকাল দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা, ব্যক্তিগত চরিত্র, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিভিন্নতা এত বেশী যে এই দুরবস্থার কারণ ও নিরাকরণের উপায় সবরকমে এক হইতে পারেনা। এই দুরবস্থা দূর করিয়া ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, প্রত্যেক প্রদেশ-বাসীদিগকে নিজ-নিজ প্রদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেখানে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা জাতীয় উন্নতিসাধনে বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত চেষ্টার বিরোধী। যে সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ সমান ভাবে সংস্পৃষ্ট, সে সব বিষয়ে সমবেত চেষ্টারই প্রয়োজন। আভ্যন্তরিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা যখন এত বিভিন্ন, তখন, প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধন প্রত্যেক প্রদেশবাসীর পৃথক চেষ্টাসাপেক্ষ। সকলে এক সঙ্গে সে চেষ্টা আরম্ভ করিতে পারেন, পরস্পরের যথাসম্ভব সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্য প্রত্যেকের পৃথক ভাবে নিজ-নিজ প্রয়োজন মত

করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আমাদের যত্নসাপেক্ষ। রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের প্রকৃত অবস্থা ও কারণ আগে বোঝা দরকার। হীন ও পতিত বাঙ্গালীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে, কেন বাঙ্গালী এত হীন, এত পতিত, তাহা আগে বুঝিতে হইবে; তারপর কিসে বাঙ্গালী হীনাবস্থা হইতে উঠিয়া মানুষের মত হইতে পারে, তাহার উপায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী বহুদিন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে এই দুরবস্থায় পড়িয়াছে। এই দুরবস্থা হইতে এক দিনেই উঠিবে না। ভবিষ্যতে যাহাদের লইয়া বাঙ্গালী জাতি, যাহাদের উন্নতিতে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি, দেশের সেই যুবক সম্প্রদায় যদি নিজেদের দুরবস্থার কারণ সম্যক উপলব্ধি করিয়া সমবেত চেষ্টায় সেই দুরবস্থা দূর করিতে কৃতসংকল্প এবং সচেষ্ট হন, তবেই একদিন আবার বাঙ্গালী মানুষের মত হইবে, নতুবা নয়।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, ইহার কারণ কি এবং কি উপায় অবলম্বনে দেশের যুবক-সম্প্রদায় ভবিষ্যতে এই দুরবস্থা দূর করিয়া জাতীয় উন্নতি-সাধন করিতে পারেন, সঙ্ক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শরীররক্ষণোপযোগী আহার পরিচ্ছদ ও বাসস্থান সকলেরই চাই। মানুষ সুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, সুখে থাকিতে চায়। যে কোনও মতে বাঁচিয়া আছে, আর কোন সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পায় না তাহাকেই যখন আমরা দরিদ্র বলি, তখন কোনও মতে বাঁচিয়া থাকাই যার দায়, সুধু বাঁচিয়া থাকিতে যাহা চাই, তাও যার নাই, তাকে কি বলিব জানিনা। ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এরূপ হতভাগ্য যারা, তাদের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালীর আজ কাল এই অবস্থা,—এখন একেবারে না হউক, এই ভাবে চলিলে অচিরেই এই অবস্থা যে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আহার্য্য, পরিধেয়, গৃহোপকরণ প্রভৃতি মানুষের জীবন ধারণের জন্য যাহা চাই, তাহাই প্রকৃত ধন। যে দেশে ঐ সব যত বেশী আছে, যে দেশের লোকের পক্ষে ঐ সব যত সহজলভ্য, সেই দেশের লোক তত ধনী, তত সুখী। টাকা-কড়িতে প্রয়োজনীয় পদার্থ সুবিধায় মিলান যায়, তাই টাকাকড়ির আদর, তাই টাকাকড়িকে আমরা ধন বলি; নহিলে টাকাকড়ি খাইবার জিনিষ নয়, পরিবার জিনিষ নয়, টাকাকড়ি দিয়া ঘরবাড়ীও কেহ গড়িতে পারে না। দেশে টাকাকড়ি না থাকিলেও কোনমতে চলে, কিন্তু ভাতকাপড় না হইলে চলে না। এক দেশে মাসিক

পাঁচটাকা আয়ে লোকের সচ্ছন্দে দিন চলিয়া যায়। অন্য দেশে মাসিক ১০০৲ টাকাতেও সেই ভাবে দিন চলেনা। কোন্ দেশকে আমরা ধনী বলিব? সকলেই এক উত্তর দিবেন। টাকা হিসাবে যে যাই আয় করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। সেই টাকাতে কি পরিমাণে আবশ্যক জিনিষপত্রাদি জোটে, তাই দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বিচার করিতে হইবে। যাহা আমাদের প্রয়োজন, তাই যখন প্রকৃত ধন; টাকায় কি পরিমাণে সেই ধন পাওয়া যায় তাই বুঝিয়া যখন টাকার আদর; ধনের অভাবই যখন দারিদ্র্য, টাকার অভাব নয়; তখন দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে ধনবৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের ধন না বাড়িলে, স্থধু অর্থবৃদ্ধি অথবা আর্থিক হিসাবে ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধিতে, দারিদ্র্যদূর কখনও হইতে পারে না। ধনবৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া স্থধু টাকা আয়ে যারা-চেষ্টিত, তাদের দারিদ্র্যও কখনও ঘোচে না। উৎপাদনই ধনবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। কৃষি ও শিল্পে ধন উৎপাদিত হয়। বাণিজ্যে উৎপাদিত ধন দেশময় সকলের সহজপ্রাপ্য হয়। স্থতরাং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে যাহারা নিযুক্ত, দেশের ধন তাঁহাদেরই হাতে। চাকুরী প্রভৃতি অন্য উপায়ে যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে জীবিকার জন্য অনেক পরিমাণে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জন্য স্বভাবতঃই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেতনভোগী চাকুরের অপেক্ষা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীর অবস্থা ভাল, (অবশ্য যদি রাজা রাজস্ব-রূপে তাহাদের শ্রমলব্ধ ধনের অধিকাংশ গ্রহণ না করেন।)

বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত দ্রব্যাদিই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতির গুণে কৃষকই সেই ধনের ভোক্তা। বাঙ্গালার সেই কৃষক সম্প্রদায় প্রায়তঃ নিম্নশ্রেণীর লোক। বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্প যা আছে তাও সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর হস্তে। ব্যবসা বাণিজ্যও এক রকম তারাই করে। মধ্যবিৎ ভদ্রসম্প্রদায় সাধারণতঃ চাকরী বা আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ভদ্রব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালার ভদ্রসম্প্রদায় অপেক্ষা চাষার অবস্থা যে মোটের উপর ভাল, ইহা সকলেই আজকাল স্বীকার করেন। কারণও প্রধানতঃ ইহাই। আবার ভদ্রলোকের যত বাজেখরচ আছে, চাষার তত নাই। মোটা ভাতকাপড়ে তাদের দিন বেশ যায়, ভদ্রলোকের পাঁচরকম বাবুগিরি না হইলে ভদ্রত্ব রক্ষা হয় না। ইহাতেও বাঙ্গালার চাষা অনেকটা ভাল আছে।

যাহাহউক চাষার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়াই যে ভদ্রসম্প্রদায়ের দুরবস্থা হইবে এমন কোন কথা নাই। তাঁহারা যাহা আয় করেন, তাহাতে যদি দিন সচ্ছন্দে চলিত, চাহিলেই যদি চাকুরী মিলিত, উকিল মোক্তার হইলেই যদি মক্কেল জুটিত, ডাক্তারখানা খুলিলেই যদি রোগী আসিত, তাহাহইলে এই চাকুরী ও স্বাধীন ভদ্রব্যবসায়ের ভাত জুটিত। চাকুরী করায় কোন হাঙ্গামা নাই, নিয়মবাঁধা কাজগুলি করিয়া যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটিয়া যাইতে পারে, তাই আরামপ্রিয় ক্লেশকুণ্ঠ শিক্ষিত বাঙ্গালী চাকুরীই খোঁজেন। কিন্তু তাঁর চাকুরী হইলে সুবিধা হয় বলিয়া কে তাঁহার জন্য চাকুরী লইয়া বসিয়া থাকিবে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকর কেহ রাখে না। তাই চাকুরী চাহিলেই মেলে না। চাকুরী পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকেই উকিল মোক্তার ডাক্তার কবিরাজ হইতেছেন। আমাদের আর কোন গুণ থাক আর না থাক, আর কিছুতে কষ্ট করিতে পারি না পারি, শরীরপাত করিয়া পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ হইতে পারি, সুতরাং ইচ্ছা করিলে উকিল মোক্তার ও ডাক্তার কবিরাজ সাজিয়া বসিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই যে দেশের লোক সব অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা মোকদ্দমা করিয়া বা নানাবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের ঘরে আনিয়া টাকা ঢালিয়া দিবে, এমন হইতে পারে না। যত্ন ও পরিশ্রম অবস্থা-উন্নতির প্রধান উপায় এ কথা সত্য, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে যত্ন ও পরিশ্রম চাই, হালগরু লইয়া মরুভূমি কর্ষণে শস্য জন্মে না, মরুসাগরে জাল ফেলিলে মাছ মেলে না, পাহাড় খুঁড়িলে জল আসে না। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে, ধন বৃদ্ধিতে লোকের অবস্থা ভাল হইতে পারে। যে সব কাজে ধনোৎপাদন বা ধনবৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাতে যত পরিশ্রমই লোকে করুক, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, গবর্ণমেণ্ট বড় বড় চাকুরীগুলি বাঙ্গালীকে দেন না, তাই আমরা এত দুঃখী। কিন্তু বড় চাকুরী কয়টি আছে? খুব বেশী হইলেও ২।৩ শতের উপরে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি এই চাকুরীগুলি বাঙ্গালীকে দেন, তবে ২।৩ শত বাঙ্গালী বড় লোক হইল। কিন্তু তাহাতে এই যে হাজার হাজার সামান্য বেতনভোগী চাকুরে, হাজার হাজার চাকুরীপ্রার্থী, হাজার হাজার নিস্ব আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী, ইহাদের কি হইবে? বড় চাকুরেরা কি তাঁহাদের মাসিক বেতন ইহাদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন? দিলেই বা কি? তাহাতেও এ অভাব এ দুঃখ ঘুচিবে না। চাকুরে বাঙ্গালীর অধিকাংশই, ২০।২৫ টাকা

বেতনের সামান্য চাকুরে। আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীদেরও অধিকাংশের আয় উহা অপেক্ষা বেশী হইবে না। প্রতিবৎসর চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে সেই সামান্য চাকুরীও আর মেলে না। স্বাধীন ব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধি আরও বেশী। যাঁরা আছেন তাঁহাদেরই অন্ন জোটে না, যাঁরা যাইতেছেন তাঁদের যে কি হইবে ভাবিয়া পাই না। সকলেই একথা বোঝেন, স্বীকার করেন, অথচ সকলেই সেই এক সোজা নিস্ফল পথে ধাবিত হইতেছেন। ইহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দিন দিন যে কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া কুল পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানেই এই ভীষণ দুরবস্থা, ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান-সন্ততিবর্গের যে কি উপায় হইবে তাহা মনে করিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক কত আশার আকাশ কুসুম গড়িয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, ৮।১০ বৎসর কত অর্থব্যয়ে বহুপরিশ্রমে শরীরপাত করিয়া, কেহ উপাধি লইয়া, কেহবা সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংসারক্ষেত্রে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের এত অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম, এই স্বাস্থ্যনাশ, ইহার মূল্য কি হইবে? কোনও মতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ও নয়। হায়, আমাদের এই সব শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে এই ঘোর নিরাশার অন্ধকার কি ভয়ঙ্কর, কি মর্ম্মস্পর্শী যাতনাময়! ইহাদের নিম্নে আবার আরও কত যুবক সহস্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভই করিতে পারিতেছে না। ইহারা সকলেই চাকুরীপ্রার্থী, চাকুরী করিয়াই সকলকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহাদের ভবিষ্যত যে কি, তাহা বর্ননার অতীত, ধারণার বহির্ভূত! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য সুধু সুখসচ্ছন্দতার অভাব নয়, কোনও মতে জীবনধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রের অভাব—মানব সমাজে নিকৃষ্টতম দারিদ্র্য,—মানব জীবনের অতুলনীয় দুঃখ!

ইহার উপর এইসব হতভাগ্য যুবগকগণ আবার বেশীর ভাগই বিবাহিত—২।৪টি সন্তানসন্ততি-গ্রস্ত। যার নিজের উদরান্নের সংস্থান নাই, তার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভারবহন করিতে হইলে যে কি ভীষণ কষ্টে পড়িতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুস্থ সবল দেহ পুরুষ যে প্রকারেই হউক, মানে কি অপমানে, ছোট কি বড় কাজে, সুখে কি দুঃখে,—নিজের অন্নবস্ত্র নিজে জুটাইতে পারে। স্বদেশে না হউক, দূর দেশান্তরে যেখানে হয় যাইবে, না হয় মরিবে—মরিয়া দুঃখ যন্ত্রণা হইতে চিরনিস্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু বিবাহিত ও পরিবার-

গ্রস্ত হইলে তার আর উপায় নাই। কাছে না থাকিলে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ চলে না। আবার কাছে থাকিয়া পরিবারকে ভাতকাপড় দিয়া রাখিবে এমন কোন উপায়ও দেখে না। আপনার দুঃখকষ্ট মান-অপমান লোকে সহিতে পারে, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্ত্রীপুত্রাদির সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব, সেজন্য পরের অধীনতা, দিবারাত্রি নানা গঞ্জনা নানা অপমান মানব-হৃদয়ে অসহ্য। হায় কত যুবক যে এই অসহ্য দুঃখ বুকে লইয়া বিষময় জীবনযাপন করিতেছেন—তাহার ইয়ত্বা নাই! ভুক্তভোগী ব্যতীত এ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে আর কেহ পারেন না। এই অসময়বিবাহের বিষময় ফল হতভাগ্য যুবকদের একজীবনেই শেষ হয় না। ভীষণ দারিদ্র্যে প্রতিপালিত সন্তানসন্ততিগণও আজীবন উপযুক্ত শিক্ষা ও সুখসচ্ছন্দতার অভাবে চিরদিন কষ্ট পাইয়া যায়। এই বিষবৃক্ষ একবার রোপিত হইলে বংশানুক্রমে সকলে তার ফলভোগ করিতে থাকে! সন্তানসন্ততির বিবাহ দেওয়ার সময় কেহই একথা মনে করেন না। নবীনা পুত্রবধূর সহাস্য সলজ্জ মুখশোভা, পৌত্রপৌত্রীর স্নিগ্ধ সুকোমল স্পর্শ, সুমিষ্ট আধ-আধ ভাষ ইত্যাদি কাম্য সংসারসুখ ভোগের আশায়, অথবা, হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্তের সর্ব্বস্বহরণে নিজের অভাবমোচন করিবার জন্য, অনেক পিতা অনুপযুক্ত পুত্রের দুর্ব্বল স্কন্ধে চিরদিনের মত দুর্ব্বিসহ ভার চাপাইয়া যান। তাঁরা যতদিন জীবিত থাকেন, পুত্র স্বীয় স্ত্রীপুত্রের জন্য কোন কষ্ট পায় না সত্য, কিন্তু তাঁহারা পরলোকগত হইলেই হতভাগ্য পুত্র পৃথিবী অন্ধকার দেখে। বিবাহ দিবার সময় অনেকে পুত্রকে 'স্থিত' করিয়া যাইবার কথা বলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা পুত্রকে চিরদুঃখে 'স্থিতি' করিয়াই যান। যাহাদের এরূপ অবস্থা নয় যে অভিভাবকের অভাব হইলেও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন, অথবা অন্ততঃ সহজে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত অবস্থাপন্ন না হইয়া বিবাহ করার মত ভুল আর হইবার নয়। এ ভুল জীবনে আর শোধরাইবার উপায় নাই। জীবন ভরিয়া এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সন্তান সন্ততিগণ বংশানুক্রমে এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অবশ্য অনেক সময় দরিদ্র পিতা ধনীকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার ভবিষ্যত-উন্নতির উপায় করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় বিবাহ একেবারে অবিবেচনার কার্য্য এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে সমাজের আর একটি ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। ভদ্রলোকের কন্যাদায় যে ক্রমে কি ভীষণ হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। অবস্থাপন্ন শ্বশুরের

অর্থসাহায্যে পড়াশুনা করিয়া মানুষ হওয়া অনেক দরিদ্র যুবকের পক্ষে সুবিধা-জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু এক সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালা ছাড়া এরূপ সুবিধা পৃথিবীর আর কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। সে সব স্থানেও অনেক দরিদ্র যুবক নিজের চেষ্টায় বড় হইয়া থাকেন। বাঙ্গালাতেই, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে, বরং শ্বশুরের রাশি রাশি অর্থ ধ্বংস সত্বেও অনেক যুবক যেমন তেমনই থাকেন!

(ক্রমশঃ—)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

জম্‌ জম্‌-প্রসঙ্গ।

নবীবর হজরত ইস্‌মাইলের (আ) পরলোক গমনের পর কাবার অবস্থা ও জম্‌জমের ধ্বংশ-প্রাপ্তি।

-000

হজরত ইস্‌মাইলের (আ) জীবদ্দশায় পবিত্র কাবা তাঁহার তত্বাবধানে ছিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সাবেৎ কাবার তত্বাবধান-সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যভার ও সমগ্র 'জর্‌হম্‌'কুলের নেতৃত্বপদ লাভ করেন। সাবেতের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতামহ মাজাজ (mazaz) বিন্‌ ওমরত জর্‌হমী * এই সকল কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাবেতের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ সকলেই অল্পবয়স্ক ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও পূর্ব্বোক্ত মাজাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

এই সময় মক্কাবাসিগণ দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে মাজাজ জর্‌হম সম্প্রদায়ের দলপতি ছিলেন এবং সমীদা (samida) নামক জনৈক সর্দ্দারের অধিনায়কতায় কতুরবংশীয়গণ (Quatur) অবস্থিতি করিত।

---

* আরবী শব্দ বঙ্গভাষায় লিখিলে উচ্চারণ ঠিক হইবে না; তজ্জন্য নামগুলি বন্ধনীমধ্যে ইংরাজিতে প্রদত্ত হইল।

• বহুকাল হইতে এই সম্প্রদায়-দ্বয় পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। এই উভয় দলের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুদিন পূর্ব্বে 'এয়মন' প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দলপতি-দ্বয়ের মধ্যে মজাজ প্রাধান্য ও আধিপত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

কালক্রমে জর্‌হম ও কতুর বংশীয়গণের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহার ফলে মজাজের হস্তে সমীদা নিহত হইলেন। পবিত্র মক্কাধামে এইটিই সর্ব্বপ্রথম নরহত্যা। অতঃপর মজাজ তথাকার সার্ব্বভৌমিক নেতৃত্ব লাভ করিলেন।

মজাজের বর্ত্তমানে তাঁহার দৌহিত্র-নন্দনগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্তির পরও কাবার তত্ত্বাবধানকার্য্যাদির ভার তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয় নাই। ইহার অল্পদিন পরেই মজাজ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জনৈক স্ববংশীয় তদীয় নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হজরত ইস্‌মাইলের (আ) বংশধরগণের অবস্থা তাদৃশ উন্নত না থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের পৈতৃক অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কোনওরূপ চেষ্টা করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা তৎকালে জর্‌হমবংশীয়দিগের অন্যায়াচরণও বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করিতেছিলেন।

ক্রমে বহুবর্ষ অতীত হইলে বনি-ইস্‌মাইলগণের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এমন কি, মক্কাধামে তাঁহাদের বসবাসের স্থানাভাব ঘটিল। অগত্যা তাঁহাদের অনেকেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করত আরবের নানাস্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

আরও বহুকাল এবম্বিধ অবস্থায় অতিবাহিত হইল। জর্‌হমবংশীয়গণ আপনাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উঠিল। যাঁহাদের আদিপুরুষের উপর কৃপাপরবশ হইয়া দয়াময় জগদীশ্বর তৃণ-লতাবিরহিত প্রস্তরময় স্থানে পবিত্র জম্‌জম্‌ উৎসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহাদের আজ্ঞা অদ্বিরুক্তিভাবে অবনত মস্তকে পালন করিয়া সমস্ত আরব কৃতার্থম্মন্য হইত, দুর্বৃত্ত জর্‌হমীয়গণ আজ ধনমদে মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল! এই নরাধমগণের অত্যাচার হইতে মক্কার প্রবাসিগণও অব্যাহতি পাইল না!

ইহারা কাবার ধনরত্নাদি আত্মসাৎ করিতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদের অত্যাচার-কাহিনী তড়িৎ-বেগে আরবের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল।

তখন চতুর্দ্দিক হইতে দেশের প্রধান-প্রধান নেতৃগণ ইহাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একবাক্যে ইহাদিগকে কাবার তত্ত্বাবধান কার্য্যের ও পবিত্র মক্কায় বাস করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার অনতিকাল-পূর্ব্বেও মক্কা-ধামে কেহ কাহারও প্রতি অন্যায়রূপ অত্যাচার করিলে, সাধারণকর্ত্তৃক অত্যাচারী ব্যক্তির শিরশ্ছেদন দ্বারা তাহার প্রতিকার হইত। কদাচ ইহার অন্যথা পরিদৃষ্ট হইত না।

যাহা হউক, অনন্তর বণিবকর বিন্ আব্দল মোনফে বিন্ কেনানা নামক ইস্মাইল বংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত ব্যক্তি জরহমীয়গণের নেতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা কাবার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসী ও প্রবাসিগণের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতেছ; পবিত্র কাবামন্দিরের ধনরত্নাদির অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়াছ; সুতরাং কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্য্যের ভার আর তোমাদের হস্তে রাখা কখনই ন্যায়-সঙ্গত নহে। তোমরা অবিলম্বে এই সকল কার্য্যভার সরলভাবে আমাদিগকে প্রদান কর। এখন আমরাই এই কার্য্যের উপযুক্ত ও প্রকৃত অধিকারী। তোমরা এতাবৎকাল কেবল আমাদের ইচ্ছানুক্রমেই এই সকল দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে। তোমাদের পিতৃ-পিতামহগণের সহিত আমাদের স্বর্গস্থ পূর্ব্বপুরুষগণ বৈবাহিকসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, শুদ্ধ সেই আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা তোমাদের নেতৃত্বে এযাবৎ কোনওরূপ প্রতিকূলাচরণ করি নাই। কিন্তু তোমরা এখন বিবেকহীন হিংস্র জন্তুর স্বভাব গ্রহণ করিয়া তোমাদের নিরীহ প্রতিবেশীদিগের উপর অত্যাচার করিতেছ এবং নানাবিধ ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পবিত্র স্থানের কুৎসা বিঘোষিত করিতেছে। সুতরাং অবিলম্বে তোমরা কাবার সকল সংস্রব ত্যাগ করত মক্কা পরিত্যাগ কর; নতুবা তোমাদের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য।"

ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, এসময় জরহমীয়গণের অবস্থা বণি-ইস্মাইলগণের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ছিল। কাজেই ইস্মাইল বংশীয়গণের প্রস্তাব তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

জরহমীয়গণ বণি-ইস্মাইলদিগের কথায় কর্ণপাত তো করিলই না, বরং তাঁহাদিগকে আপন পৈতৃক নেতৃত্বপদের দাবী করিতে দেখিয়া আপনাদের প্রাধান্যের ভাবী কণ্টক বোধে ইস্মাইলবংশীয়গণের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং আপনাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জা করিল।

অন্য দিকে বণি-ইস্‌মাইল সম্প্রদায়ের নেতা বণি-বকরও খজায়া (Khazaya) নামক অন্য এক প্রবলপরাক্রান্ত সম্প্রদায়কে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া ইহাদিগের সমুচিত শিক্ষা প্রদান জন্য অগ্রসর হইলেন।

জরহমীয়গণ বল-বিক্রম ও বৈভবে ইস্‌মাইলবংশীয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বটে; কিন্তু নিরীহ মানবকুলের উপর অত্যাচার করিয়া ইহাদের অন্তঃকরণ সাতিশয় দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতির কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তাঁহার সৃষ্ট জগতের কি অপরূপ পদ্ধতি! তিনি যে জাতিকে উন্নত করেন, তাহারা যতদিন স্বীয় অধীন প্রকৃতি-মণ্ডলীর সহিত সদ্ব্যবহার করে, যতদিন তাহাদের হিতসাধনে যত্নবান থাকে, যতদিন তাহারা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন তাহাদিগকে কাহারও নিকট অপদস্থ বা লাঞ্ছিত হইতে হয় না। কিন্তু ন্যায়-বিগর্হিত পথে পাদক্ষেপ মাত্র অদৃশ্যভাবে কোথা হইতে অবনতি রাক্ষসী তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে! দুরন্ত জরহমীয় দিগের অবস্থাও ঠিক ঐরূপই হইয়াছিল। হজরত ইস্‌মাইলের (আ) পবিত্র বংশধরগণকে আর ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়-বিচারক বিশ্ববিধাতা তখন ইহাদের হৃদয়ে এরূপ মহাভীতির আবির্ভাব করাইয়া দিয়াছিলেন যে, জরহমীয় সম্প্রদায় বণি-ইস্‌মাইলগণের আকার প্রকার দেখিয়াই সন্ধি-প্রার্থী হইল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, ইহারা আপনাদের পরিবার, ধনরত্ন ও পশ্বাদি লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে মক্কাধাম পরিত্যাগ করিবে এবং ইহাদের স্থান পরিত্যাগের পর বণি-ইস্‌মাইলগণ মক্কাধামে প্রবেশ লাভ করিবেন। ইত্যবসরে জরহমীয়-দলপতি ওমর-বিন্‌-হারেস্‌ প্রবল বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া 'হজ্‌রে-আসওদ'-(কৃষ্ণ প্রস্তর)-টিকে কাবার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উঠাইয়া অন্য একস্থানে স্থাপিত করিল এবং সুপ্রসিদ্ধ পারস্যসম্রাট এস্‌ফেন্দিয়ার প্রদত্ত কাবার উপঢৌকন রত্নখচিত সুবর্ণময় একটী দ্বি-মৃগ-শাবক মূর্ত্তি জম্‌জমের জলে নিক্ষেপ করত পবিত্র নির্ঝরটিকে সমভূমিতে পরিণত করিয়া সদলে মক্কা পরিত্যাগ করিল।

বিখ্যাত 'রত্তজাতোল্‌ আহ্‌বাব' প্রণেতা জরহমীয়গণের মক্কা পরিত্যাগ কাহিনীর শেষভাগে লিখিয়াছেন—এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, আল্লাহ তা আলা জরহমীয়দিগের অত্যাচার-নিবন্ধন ইহাদের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে মসূরিকা বা বসন্তের মড়ক প্রেরণ করিয়া ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই মহামারীতে প্রাণাহুতি দেয়। অবশিষ্ট সকলেই

প্রাণভয়ে মক্কাধাম পরিত্যাগ করে। এই দুর্ঘটনার অতি অল্পকাল পরেই বণি-ইস্মাইল-দল তাঁহাদের প্রিয়তম জন্মভূমিতে প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রবিষ্ট হইয়া পবিত্র জম্‌জম্‌কে লুপ্ত অবস্থায় দেখিতে পান। তাঁহারা জম্‌জমের পুনরুদ্ধার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও তৎকালে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হন নাই।

জম্‌জমের পুনরুদ্ধার।

পূর্ব্ব-কথিত ঘটনাসমূহের পর কয়েক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বণি-ইস্মাইলবংশীয় আব্‌দল্ মোত্তালিব তখন কাবার নেতৃত্ব-পদ লাভ করিয়াছেন। একদিন তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিলেন যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে জম্‌জম্ খনন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। জম্‌জম্ যে কি পদার্থ, তাহা আব্‌দল্-মোত্তালিব তখন আদৌ অবগত ছিলেন না।—

তিনি আবার একদিন নিদ্রিতাবস্থায় সেই অপরিচিত ব্যক্তির দর্শন লাভ করিলেন। এইবার তিনি তাঁহাকে (আবদল্ মোত্তালিবকে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"জম্‌জম্ কি,—জান না? জম্‌জম্ হজরত জিব্রাইলের পদাঘাতোৎপন্ন একটী নির্ঝর। ইহা হজরত ইস্মাইল (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গের পানীয় জলের উৎস। উহার এরূপ (বরকৎ) প্রাচুর্য্য-শক্তি আছে যে, যাহারা উহার জল পান করে, তাহারা একান্ত পরিতৃপ্ত হয়, তাহাদিগের আর কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্যেরই আবশ্যক হয় না। উহার জল পান করিলে রুগ্ন ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যলাভ করে। উহার জল জীবকুলের শ্রেষ্ঠতম ভোগ্য পদার্থ।"

আব্‌দল্ মোত্তালিব নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া জম্‌জমের স্থান-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল-চিত্তে করুণাময়ের সমীপে নিবেদন করিলেন:—"হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ! তুমি এই দীনহীন দাসকে জম্‌জমের সকল জ্ঞাতব্য-বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত করাও।" অতঃপর তিনি আবার স্বপ্নাবস্থায় জানিতে পারিলেন, যে স্থানে 'আসাফ' ও 'নাএলা' নামক দুইটি বিগ্রহ আছে ও যে স্থানে কোরেশগণ কোরবাণী প্রদান করিয়া থাকে, তুমি সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুইটি পক্ষী যে স্থানে অবতরণ করিবে, সেই স্থানই জম্‌জমের উপরিস্থিত ভূমি। সেই স্থল খনন করিলেই তোমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।" এইবার আবদল্ মোত্তালিব শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত তাঁহার (তাৎকালিক) একমাত্র পুত্র হারেস্ (Hares)কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বপ্নাদিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি

স্বপ্নোপদিষ্ট চিহ্নগুলির বিষয়ে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময়ে মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুইটি পক্ষী আকাশ হইতে অবতরণ করিল। তখন স্থান-নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহার সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল। তিনি মহাউদ্যমে খননকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কোরেশগণ এই সংবাদ শ্রবণে সকলে দলবদ্ধভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে খনন-কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু আবদল্ মোত্তালিব তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে তাহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল:—"আপনি বিনা কারণে আমাদের উপাস্য বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাস্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থান খনন করিতেছেন এবং আমাদের অনুনয়বিনয় সত্ত্বেও আমাদের নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করিতেছেন না।—আপনি এখনও এই অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হউন; নতুবা আমরা অসি-সাহায্যে আপনাকে এই অসৎকার্য্য হইতে বিরত করিব।'

কোরেশবংশীয়গণের এই সকল বাক্য শুনিয়া আব্‌দল্ মোত্তালিব কুপিত হইলেন এবং তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য হারেস্‌কে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান পিতা-পুত্রকে এরূপ বিক্রম প্রদান করিয়াছিলেন যে, কোরেশগণ তাহাদের বিপক্ষদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া সকলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পিতা পুত্রে তখন অধিকতর উৎসাহের সহিত কূপ-খননে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের খননকার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে উৎস-প্রাচীরের প্রস্তরাদি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আব্‌দল্ মোত্তালিব আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চ নিনাদে পবিত্র তক্‌বির (স্তোত্র) পাঠ করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল তাঁহারা আপনাদের কার্য্য হইতে একবারও বিরাম গ্রহণ করেন নাই। কূপ-গহ্বর যত গভীর হইতে লাগিল, তাঁহাদের উৎসাহও তত অধিক বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে কতকগুলি যুদ্ধাস্ত্র ও পূর্ব্বোল্লিখিত স্বুবর্ণময় দ্বি-মৃগশাবক মূর্ত্তিটী পাওয়া গেল। কোরেশগণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আব্‌দল্ মোত্তালিবের নিকট আগমন করিল এবং তাঁহার লব্ধ দ্রব্যগুলির অংশের দাবী করিতে লাগিল। তদুত্তরে আব্‌দল মোত্তালিব কহিলেন:—"তোমরা সকলেই এই কার্য্যে আমায় সাহায্য না করিয়া একযোগে বাধা প্রদান করিয়াছিলে; তজ্জন্য তোমরা ন্যায়ানুসারে এই সকল

লব্ধ সামগ্রীর কিছুমাত্রও অংশ পাইবার অধিকারী নহ। কিন্তু আমি যাহা করিতেছি, তাহা কোন প্রকার লোভের বশীভূত হইয়া করিতেছি না; কেবলমাত্র ঈশ্বরাদেশেই করিতেছি। তোমরাও অচিরে আমার কার্য্যে লাভবান হইবে। আমি তোমাদের হিতকামী বই অহিতাকাঙ্ক্ষী নহি। তোমরা এই জিনিষগুলি লইয়া সকলের নামে সুরতি কর। কিন্তু আমাদের নামের সঙ্গে আমাদিগের সকলের পক্ষে পবিত্র কাবা-মন্দিরেরও একটি নাম থাকিবে। দ্রব্যগুলি যাহার নামে উঠিবে, সেই তাহা গ্রহণ করিবে। তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

তাঁহার বাক্যে কেহই কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না; সকলেই আনন্দ-সহকারে সুরতি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সুরতিতে সমগ্র কোরেশদলের একটি, আব্দল মোত্তালিবের একটি ও কাবা-মন্দিরের একটি নাম থাকিল। লব্ধদ্রব্যগুলিও দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। এক অংশে যুদ্ধাস্ত্রগুলি ও অন্য অংশে রত্নখচিত সুবর্ণময় মূর্ত্তিটী রক্ষিত হইল। অনন্তর সুরতিকার্য্য সমাধা হইলে সুবর্ণ-মূর্ত্তিটী আব্দল্ মোত্তালিবের নামে ও যুদ্ধাস্ত্রগুলি কাবা-মন্দিরের নামে উঠিল। ইহাতে কোরেশীয়গণ একান্ত দুঃখিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই ঘটনার পর আব্দল-মোত্তালিব তাঁহার অংশলব্ধ সুবর্ণময় মূর্ত্তিটী নিজে গ্রহণ না করিয়া কাবা-গৃহের শোভা-সংবর্দ্ধনার্থে গৃহাভ্যন্তরে বিলম্বিত করিলেন। ইহার বহুদিন পরে পাতকী আবু জেহেল এই মূল্যবান দ্রব্যটি রাত্রিযোগে অপহরণ করিয়া মক্কা-প্রবাসী এক বণিক-সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল।

আব্দল-মোত্তালিবের খননকার্য্য আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে জম্‌জমে জলের আবির্ভাব হইল। তিনি এই পবিত্র জলের সংরক্ষণার্থে চতুর্দ্দিকে রীতিমত প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই বৎসর হইতেই তীর্থযাত্রিগণ মহানন্দে জম্‌জমের জল পান করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে জনসমাজে পুণ্যবান আবদল্ মোত্তালিবের সম্মানও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইল। ‡

মোহাম্মদ এব্রার আন্‌সারী।

‡ 'রওজাতোল্ আহবাব' হইতে সঙ্কলিত।

পারস্য হইতে হুমায়ুনের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন।

—০*০—

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে (৯৫২ হিজরী) সম্রাট হুমায়ুন বিপুলবাহিনীসহ কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইলে, যুবরাজ কামরান ভীতিবিহ্বল হইয়া প্রথমতঃ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লন। পরে আত্মীয়-পরিবার লইয়া হিন্দুস্থান অভিমুখে প্রস্থান করেন।

যুবরাজ পলায়নপর হইবামাত্র তথাকার শাসনকর্ত্তা কারাজা খাঁ সম্রাট-সদনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে দুর্গপ্রবেশ করিতে অনুরোধ করেন। তখন গভীর রজনী। তত্রাচ সম্রাট তাঁহার প্রস্তাবমত দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া দেওয়ান খাসে (মন্ত্রণা গৃহে) অবতরণ করেন। সম্রাট সারাদিন অনাহারে ছিলেন বলিয়া ক্ষুৎপিপাসায় বড়ই কাতর হন এবং গৃহাধ্যক্ষ ওয়াসিল ও আফ্‌তাবচি জোহরকে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিধবা-পত্নী বায়কি বেগমের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করেন।

তাহারা বেগমের নিকট সম্রাটের অভিবাদন জানাইয়া আগমনের কারণ প্রকাশ করিল। বেগম কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করত অবিলম্বে কিছু সুরুয়া (মাংসের ঝোল), মাংসের ব্যঞ্জন এবং কিছু ফলমূল প্রদান করেন। খাদ্যাদিসহ দেওয়ান-খাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহাধ্যক্ষ টেবিলের উপর চাদর বিছাইয়া সম্রাটের সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া দিল। সম্রাট চামচাদ্বারা মাংস তুলিতেই বুঝিতে পারেন যে, উহা গো-মাংস। তাই রেকাবির উপর হইতে হাত সরাইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"হতভাগ্য কামরান! এই কি তোমার নিজের জীবন-যাপনের প্রণালী? তুমি কি পবিত্রতার আশ্রমকে (বেগমকে) গো-মাংস দ্বারা পরিপুষ্ট কর? তুমি কি তাঁহার জীবনধারণের নিমিত্ত গোটাকতক মেষও সংগ্রহকরিতে পার না? যে ভক্ত আমাদের পিতার সমাধির আশায় অপেক্ষা করে, তাহার উপযুক্ত খাদ্য ইহা নয় (১)। আমরা তাঁহার চারি পুত্রে কি তাঁহার ন্যায় তাঁহার বিধবাকে রক্ষা করিতে পারি না?" সম্রাট অতঃপর খাদ্যাদি ত্যাগ করিয়া এক পেয়ালা সরবত পান করত শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

---

(১) বাবর কাবুলে সমাহিত হন। তাহা তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল।

যুবরাজ কামারানের সমস্ত কর্ম্মচারী ও সরদারবৃন্দ আসিয়া সম্রাটকে অভি-বাদন করেন। সম্রাটও তাঁহাদিগকে আদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। তৎপর সম্রাট নগরে ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন যে, সম্রাট সমস্ত নগরবাসীকে ক্ষমা করিয়াছেন; কাহারো ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর সরদারদিগের সম্মানের তারতম্যানুসারে জেলাবিভাগ করত সম্রাট তাঁহাদিগকে জায়গীর প্রদান করেন।

সম্রাট কাবুলে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাদক্সানের মীর্জ্জা সোলেমানের (২) নিকট এক ফারমান প্রেরণ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই:—"আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার সহিত আপনার বন্ধুতার জন্য আমার ভ্রাতা কামরান আপনাকে নানাপ্রকারে ক্লিষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে ভগবানকে ধন্যবাদ যে, সময়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আপনার প্রতি আমার যে স্নেহ-মমতা আছে, তাহার প্রমাণ দিবার বাসনায় আপনাকে একবার এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বহুদিন হইতে আমি আপনাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।" মীর্জ্জা এই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া উত্তর দেন:—"কামরান আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছেন যে, তিনি প্রথমে সম্রাটের সহিত রণ-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ না করিলে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

সম্রাট এই সময় পুত্র মোহম্মদ আকবরের ত্বকচ্ছেদন উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় এই অপমান গ্রাহ্য করেন না। এই আনন্দোৎসবে রাণী হামিদ বানুবেগম যাহাতে যোগদান করিতে পারেন, তদভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনয়নের নিমিত্ত কান্দাহারে যাইতে কারাজাবেগ ও অপরাপর সরদারগণ আদিষ্ট হয়। ইত্যবসরে সম্রাট বারণ নদীতে (৩) ক্রীড়ার্থে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে 'সুরৎখানা' নামক এক উদ্যানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হয়। তৎস্থানেই এই মহাসমারোহব্যাপার সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়। রাণী উপনীতা হইলে রাজ-সিংহাসন উত্তোলিত হইল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে যুবরাজ ও আমীর ওমারহ-গণের নিমিত্ত অনেকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে অন্যান্য সকলেও স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুযায়ী আসন গ্রহণ করেন। সকলে উপবেশন করিলে যুবরাজ আকবরকে মজলিসে উপস্থিত করা হয় এবং মোহম্মদীয়

(২) ইনি চেঙ্গিজ্ খাঁ কিম্বা তাইমুরের বংশধর।

(৩) বাবর লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই নদীতে নানাপ্রকার মৎস্য এবং বহুপ্রকারের বন্যকুক্কুট পাওয়া যাইত।

ধর্ম্মানুসারে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করা হয়। তৎপর সরদারগণের মধ্যে খেলাত বিতরণ ও প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হয়।

অতঃপর সম্রাট মীর্জ্জা সোলেমানের ব্যবহারবিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পান। মীরমোহম্মদালীকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, সম্রাট, জাফরের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হন। তথায় সৈন্যাদি সংগ্রহ করত আন্‌ডারার অভিমুখে অগ্রসর হন। মীর্জ্জা সোলেমানও এই সময় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিরজেরান নামক পল্লীতে উভয় পক্ষের মিলন হয়। এখানে সামান্য সংঘর্ষেই সর্ব্বশক্তিমানের কৃপায় সম্রাট জয়লাভ করেন। মীর্জ্জা প্রাণভয়ে পলায়নপর হন।

এই আহবের পর সম্রাট কেশেম যাত্রা করেন। তথায় তিনি তিনমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। কেশেম পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই তিনি পীড়িত হন। একদিন তাঁহার অবস্থা এতই শোচনীয় হয় যে, তাঁহার চেতনার কোন লক্ষণই বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অনেকানেক সরদার পলায়নের আয়োজন করে। কারাজা খাঁ এই সময় বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া যুবরাজ আসকারীকে স্বগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। রাণীও অত্যন্ত শোকাতুরা হন। তিনি নিজেই সম্রাটের সেবাশুশ্রূষা করেন। একদিন বেগম ডালিমের কিঞ্চিৎ রস বাহির করিয়া সম্রাটের মুখে দেন। তাহাতেই ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার চেতনার সঞ্চার হয়। সম্রাট চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজকর্ম্মের অবস্থা কিরূপ? বেগম বলেন যে, সকলেই উৎকণ্ঠিত এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তদনুসারে সম্রাট কারাজা মীর্জ্জাকে আহ্বান করিয়া বলেন,—"আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি; তুমি অপর সকলের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দূর কর।" কারাজা বাহিরে আসিয়া সরদারদিগকে জানান যে, সম্রাট পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই সম্রাট আরোগ্যলাভ করত জাফর-দুর্গে প্রত্যাগমন করেন। তথা হইতে তিনি মেহের ওয়াসিল এবং অপর কতিপয় কর্ম্মচারীকে কাবুল হইতে তাম্বু এবং হিন্দুস্থানে অভিযানে যাইতে আর যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন, তাহা আনিবার আদেশ প্রদান করেন।

সম্রাট হুমায়ুন জাফরে (Juffer) অবস্থান সময়ে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দ (৯৫৩ হিজরী) যুবরাজ কামরান বিকার হইতে দ্রুত গতিতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া টিরি (Tyry) দুর্গ অধিকার করত তথাকার শাসনকর্ত্তার অক্ষিদ্বয় উৎপাটিত করেন। তৎপর গিজনী (Ghizni) দখল করিয়া তাহার শাসনকর্ত্তাকে হত্যা করেন। ইহার পর

তাড়াতাড়ি কাবুলে উপনীত হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারিগণকে অসতর্ক দেখিয়া অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং তৎস্থান অধিকার করত কাহাকেও হত্যা, কাহাকেও বা অন্ধ করেন। এইসকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি অবশেষে যুবরাজ মোহম্মদ আকবরকেও ধৃত করেন।

এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া সম্রাট মীর্জ্জাসোলেমনের সহিত সন্ধি করেন এবং জাফর-দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন কিন্তু তদন্তর্গত খান্দেজ জেলা তিনি পৃথক করিয়া যুবরাজ হিন্দলকে দান করেন। তৎপর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া সম্রাট কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন; কিন্তু অনেক-গুলি সরদার তৎপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কামরানের সহিত মিলিত হন।

সম্রাট টালিকানে উপনীত হইলে মুষলধারে বারি ও করকাপাত হইতে আরম্ভ হয়। তজ্জন্য তথায় তিনি কিয়দ্দিবস অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। আকাশ পরিষ্কার হইলে সম্রাট-বাহিনী খান্দেজে উপস্থিত হয়। তথায় যুবরাজ হিন্দল সমাদরে আতিথিসৎকার করেন।

এই সময় কারাজা খাঁ সম্রাটকে বলেন যে, সরদারগণের পলায়নহেতু বহুতর সৈন্য বিচলিত হইয়াছে। তাহারাও পলায়নোন্মুখ; সুতরাং তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করা প্রয়োজন। তদনুসারে সম্রাট সৈন্যদলমধ্যে গমন করিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি-সূচক কথা বলেন এবং অচিরেই সুখের মুখ দেখিতে পাইবে বলিয়া অশ্বাস দেন। গ্রন্থকার জোহর বলেন, তিনিও সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন।

সম্রাট 'চাহার দ্বারের' (চারিদ্বার) পথে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এসময় দারুণ শীত—ঠিক ঋতুর মধ্যভাগ; রাস্তা-ঘাট বরফাবৃত,—তাহা ঠেলিয়া যাওয়া কঠিন। কাজেই তৎসমুদয় সরাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করত অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু লইয়া যাওয়া হয়। বাহিনী চারেকারানে পৌঁছিলে সংবাদ আইসে যে, যুবরাজ কামরান আর একটী সংগ্রামের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং সম্রাটবাহিনী আমা খুয়াটাম উদ্দেশে অগ্রসর হয়। তথায় উপনীত হইলে সৈন্যগণকে সজ্জিত হইবার আদেশ করা হয়। সজ্জিত সৈন্য আউরত চালাক পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে সম্রাট অশ্বহইতে অবতরণ করিয়া স্নান ও উপাসনাকার্য্য এবং যাত্রা শুভ কি অশুভ, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত পরিচিত কয়েকটী কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, যাত্রা শুভ; গ্রহগণ তাঁহার অনুকূল। তৎপর তাঁহারা আফগানবস্তীতে

উপনীত হইলে শের আফগান (Shyr Afgun) বিদ্রোহী-দলের অগ্রবর্ত্তী বাহিনীসহ আসিয়া দেখা দেন। সম্রাটসৈন্যও প্রস্তুত ছিল। কাজেই তৎক্ষণাৎ উহারা যুবরাজ হিন্দলের বাহিনীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সংগ্রাম যখন তুমুলবেগে চলিতে থাকে, সম্রাট তখন দেখেন যে, নবীন যুবরাজ প্রায় নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্যার্থে তিনি স্বয়ং অগ্রসর হন। কিন্তু কারাজা খাঁ অনুনয় সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলেন যে, সম্রাট পার্শ্বে থাকুন, তিনি নিজে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতেছেন। এ প্রস্তাবে সম্রাট সম্মত হন। কারাজা বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিয়া শের আফগানের সহিত একক হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বিদ্রোহী উভয় পার্শ্বে তিনবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে আঘাতকারীর উপর পতিত হইতেই, অশ্ব হইতে পড়িয়া যায়। কারাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করত সম্রাটের নিকট লইয়া যান। হুমায়ুন কারাজার প্রতিই উহাকে কয়েদ করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। কিন্তু কারাজা বলেন যে, বন্দী একজন পলাতক আসামী,—ঘর বাড়ি শূন্য এবং রাজবিদ্রোহী, সুতরাং মৃত্যুআজ্ঞাই তাহার উপযুক্ত দণ্ড। তদনুসারে তাহার শিরশ্ছেদন করা হয়। অবশিষ্ট বিপক্ষদল পলায়ন করে। সম্রাট তৎপর যুবরাজ হিন্দলের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জানা যায় যে, যুবরাজ কামরান কাবুল হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন। সম্রাট তাঁহার পলায়নের পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত দুর্গের প্রত্যেক পার্শ্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা-দল স্থাপন করেন এবং সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত সহরে গুপ্তচর নিযুক্ত করেন। সম্রাট তৎপর কারাজা খাঁর শিবিরে গমন করেন, তথায় উভয়মধ্যে সখ্যভাবের বিনিময় হয়।

এই সময় যুবরাজ কামরান কারাজাকে লিখিয়া পাঠান,—"আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি সম্মত না হন বা আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন, তবে আপনার পুত্র সরদারবেগকে হত্যা করিব।" কারাজা সম্রাটকে এই বিষয় জ্ঞাত করান। সম্রাট তাহাতে বলেন,—"যদি তাই হয় তবে আমিই তোমার পুত্র।" কারাজা তদুত্তরে বলেন,—"সম্রাটের মস্তকের এক একটি কেশ আমার পুত্রের জীবনের তুল্য জ্ঞান করি।"

পর দিবস প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্রাট-সৈন্য দুর্গ ঘিরিয়া ফেলে। সম্রাট স্বয়ং ইগল মাউণ্টে (Eagl's mount) দাঁড়াইয়া দুর্গাভ্যন্তরের অবস্থা অবলোকন করিতে থাকেন। সম্রাট বড় বড় কামানগুলি দাগিতে আজ্ঞা

করেন; কিন্তু যুবরাজ কামরান গোলার মুখে যুবরাজ আকবরকে দণ্ডায়মান করায় সে আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন এবং সৈন্যগণকে দৃঢ়তার সহিত দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিতে উপদেশ দেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ভারতীয় পারস্য কবিগণ।

(মহাকবি আবুল ফয়েজ ফয়জী)।

শেখ আবুল ফয়েজ ফয়জী ভারতের একজন প্রধান কবি। তাঁহার পিতার নাম শেখ মোবারক ফাজেল। মহাকবি ফয়জী মোগল-কুল-তিলক মহামতি সম্রাট আকবরের প্রিয়তম বন্ধু ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল বিদ্যাতেই পরমপাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে সুদর্শন নামে পরিচয় দিয়া, কাশী ও দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নিকটে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতেও অগাধ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় মেধাবী পরমপণ্ডিত যে, কোন জাতিতেই ছিল না, একথা অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দুপণ্ডিতও স্বীকারকরিয়া গিয়াছেন। মহাকবি ফয়জী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্যগ্রন্থ ও শাস্ত্র এবং ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত, লীলাবতী এবং আরও বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ পার্শী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "কেচ্ছানলদেমন" নামক কাব্যখানি এক অতুলনীয় গ্রন্থ। পারস্যভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা ৩৪টী; তন্মধ্যে নোক্তাধারী ১৮টী এবং নোক্তাবিহীন ১৬টী। এই মহাকবি "এলমোল্ পাখ্‌লাক" ও পবিত্র কোরানশরিফের প্রকাণ্ড টীকা "ছোরতুল এল্‌হাম্" নামক গ্রন্থদ্বয় মাত্র নোক্তাবিহীন অক্ষর ও শব্দ দ্বারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই ভাবিয়া দেখুন, ফয়জী পারস্য ভাষায় কিরূপ অসীম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। "দেওয়ান ফয়জী" নামক গ্রন্থখানি ১৫০০০ পনর হাজার কবিতায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইঁহার রচিত ছোট বড় প্রায় ১৫০ দেড় শত গ্রন্থ আছে। এরূপ সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও তত্বে পরমজ্ঞানী ও বিচক্ষণ কবি যে পারস্য দেশেও জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। ফেরদৌসী, হাফেজ, সাদী, জামি, নেজামী, খস্রু, উরফী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণ হইতে ফয়জী কোন অংশেই নিষ্প্রভ নহেন। বরং ধরিতে গেলে.

অন্যান্য বিজাতীয়বিদ্যার জ্ঞানলাভ করায়, আমাদের ফয়জীই উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। পাদ্রী বায়লকো যখন সম্রাট আকবরের সভায় আগমন করেন, সেই সময় তথায় সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপের মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদী, পার্শী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মহা-মহা-পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন; তৎকালে মহাকবি আবুল ফয়েজ ফয়জী স্বীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে সকলকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে সম্রাট পরম সন্তোষলাভ করিয়া সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত একযোগে ফয়জীকে "মালেকুশ শোরা" (কবি-সম্রাট) উপাধি প্রদান করেন। বাস্তবিক ফয়জীর কবিতার মাধুর্য্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়; সকলকেই ভাবস্রোতের ভাব-লহরীতে হাবুডুবু খাইতে হয়। ১০০৪ হিজরীতে এই মহাকবি মানবলীলা সম্বরণ করেন। আগরা নগরীতে তাঁহার পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান আছে। এই মহাকবির বংশধরগণ আগরাতে আজিও বর্ত্তমান আছেন। এই বৎসর আমাদের ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে একটি বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

বিসর্জ্জন।

(১)

একদিন নব বসন্তের স্নিগ্ধ প্রদোষে হেম ও নলিনী রায়দের বাগানবাটীর স্বচ্ছ নীল সরসীবক্ষে যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, নলিনীর চিত্তপটে তাহা তেমনভাবে প্রতিভাসিত হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও হেমের ক্ষুদ্রহৃদয় হইতে সে বিদ্যুৎপ্রভা বিদূরিত হইল না। হেম সে হৃদয় লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথম-প্রথম হেম সেই হৈমপ্রতিমার উজ্জ্বল তাড়িতালোক হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেও প্রস্তুত হইলেন না, শেষে যখন সাজ্ঘাতিকরূপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন, তখন চেষ্টা করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। স্মৃতির তীব্রদংশন অসহ্য দেখিয়া হেম অকুলসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার তখনকার ঈষৎ ক্ষীণ-দূরদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, সে সাগরে তাহার অনুকূল অবলম্বন অতি ক্ষুদ্র— তুচ্ছ কীটশক্তির ন্যায় নগণ্য। তথাপি হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়াই চলিলেন। তাহার সেই ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে এক ঘোর ভ্রমসাচ্ছন্ন যবনিকা সংপ্রসারিত হইয়া পড়িল। হেম ঘোর মোহে অন্ধ হইয়া পড়িলেন।

(২)

হেম ও নলিনী একবৃন্তে দুটি প্রস্ফুটিত কুসুম। একভাব, একপ্রাণ। কিন্তু আজ প্রকৃতি তাহার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে। সময়বিশেষে প্রকৃতি এইরূপ মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রকৃতির ইহা একটি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। তাই এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির এ লীলাবিপর্য্যয় লক্ষিত হইল। যে মুহূর্ত্তে সরসীর স্বচ্ছ নীল জল তরঙ্গায়িত করিয়া সরযূর উজ্জ্বল চক্ষুদু'টি সুদূর তটস্থিত হেম ও নলিনীর বিশাল বক্ষযুগল আলোড়িত করিয়াছিল, সে মুহূর্ত্তে যে দুইজন অবনত মস্তকে গৃহে ফিরিয়াছেন, তারপর হইতে আজ অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে,—নলিনী যথাস্থানে আসিয়া পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছেন; হেম পারিলেন না।

নলিনী সেইদিনই সেই নীল জলের রাঙা মুখটী ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন; কাজেই হেমের চিত্তচাঞ্চল্যের গুরুতর কারণ কিছু আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। দুই একদিন হেমের নিকটও তাহা জানিতে গিয়া কোন উত্তর না পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। হেম কয়েকটা শারীরিক অসুখের নাম করিয়া নলিনীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, "ও কিছু নয়"।

কয়েকদিন পরে হেম স্থিরভাবে দেখা দিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের সে দুর্দ্দমনীয় আশঙ্কা ভস্মে ঢাকা অনলের ন্যায় তাহাকে ধিকিধিকি পোড়াইতে লাগিল।

(৩)

সরযূ বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে। একি স্বপ্ন? এমন সৌসাদৃশ্য যুগলমূর্ত্তি কি কখন হয়? ঠিক একই চেহারা, একই চলনি, একই রং, একই রকমের চাহনি। একই বেশ, একই ভূষা। একি স্বপ্ন না ভৌতিক মায়া? সহসা সরযূর মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। এ হয়ত একটিরই প্রতিছায়া, বাস্তবিক মূর্ত্তি এক। আমার হৃদয়ের অকস্মাৎ উদ্বেগে চক্ষে হঠাৎ ধাঁধা দেখিয়াছি। হঠাৎ চাহনিতে এরূপ অনেক স্থলে একটা বস্তুকে দুইটা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটা আলো সময়ে সময়ে দুইটা বলিয়াও তো দেখা যায়, কিন্তু স্থির নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে একটী বলিয়াই ঠিক হয়। এ যুক্তি বালিকা-হৃদয় সহজে উড়াইতে পারিল না। সরযূ এক মূর্ত্তিই হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল। সরযূ কাহার মূর্ত্তি লইয়া সুখের বাসর বাঁধিতে উদ্যত, তাহার পরিচয় সরযূ নিজেই অপরিজ্ঞাত। কিন্তু সরযূর ক্ষুদ্র প্রেমনিকেতনের যে আলেখ্য কল্পনার আশ্রয়ে লাভ

করা গিয়াছে; তাহা হেম ও নলিনী উভয়ের প্রতিকৃতির অনুরূপ; তাই সরযুর বাহ্যিক কে, সে বর্ণনার কল্পনা সঙ্কুচিত।

সরযু এখন প্রতিদিন বৈকালে বাগানের ঘাটে যাইয়া গা ধোয়, আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া কৌমুদীপ্রদীপ্ত উৎসুক চাহনিতে চারিদিক উজ্জ্বলিত করিয়া চঞ্চলচিত্তে তীরের দিকে চাহিয়া থাকে। মাথার উপর দিয়া কত কাক উড়িয়া যায়, ডাহিনে বামে কত লোক চলিয়া যায়, কিন্তু সে ত আর যায় না। তেমন শুভ্র বসন পরিধানে নীলজল প্রতিফলিত করিয়া অনিমেষ চাহনিতে সরযুর মন আন্দোলিত করিয়া ত কেহ যায় না। সরযুর হৃদয়ে চিন্তার দাবানল জ্বলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

শেখ নেজামুদ্দিন আওলিয়া।

(জরী জর্ বখ্স্।)

তাপসপ্রবর নেজামুদ্দিন আওলিয়া আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থেই তাঁহার মন নিবিষ্ট থাকিত; বিশেষতঃ "ফসুসল হেকাম", "মাওয়াকে য়োমজুম" ও উহার ব্যাখ্যা-গ্রন্থসকল তিনি অধিকাংশ সময় পাঠ করিতেন। এমাম আবু হানিফার "ফেকা," (ধর্ম্ম-বিধি) "তফসির" (কোরান শরিফের ব্যাখ্যা), এবং হাদিসাদিতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

তাঁহার পিতা আহমাদ দানিয়াল পয়গম্বের পুত্র ছিলেন। তিনি গজনী হইতে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া বদাউন নগরে বসতি স্থাপন করেন। তথায় ৬৩৪ হিজরীর "শফর" মাসে শেখ নেজামুদ্দিন আওলিয়ার জন্ম হয়। তাঁহার পাঁচ বৎসরের বয়ক্রম কালে তদীয় পিতা পরলোক গমন করেন। সুতরাং একমাত্র ভক্তির আধার জননী কর্ত্তৃক তিনি লালিতপালিত ও যথাসময়ে বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হন। বদাউন নগরে তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন না থাকায় পঁচিশ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি স্বীয় জননীকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী গমন করেন এবং

তথায় হেলাল তস্ত ও যারের মসজিদের পার্শ্বে এক পর্ণ-কুটীরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। দিল্লীনগরে খাজা সমসুদ্দিন নামক জনৈক সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া সম্রাট গেয়াসুদ্দিন বোলবন তাঁহাকে সমসোল মালেক উপাধিভূষণে ভূষিত করত স্বকীয় উজিরীপদ প্রদান করেন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে, যখন তিনি একমাত্র অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন, নেজামুদ্দিন তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণ করেন। এসময় তাঁহার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে মোল্লা কুতুবুদ্দিন, মোল্লা বোরহানুদ্দিন, ও শেখ নেজামুদ্দিন এই তিন জন উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিলনা। ইহাদিগকে তিনি এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠেই শিক্ষা দিতেন। ইহাদের মধ্যে নেজামুদ্দিনকে নানা শুভলক্ষণযুক্ত দেখিয়া ইহাকেই তিনি অধিকতর যত্ন ও সম্মান করিতেন। ঘটনাক্রমে মহর্ষি ফরিদুদ্দিনের ভ্রাতা শেখ নজিবুদ্দিন মোতওয়াকেলের সহিত সেখ নেজামুদ্দিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব হয়। এই সময়ে তাঁহার স্নেহময়ী জননী মানব-লীলা সংবরণ করায় নেজামুদ্দিন প্রায় সর্ব্বদাই নজিবুদ্দিনের সঙ্গে থাকিতেন। ইহাতে তাঁহাদের বন্ধুত্বসূত্র দৃঢ়তর হয়। তদনন্তর শেখ নেজামুদ্দিন খাজা সমসুদ্দিন খারজমীর নিকট আরও কয়েকবৎসর বিদ্যাধ্যয়ন করত বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করেন। ঐ সময়ে একদিবস তিনি প্রসঙ্গক্রমে নজিবুদ্দিন মোতওয়াকেলকে বলেন যে, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন কাজীর পদে নিযুক্ত হই ও ন্যায়বিচার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট রাখি"। ইহা শুনিয়া শেখ নজিবুদ্দিন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। নজিবুদ্দিন তাঁহার কথা শুনেনমাই ভাবিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে পুনর্ব্বার তাঁহাকে ঐ কথা বলিলেন। এবার মোতওয়াকেবল, বলিলেন "ঈশ্বর না করুন যেন তুমি কাজী হও"! একদা প্রাতঃকালে জামে মসজিদে আজান দিবার সময় শেখ নজিবুদ্দিন এই কয়টী কথা উচ্চারণ করেন, "হে বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিতে শৈথিল্য করিও না"। নেজামুদ্দিন মসজিতে ছিলেন, কথা কয়টী কর্ণগোচর হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে এক অভাবনীয় ভাবের সঞ্চার হইল।

ক্রমশঃ—

আলাউদ্দিন আহ্‌মদ্।

পরলোক।

ধীরে, ধীরে হে প্রাণসম্পদ!
নীরবে নিঃশব্দে আসি' অতর্কিতে করি' প্রসারণ
তোমার বিদ্যুদ্বাহু, কর, কর আমারে হরণ।
কখন্ এ মহাজরা সপ্নসম আঁখির পলকে
ঘুরে' আসি' কালচক্রে উতরিবে কোন্ মহালোকে।
ওগো, ওগো, হে দয়িত, সেই মোর পুনর্জ্জন্ম হ'বে;
হে বাঞ্ছিত, এস, এস, জরাগ্রস্ত জর্জ্জরিত ভবে।

এ আত্মা আকুল যবে, জরাভারে পীড়িত পরম,
তুমি শুধু প্রাণারাম, হে সুহৃদ, হে মোর মরণ!
প্রদোষ-তিমির মাঝে পুরাতনে তুমি কর লয়,
প্রভাতকিরণ মাখি' তাই ভবে নবসূর্য্যোদয়।
হে মরণ, হে ঈপ্সিত! হে আরাধ্য মহা প্রাণারাম!
বিশ্ব-আঁখি-অগোচরে এই মৃত্যু মোরে কর দান।

ধাও, ধাও হে প্রাণসম্পদ!
আড়ম্বরে যদি চাহ প্রলয়েরে করিয়া বিকাশ
মহা ঘোর ঘটা করি' বিশ্বসৃষ্টি করিতে বিনাশ,
কর, কর, তাই কর,—এ মুহূর্ত্তে করহ সংহার
মহা ঝঞ্ঝাঘাতে দলি,' নিপীড়িয়া নিখিল সংসার।
যত কোটি রূপে লহ, লহ মূর্ত্তি সুকরাল সাজ
মূর্ত্তিমান্ অত্যাচার, প্রেত, রক্ষ, দানব, পিশাচ।
প্রদাহদহনে করি' মৃত্যুকালে বেদনা সঞ্চার
এ জড়ত্ব মোহে তুমি এ মুহূর্ত্তে করহ সংহার।

জ্বাল, জ্বাল, কি ভয়াল আছে তব প্রচণ্ড দহন,
এই দিনু শির পাতি' দহ, দহ হে মোর মরণ!
তা'রপর? তারপর দিব্যদ্যুতি-পূতস্পর্শ লভি'
কি জাগিবে?—হে ঈপ্সিত, এঁকেছ কি সে শোভন ছবি?
সন্ত তোমা আলিঙ্গিয়া ডুবে যাব, উঠিব যেদিন—
সে কি মোর জাগরণ।—কিসে মোর জীবন নবীন!
মম জাগরণ সাথে সেই প্রাতে উদিবে যে জ্যোতিঃ
তা'রমাঝে মহাকাল, হ'তে হ'বে তোমা কেন্দ্রপতি।
শোনিতের প্রতিদান কি সম্মানে পাইবে বিদায়
তব ন্যায়দণ্ডতলে সে বিচার হইবে তথায়।
সে দিন সমস্ত বিশ্ব ব্যগ্রে চাহি' দেখিবে বিধান—
রক্তসিক্ত অত্যাচারে রক্ত হতে নাহি পরিত্রাণ!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

'কৈফিয়তে" বক্তব্য।

বিগত ভাদ্র মাসের "কোহিনুরে" বাবু কেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল, মহাশয়ের "কৈফিয়ত" পাঠ করিয়া নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ, এই প্রবন্ধ যদি "কোহিনুরে"র ন্যায় সদুদ্দেশ্য মূলক পত্রে প্রকাশিত এবং কেশব বাবুর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত না হইত, তাহা হইলেও আমাদের ততটা মনোবেদনার কারণ ছিল না। দেশের এ দুর্দ্দিনে গুপ্ত মহাশয়ের এ বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত প্রবন্ধ গুপ্ত থাকাই ছিল ভাল। তদীয় "ধর্ম্ম-দ্বেষিতা" প্রবন্ধে লেখক-প্রবর মুসলমান হৃদয়ে যেরূপই আঘাত দিয়া থাকুন, কিন্তু "কোহিনুরে"র কৈফিয়তে তাহা হইতে শত সহস্রগুণ অধিক আঘাত দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অকর্ম্মণ্য ও ব্যর্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে বীরহৃদয় তাহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু সমর বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী না হইয়া

যুদ্ধ ক্ষেত্রে দর্শন না দেওয়াই নিক্ষেপকারীর কর্ত্তব্য। কেশব বাবু "কৈফিয়ত" দিতে যাইয়া সত্য মিথ্যা কতকগুলি অযৌতিক ও অপ্রামাণিক ভিত্তিহীন কথার উল্লেখ দ্বারা গরল উদ্গীরণ করিয়াছেন মাত্র। যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম স্বীয় উদারতা গুণে আজ বিশ্ববিজয়ী ও পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই ইস্‌লামের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ পবিত্র কোরান সরীফেই এইরূপ উপদেশ বর্ত্তমান আছে, "তোমরা ধর্ম্ম গ্রহণে কাহারও উপর বল প্রয়োগ করিও না।" পূর্ব্বসমালোচক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"মুসলমানেরা আত্ম রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল; কাহারও ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য নহে।" পবিত্র সাম্যবাদী কোরানও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, যথাঃ—"যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর; কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিয়া সীমা লঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় খোদাতালা সীমা লঙ্ঘনকারীকে প্রেম করেন না।" (২য় সুরা—১৮৬ আঃ।) দুর্ব্বল, শিশু ও রমণীগণের রক্ষার্থে কোরান বলেন, যথাঃ—"তোমাদের কি হইয়াছে যে, দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষদের জন্য যুদ্ধ করিবেনা? যাহারা খোদাতালার পথে বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! যেস্থানের অধিবাসী অত্যাচারী, সেস্থান হইতে আমাদের জন্য কর্ম্মসম্পাদক ও সহায়তাকারী নিযুক্ত কর" (৪র্থ সুরা—৭৭ আঃ।) কোরান আরও বলেনঃ—"(মহাসমরের সময়েও) যদি প্রতিমাবাদীদিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে খোদাতালার বাক্য যে পর্য্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে আশ্রয় দাও। তৎপরে আশ্রয় ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর।" (৯ম সুরা—৬ আঃ।) বাস্তবিক ইস্‌লাম ও কোরান সরীফই পৃথিবীতে শান্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

প্রোক্ত কোরানের শ্লোক (আয়েত) গুলি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কোরান কখনও আসুরিক বল-প্রয়োগে ধর্ম্ম বিস্তার করিতে আদেশ প্রদান করেন না; বরং প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তার করিতেই আদেশ প্রদান করেন; যথাঃ—"প্রেরিত পুরুষের জন্য প্রচার বই নহে।" (৫ম সুরা—৯৯ আঃ।) এমত অবস্থায়ও যাঁহারা বলেন, তরবারী সাহায্যেই ইস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা কতদূর সত্য ও গ্রহণীয়, তাহা সহজেই বোধগম্য। হজরতের জীবনী প্রণেতা ডাক্তার স্প্রেনজার বলেন;—"হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দয়াময়

খোদাতালার নাম স্মরণ করিয়া উৎপীড়ন, অত্যাচার নিবারণ ও নির্ম্মূল করিবার জন্য শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধের আইন ঘোষণা করেন।” তদীয় গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন,—“হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোরানের শিক্ষানুযায়ী কখনও অগ্রে আক্রমণ করেন নাই। তিনি উৎপীড়নের প্রাবল্য দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র।”

ইতিহাসেও দেখিতে পাই, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং প্রচার কার্য্য দ্বারা তাঁহার সময়ে ইস্‌লাম বিস্তার করিয়াছিলেন। ১। তিনি যে সকল যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাহা আত্ম রক্ষার্থই। ২। ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া মুসলমান বণিকেরাই জগতে ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কেমন শান্ত-ভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে! আরনল্ড সাহেব স্বীয় গ্রন্থে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। চীনে মুসলমানেরা কখনও দিগ্বিজয়ী রূপে প্রবেশ না করিলেও তথাকার এক চতুর্থাংশ লোক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। সুমাত্রা, যাবা, বোর্ণিও এবং মধ্য আফ্রিকার আরবীয় বণিক সম্প্রদায়ের যত্নেই জগতে ইস্‌লামের এতদূর বিস্তৃতিলাভ ঘটিয়াছে।

কোরেশগণ যখন হজরতের ধর্ম্ম প্রচারে বিঘ্ন উৎপাদন ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে, তখন ১৬ জন মক্কাবাসী মুসলমান আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করে। কিছুদিন পরে আরও ১০০ এক শত মুসলমান তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের দ্বারাই তৎপ্রদেশে ইসলাম ধর্ম্ম অতি শান্তভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

নবম ও দশম হিজরীতে যখন মাহরাইমেন, হাজারমায়েৎ, ওমান এবং বাহরায়েন প্রভৃতি প্রদেশ এবং সিরিয়া ও পারস্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে ইস্‌লাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন এবং ওমান, মাহরা, জামানা, বাহরায়েন ও ইমেনের কতিপয় খৃষ্টোপাসক, জড়োপাসক, রাজপুত্র এবং দলপতি পত্র ও দূত প্রেরণ দ্বারা হজরতের নিকট স্ব স্ব ইস্‌লাম গ্রহণের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন কে তরবারী ধারণ করিয়াছিল ও কে “উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্য শ্যামল অঙ্গ লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল” গুপ্ত মহাশয় তাহা বলিয়া দিবেন কি?

আকাবা বন্দরে যখন পৌত্তলিকগণ হজরতের নিকট ইস্‌লামে দীক্ষিত হয়,

মদিনার অন্তঃপাতী 'কেরাত্তল আমিনে' দলপতি বস্থিরার সহিত যখন ৭০০ লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কি কেহ জোর জবরদস্তি করিয়াছিল?

অত্যাচার উৎপীড়নের শেষে মক্কানগরী যখন মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখনও আরবের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক সমূহ দলে দলে আসিয়া কিম্বা দূত প্রেরণ করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল তাহারা নহে, মক্কার অধিবাসিবৃন্দও হজরতের কাছে স্বেচ্ছায় ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়াছিল।

আমরা বলিব এবং জগৎ বলিবে মুসলমানেরা ধর্ম্ম প্রচারে কখনও দুর্নীতি, নিষ্ঠুরতা এবং অনুদারতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। আমাদের এই উক্তিতে যাঁহারা সন্দিহান হইবেন, তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া দেখুন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৎসর বৎসর কত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে কেহ একটি কাণা কড়িও দান করিতেছে না, তথাপি কত লোক খৃষ্ট ভজিতেছে, আর কত লোক ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিতেছে!

বিখ্যাত আফ্রিকা ভ্রমণকারী মিঃ জোসেফ টমসন্ বলেন:—"মধ্য ও পশ্চিম সুদানে শান্তিপূর্ণ ও নিরহঙ্কার কার্য্যকারকগণ কর্ত্তৃক ইস্‌লাম সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভ্রমণকারী রাখালগণ দ্বারা এবং বর্ত্তমান কালে অসীমসাহসী দৃঢ়বিশ্বাসী নিউপ ও হসল বণিক সম্প্রদায় দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময় হইতে পশুপালকগণ চাঁদ হ্রদ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ইস্‌লাম বিস্তারে নিয়োজিত ছিল; তজ্জন্যই বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে তথাকার সমস্ত ভূভাগ, মধুক্রমের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐস্‌লামিক সমাজে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা কেবল মাত্র এক জন তত্ত্বাবধায়কের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি আসিয়া পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া কেবল খোদাতালার একত্ব প্রচার করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ কালেও তাহাদের মধ্যে 'কোদিও' নামক দলপতি আবির্ভূত হইয়াছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমান ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বন্যজাতিদিগকে নববলে বলীয়ান করিয়া আশ্চর্য্য সুফল প্রসব করিয়াছিল।" হজরতের জীবিতাবস্থায় কতকগুলি আরবীয় বণিক বাণিজ্যার্থে চীন দেশে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন। এই বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ওহাব আবু কাবশা নামক একজন বণিক ৬ষ্ঠ হিজরীতে (৬২৮ খৃঃ) বাণিজ্যার্থে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ক্যাণ্টনে

অবতীর্ণ হইলে সাধারণ জনগণ ও রাজপ্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও প্রচারে চীনে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়।

প্রাচীন কাল হইতে মালদ্বীপে প্রতিমোপাসনা প্রচলিত ছিল। আবুল বারাকাত নামক একটি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান কর্ত্তৃক তথায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ও সাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হয়।

আরব সাগরের তীরে মালাবার উপকূলে হিজরী দ্বিশত বৎসরের পর সামেরী বা চেরামন পেরুমল——নামক রাজার রাজত্বকালে একজন আরব অথবা আজম দেশীয় মুসলমান অর্ণব যানে—আসিতে ছিলেন। বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁহারা মালাবারে আসিয়া উপনীত হইলে তথাকার রাজা তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করেন ও হজরতের পবিত্র জীবনীর অলৌকিক বর্ণনা শুনিয়া সাদরে ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। এই প্রকারে অল্পদিনের মধ্যে সেখানে ইস্‌লাম বিস্তৃতি লাভ করে। নর শোণিতে ধরিত্রীবক্ষ একটুও রঞ্জিত হয় নাই।

কাশ্মীরেও শুধু প্রচার দ্বারা ইস্‌লাম জয়যুক্ত হয়। যাহা হউক, উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, পাঠকগণ তাহা দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, ইস্‌লাম কেমন করিয়া জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনন্ত সত্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই জগৎ এই সনাতন ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। নতুবা আজ আরব, পারস্য, তুরস্ক, তাতার, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, মিশর, কাফ্রিস্থান, সোয়াট, আফ্রিকার নানা প্রদেশ, ইউরোপের মুরজাতিদের দেশ, স্পেনের অংশ বিশেষ, জাঞ্জিবার, মালদ্বীপ, আফ্রিদীস্থান, চীনের অংশ বিশেষ ও ভারতের প্রান্তদেশ সমূহে কোটি কোটি মুসলমান দেখিতে পাইতাম না। কেহ কেহ বলেন, সবক্তগীন আলেপ্তগীনের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে একটিও মুসলমান ছিল না। এখন ভারতে ১৫ কোটি মুসলমানের বাস। বোম্বাই প্রদেশে বোরা নামক মুসলমান জাতির সংখ্যা এখন ২ লক্ষ। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা আগরওয়ালা বেনে ছিল।

তিব্বতেও এখন তিন সহস্র মুসলমানের বাস। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লিবারপুলে একটির অধিক মুসলমান ছিল না। এখন সেখানে দুই শতাধিক মুসলমানের বাস। তাহাদের অনেকেই তৎপ্রদেশেরই অধিবাসী।

ভারতের প্রান্তদেশে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্ব্বর জাতির বাস ছিল। ইহাদের মধ্যে আফ্রিদীই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সুশ্রী জাতি। ইহারা হিন্দুছিল বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক

ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল তথায় একটিও হিন্দু বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নাই।

আরও বহুল প্রমাণ বিদ্যমান আছে,—আরও শত শত ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোন বিশেষ সম্প্রদায় ও লোকের প্রতি ধর্ম্মযাজকতার ভার না দিয়া এই গুরুতর বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাই যে কোন মুসলমান যখন যেথানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই থানেই প্রচার দ্বারা অতি শান্ত ভাবে ইস্‌লাম বিস্তারে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। উদ্দীপ্তপ্রাণ সত্যবিশ্বাসী আরবীয় বণিকগণ দ্বারাই প্রধানতঃ জগতে ইস্‌লামের বিস্তার হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে।

কেশব বাবু এহেন উদার ও নির্ম্মল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি "শস্য শ্যামল ধরিত্রীবক্ষ নর শোণিতে রঞ্জিত করিয়াছে" বলিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। ইহাতে গুপ্ত মহাশয় নিশ্চয়ই অপরাধী। তাঁহার স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ভ্রাতা সুযোগ্য সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার কৃত "মোহাম্মদ চরিত" পুস্তকের 'ধর্ম্মবৃক্ষে মধুর ফল' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখুন:—'লোকে বলে, তরবারী বলে মুসলমান ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন মোহাম্মদ ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া খোদেজার নিকট মনের মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন কোরেশদিগের অত্যাচারের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় মুসলমানের বিশ্বাস ও বীর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন মদিনার লোক গভীর নিশীথে তাঁহার নিকট অমোঘ প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হইয়াছিল, তখনই বা তরবারি কোথায় ছিল? বিশ্বাসবলে মুসলমান ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে। বিশ্বাসবলে মুসলমানগণ বলীয়ান হইয়াছে,—অনন্ত শত্রুসাগরে সন্তরণ দিয়াছে। বিশ্বাসবলেই মুষ্টিমেয় মুসলমান শত্রুসাগর পার হইয়া আপনাদিগের বিজয় নিশান স্বদেশে উড্ডীন করিয়াছে।"

কেশব বাবুর আরও একজন স্বজাতীয় ভ্রাতা বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু তদ্রচিত "নানক-প্রকাশ" ১ম ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

"স্বর্গীয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ মহাবল ও মহাপরাক্রান্ত মহাপুরুষ শ্রীমোহাম্মদ ঈশ্বরবানীতে পূর্ণ হইয়া ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে আরব রাজ্যকে কম্পিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যু-সদৃশ আরব জাতিকে জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মরত্নে ভূষিত 'এক মেবাদ্বিতীয়ং' পরমেশ্বরের নামে দীক্ষিত করেন। সঙ্কীর্ণহৃদয় সাম্প্রদায়িক রূপ অন্ধকারে

আচ্ছন্ন জীবগণ আব্দুল্লাতনয় ও তৎ প্রদর্শিত ধর্ম্মকে অকারণ যেরূপ ঘৃণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী সে কলঙ্ক বিস্মৃত হইবে না। * * * ইস্‌লাম ধর্ম্ম মানবকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের ভার লইয়া যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, নিতান্ত বিকৃতস্বভাব না হইলে কেহ একথা অস্বীকার করিতে পারে না। ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী। যথন ঘোর তামসী-নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক তথা হইতে একেবারে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, যথন অন্য সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক সমগ্র খৃষ্টসমাজও কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও মহাপাপের আলয় হইয়াছিল, তখন পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা, সূর্য্যপূজার মূলচ্ছেদ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রায় সমস্ত আফ্রিকা খণ্ড, আরব, তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফগানিস্থান ও স্পেনরাজ্যে পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য স্থাপন করে। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান এখন ইউরোপের এত শিরোভূষণ ও গৌরব স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কেবল ইস্‌লাম-ধর্ম্মেরই প্রসাদে যে তথায় পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্মের পরম শত্রু ও নিতান্ত বিকৃতহৃদয় ব্যক্তিরাও একথা অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না। ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে ধাত্রীর ন্যায় ইহা বিপথগামী ইউরোপকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া ছিল। জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন জন্য বিধাতার হস্তের ইহা যে কত মহোপযোগী যন্ত্র, এখন আমরা তাহা সমগ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।"

এখনও কি গুপ্ত মহাশয় বলিবেন, "মহাম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্ম্মে কাফের দিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য উষ্ণ নর শোণিতে ধরিত্রীর শস্য শ্যামল অঙ্গ লোহিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল ?"

ক্রমশঃ।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ

তন্নিবারণের উপায়।

একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি
পার হ'য়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন ?

কবি উল্লিখিতরূপে করুণস্বরে গাহিয়াছেন যে, যতদিন হিন্দু রাজগণ একতা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া ভারতবর্ষে পরমসুখে কালযাপন করিতেছিলেন, ততদিন যবন অর্থাৎ মুসলমানগণের ভারতবর্ষে আগমন করিবার কোন সুযোগ বা সুবিধা ছিল না ; কিন্তু যখনই হিন্দুরাজগণের একতাসূত্র ছিন্ন হইল,—যেই দিন হইতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষবীজ রোপিত হইল, সেই দিন হইতেই সিন্ধুনদী পার হইয়া মুসলমানগণ এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমনই হিন্দুগণের অসহ্য বোধ হইয়াছিল ; ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমনকেই তাহারা বিদ্বেষ-নয়নে ও রোষকষায়িত লোচনে নিরীক্ষণ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে আর্য্যগণের উপনিবেশ মাত্র। প্রাচীনকালে ভারত-বর্ষ আদিম অধিবাসীদিগেরই বাসস্থান ছিল। তখন আর্য্যগণ আপনাদের আবাসভূমি ও লীলাস্থল ঈরাণ প্রদেশে অধিবাস করিতেন। অনন্তর বংশ বৃদ্ধি ও জন সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে তাঁহারা তৎপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বমুখে গমন করিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া অত্রত্য আদিম অধিবাসিগণকে পরাস্ত করত এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে আর্য্যগণ এদেশে আপনাদের বাসস্থান নির্ণয় করত ইহাকে আর্য্যাবর্ত্ত নাম প্রদান করিলেন। পরে ভরত রাজার নামানুসারে ইহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপে দেখ-

যাইতেছে যে, সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান না হইলেও কালক্রমে ইহা তাঁহাদের মাতৃভুমি স্বরূপে পরিগণিত হইয়া উঠে। তাঁহারা ভারতবর্ষকে আপনাদের স্বদেশ জ্ঞান করিলেন এবং পরস্পরে একতা ও প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। অবশ্য মধ্যে মধ্যে রাজ্যলোভে অথবা কারণ বিশেষে যে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ বিগ্রহ হইত না তাহা নহে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে জাতিগত বা ধর্ম্মগত বিদ্বেষ একরূপ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যগণ আপনাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ জনিত চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এইরূপ বন্দোবস্তে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকিলেও তদ্ধেতু পরস্পরের মধ্যে বিশেষরূপ হিংসা, বিদ্বেষ বা বিরোধ ছিলনা। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে অবশ্য কোন জাতিভেদ ছিল না এবং বর্ণের বিভিন্নতাও ছিল না। চারিবর্ণের সৃষ্টি কেবল ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংস্থাপন নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক ফলকথা এই যে, ভারতবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে জাতি বা ধর্ম্মগত কোন বিরোধের কারণ ছিল না।

আর্য্যগণের প্রথম আগমনের সময় এদেশের আদিম অধিবাসিগণ যে তাঁহাদিগকে অনধিকার প্রবেশকারী (Intruder) বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য্যগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় পরাজিত হইয়া তাহারা আর্য্যগণের ভারত প্রবেশে বাধা জন্মাইতে পারে নাই। সুতরাং কেহ বা আর্য্যগণের দাসত্ব স্বীকার করিল এবং কেহ বা তাঁহাদের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বা পর্ব্বতময় প্রদেশে প্রস্থান করিল। এইরূপে ভারত-বর্ষে আর্য্যগণ বিনা উপদ্রবে বসবাস করিতে লাগিলেন। একদেশে অন্যদেশ-বাসী প্রবেশ করিলে প্রথমোক্ত দেশবাসী অন্য দেশবাসীকে স্বভাবতঃই হিংসা ও বিদ্বেষনয়নে দর্শন করিয়া থাকে। জাপান জাতি সম্বন্ধেও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা বলেন,—'যে সকল জাতি অন্য জাতির সহিত অসংস্পৃষ্ট ভাবে একান্তে জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারা বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, জাপানও তেমনি করিয়াছে অর্থাৎ বিদেশীয় অপ্রার্থিত আগমনে সাগ্রহে বাধা দিয়াছে। বিদেশীয়দিগকে জাপানে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই জাপানীদের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। তাহারা বিদেশীদের সহিত

যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে বা তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। তাহাতে অনেকগুলি বিদেশীয় লোক হত ও আহত হয় এবং দেশময় উপদ্রব ও অশান্তি উপস্থিত হয়"*। ইত্যাদি।

ইহার পরে ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন এবং ভারতবাসী ও মুসলমানগণের সংঘর্ষণ। একেশ্বরবাদী মুসলমানগণ ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া ও প্রভূত মানসিক বলে শক্তিমান হইয়া তেজোদৃপ্ত কলেবরে ইস্লামের বিজয় কেতন দূর দূরান্তরে উড্ডীন করিতেছিলেন। ভগবৎ-প্রসাদে তাঁহারা যেই দিকে গমন করিয়াছেন, সেই দিকেই ইস্লামের বিজয় ডঙ্কা দিগ্‌দেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা একেশ্বরবাদী ছিলেন ; সুতরাং পৌত্তলিক বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা স্বভাবতঃই ঘৃণার চক্ষে সন্দর্শন করিতেন। যাহারা ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী নহে, অথবা যাহারা পৌত্তলিক, তাহারা তাঁহাদের নিকট বিধর্ম্মী কাফের ও নিরয়গামী বলিয়া বিবেচিত হইত। এই হেতু তাঁহারা ভারতবাসিগণকে পৌত্তলিক জানিয়া সেইরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সেই অবজ্ঞা বশেই তাঁহারা তাহাদিগকে হিন্দ অর্থাৎ গোলাম, দাস প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান অর্থাৎ গোলামের দেশ বলিয়া নাম প্রদান করেন। অন্যপক্ষে আর্য্যগণ অন্যান্য জাতিগণকে ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করতঃ তাহাদিগকে নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ জ্ঞান করিতেন এবং সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্য বা হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরে সংঘর্ষণ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পরিপোষণ করিতেছিলেন। অনন্তর যখন মুসলমানগণ এদেশে আগমন করিতে লাগিলেন, তখন আর্য্যগণ অর্থাৎ হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে Intruder বা অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু ও মুসলমানে ধর্ম্মগত পার্থক্যই তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের অন্যতম কারণ। অবশ্য পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এজন্য শুদ্ধ হিন্দু বা শুদ্ধ মুসলমান অপরাধী নহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুগণের সহিত আরবদিগের সংস্রব রহিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়-নিপুণ আরবগণ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে নানাদেশে যাতায়াত করিত এবং নানা স্থানের পণ্যদ্রব্য অপরাপর দেশে আদান প্রদান বা ক্রয় বিক্রয় করিত। ভারতবর্ষের

* প্রবাসী ৫ম ভাগ ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বোম্বাই, সুরাট, কালিকট প্রভৃতি পশ্চিমোপকূলস্থিত বন্দর গুলিতেই প্রধানতঃ আরবগণ আপনাপন পণ্যতরী আনয়ন করত ভারতবাসীদের সহিত বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিত। আবার ভারতবর্ষীয় বণিকগণও আপন দেশজাত পণ্য সম্ভার পারস্য ও আরবদেশের বন্দর সমূহে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। এইরূপে হিন্দুগণের সহিত আরব ও পারস্য দেশবাসিগণের বহুদিন হইতে বাণিজ্য ও কারবার উপলক্ষে সংস্রব চলিয়া আসিতেছিল। তৎকালে আরবীয়-গণের সহিত বা পারসীকদের সহিত ভারতবাসীর ততটা বিরোধ বা মনো-মালিন্য সংঘটিত হইত না। কারণ এই যে, তখন তাহারা কেবল বাণিজ্য ব্যাপার উদ্দেশেই ভারতবর্ষে আগমন করিত। তাহারা আপনাপন পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের বন্দর সমূহে বিক্রয় করিত এবং এখানে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইত, তৎসমুদায় ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তখন তাহারা এদেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে নাই অথবা এদেশে অবস্থিতি করিবার বাসনাও তাহাদের মনে ছিলনা। অন্যপক্ষে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদানে ভারতবাসীদের লাভ বই লোক-সান হইবার কোন কথা ছিলনা। তখন প্রকৃত পক্ষে আরবীয় ও পারসীকদের সহিত ভারতবাসীদের হাটে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার মতই সম্বন্ধ ছিল, কেহ কাহারও ধর্ম্ম বা বিশ্বাসের উপর বা ধন রত্নাদির উপর হস্তক্ষেপ করিত না।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৭১১-১২ খৃষ্টাব্দে মহামান্য খলিফা অলিদের সময় ভারতবর্ষের সুরাট বন্দরে কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর পণ্য-দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হওয়ায় এবং দেশীয় নৃপতি তাহার কোন প্রতিকার না করায় কতিপয় সৈন্য সামন্ত সহ কাশেমকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। কাশেম ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন এবং আলোরের নৃপতি ও রাজপুত সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সুতরাং ইহাই হিন্দু-মুসমানের মধ্যে বিরোধের সর্ব্ব প্রথম সূত্রপাত বলিয়া মনে হয়। সিন্ধুরাজ কন্যার প্রবঞ্চনা ও বিদ্বেষজনিত অলীক উক্তি হেতু বীরকেশরী কাশেমের অকাল মৃত্যু না ঘটিলে মুসলমানগণ সেই অবধি সিন্ধু প্রদেশে চিরস্থায়ী রূপে বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাহা হয় নাই।

অনন্তর ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে সবক্তিগিণ কান্দাহার প্রদেশ জয় করিয়া পঞ্জাব আক্র-মণ করেন। লাহোরের অধীশ্বর তাঁহার গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন;

কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সবক্তিগিণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে স্বীকার করেন। পরে ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের কুপরামর্শে জয়পাল আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে সবক্তিগিণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে অন্যান্য হিন্দুরাজগণ জয়পালের সহিত যোগদান করতঃ প্রাণপণে সবক্তিগিণের সৈন্যগণের গতিরোধের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইহার পর ভুবনবিখ্যাত মহমুদ গজনীর দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ। তাঁহার বারম্বার ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে অনেক ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হয়, বিস্তর নরদেহ পাত হয়। সোমনাথ, মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি হিন্দুদিগের তীর্থস্থান সমূহ লণ্ডভণ্ড ও তত্তৎ স্থানস্থিত দেব মন্দিরাদি ধূলিসাৎ হয়। এই কারণে হিন্দু-দিগের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই। ইহাতে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুগণের বিদ্বেষ বা বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক কথা। অন্য পক্ষে কোন কোন হিন্দু রাজার প্রবঞ্চনা, কাহারও বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ভীরুতা এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিমিত্ত হিন্দু সাধারণের উপর মুসলমানের জাতীয় ও ধর্ম্মগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ হওয়াও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে একের পর এক যতই মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া হিন্দুগণকে পরাজিত করত রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, ততই উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের বীজ রোপিত ও অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক যে, সকল মুসলমান নৃপতিই যে হিন্দু-দিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন বা তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং অনেকে হিন্দু-মুসলমানকে পুত্র নির্ব্বিশেষে শাসন করিয়াছেন এবং দেশে শান্তি স্থাপন ও প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রথম আগ-মনের পর মুসলমানগণ এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন; স্থানে স্থানে হাট, গঞ্জ, নগর, বাজার স্থাপন করেন; এবং অজস্র অর্থব্যয়ে নানা প্রকার সুবৃহৎ অট্টালিকা শ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়া প্রকৃত অধিবাসীর ন্যায় ভারতবর্ষে বসবাস করেন। আবার মহামতি আকবর প্রমুখ বাদসাহগণ হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত হিন্দুগণকেও রাজ্যের উচ্চপদ সমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমন কি, উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন ও সম্পর্ক প্রগাঢ় করণার্থ হিন্দু রাজকন্যাগণকে আপনাপন পুত্রাদির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

এইরূপে মুসলমান বাদসাহ ও শাসন কর্ত্তৃগণের যত্নে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। প্রজা সাধারণ "মোটা ভাত, মোটা বস্ত্রে" পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বরং এরূপ হইল যে, নাদীর সাহ প্রভৃতি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন, তখন হিন্দু-মুসলমান উভয়ে একযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। মোগল রাজত্বের শেষভাগে হিন্দুগণই প্রকৃত পক্ষে রাজত্বের সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ণধার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান অনেকদিন যাবৎ একত্রে পাশাপাশি ভাবে বসবাস করায় হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমান বাদসাহগণের অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য এবং দেশে অপেক্ষাকৃত শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায়, হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ একেবারে তিরোহিত না হইলেও বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ—

মোগল-সাম্রাজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

দারা শাহ পিতার পরামর্শানুসারে আগরা দুর্গস্থিত অধিকাংশ ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করেন ও স্বীয় শাসনাধীন লাহোর প্রদেশে উপনীত হইয়া ভ্রাতার গতিরোধের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আশা ছিল যে, অচিরেই তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধুবর্গ এ দুঃসময়েও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকো রাজা রূপের * সমভিব্যাহারে পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা সহ তাঁহার রাজ্যে সৈন্য-সংগ্রহ-মানসে গমন করেন। কিন্তু এই বিপুল অর্থই

* বোর্ণিও এক রাজারূপের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি বলেন যে, রাজা জয়সিংহ ও দলিল খাঁ শেকোর অর্থ লুণ্ঠন করেন। খাফিখাঁ বলেন, এক রাজা রূপ—যুবরাজ মোয়াজিমের শ্বশুর ছিলেন ; আর এক রাজারূপ আওরঙ্গজেবের অধীনে উচ্চ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই সোলেমান শেকোকে সম্রাট হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্ত ভয় দেখাইয়া শ্রীনগরের রাজাকে পত্র লিখেন।

তাঁহার অনর্থের মূল হয়। রাজারূপ রজত-খণ্ডের মোহিনী-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বিশ্বাস ও স্নেহের বক্ষে পদাঘাত করতঃ অতি ঘৃণিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইহাতে শেকো ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে আশঙ্কায় তিনি শ্রীনগর রাজ্যে রাজা নক্তি-রাণীর * আশ্রয়ে পলায়নপর হন। কিয়দ্দিবস পর রাজা অতি হীন ও ঘৃণিত ভাবে শেকোকে শত্রু আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করেন।

দারা শাহ রাজারূপের বিশ্বাস ঘাতকতার সংবাদ পাইয়া এবং অপর সমস্ত বন্ধু বান্ধবকেই তৎপক্ষ ত্যাগ করিতে দেখিয়া লাহোর হইতে সিন্ধু † (Scinde) রাজ্যে প্রস্থান করেন। দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী বেকার নামক দুর্গে জলপথে প্রেরণ করেন। এই সকল ধনরত্ন রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ লইয়া ছয় সহস্র প্রহরীও প্রেরিত হয়। এরূপ বন্দোবস্ত করার পর দারা সিন্ধু রাজ্যে গমন করেন। তথায় তাঁহার কয়েকটি বৃহৎ কামান ছিল। সিন্ধু হইতে দারা Kachnagana রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়া গুজরাটে উপনীত হন। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে শাহজাহানের উত্তরাধিকারী ও ন্যায় সঙ্গত সম্রাট রূপে গ্রহণ করে। এখান হইতে তিনি সমস্ত নগরে ও সহরে আদেশ প্রেরণ ও খুরাটে এক শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুরাদবক্স কর্ত্তৃক নিযুক্ত তত্রত্য দুর্গের অধিনায়ক দারার বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন; সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে একাকী বিতাড়িত হইতে হয়।

এই সময় দারা আহমদাবাদ হইতে সংবাদ পান যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রভূত শক্তিশালী রাজা যেসম সিং আওরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। এই নরপতি দারাকে স্বসৈন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। দারা রাজার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত তৎকালীন প্রধান আড্ডা

* খাফি খাঁর মতে শ্রীনগরের রাজার নাম পৃথি সিংহ।

† For more accurate and exhaustive accounts, see Khafi Khan's excellent narrative in Elliot's History of India, Vo. VII, and Col. Dow's Hindustan, Vol. III.

এমির (Emir) অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু রাজা জেসম সিং তদপেক্ষাও প্রতাপশালী রাজা জয়সিং কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনরায় আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। কাজেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ দারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তবে একবার তিনি তাঁহার সহিত দেখা করেন বটে, কিন্তু সেবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি তখন হতভাগ্য যুবরাজকে ফাঁদে ফেলিবার কল্পনা করিতে ছিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিন দিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। যুদ্ধ যখন পূর্ণতেজে চলিতেছিল, জেসম সিং তখন তাঁহার সমস্ত বিবেক বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া দারাকে ত্যাগ করিয়া আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে দারার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দারা ভগ্নোৎসাহে স্ত্রী পুত্র ও বিশ্বস্ত অনুচর-বৃন্দ সহ অতি শোচনীয় অবস্থায় পলায়ন করিয়া আহমদাবাদে উপনীত হন। কিন্তু তথাকার শাসনকর্ত্তা আওরঙ্গজেবের পক্ষভুক্ত হইয়া তাঁহাকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করায়, তিনি সহরে প্রবেশাধিকার লাভে বঞ্চিত হন। কাজেই মধ্য রাত্রিতে আহমদাবাদ ত্যাগ করিয়া সিন্ধুর পথে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়।

পারস্যে যাইবার অভিপ্রায়েই দারা সিন্ধু উপনীত হন। পারস্য-রাজ দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তৎপ্রতি প্রভূত অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হন। দারা জলপথে যাওয়া নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া স্থলপথে কান্দাহারের পথে পাঠানদিগের রাজ্য মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জিয়ন খাঁ নামক তদ্দেশের একজন প্রভু * কর্ত্তৃক প্রতারিত হন। এই ব্যক্তি যুবরাজের পিতা সম্রাটের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা সম্রাট তাঁহার কোনও গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করেন, কিন্তু দারার অনুগ্রহে সে যাত্রা রক্ষা পান। এই জিয়নখাঁর ভবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দারা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর † আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। যুবরাজ এই পত্নীকেই

---

* খাফিখাঁর মতে ধান্দারের জমাদার মালেক জেওয়ান এবং এলফিন্ ষ্টোনের মতে—জান। বোর্ণিয়ো বলেন যে, তিনি দুইবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন কিন্তু দুইবারই দারার অনুগ্রহে পরিত্রাণ পান।

† নাদিরাবানু বেগম,—সুলতান পারবেজের কন্যা। খাফিখাঁর মতে তিনি মালেক জেওয়ানের রাজ্যে পরলোক গমন করেন। কিন্তু ঋাউ বলেন, তিনি স্বামীর পার্শ্বেই অনন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ রমণীও স্বামীর প্রত্যেক দুঃসময়ে ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইতেন। দারা মনে করেন যে, পর্য্যটনের দুঃসহ কষ্টেই তিনি গতায়ু * হইয়াছেন; কারণ কোন কোন স্থানে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও তিনি এক বিন্দু পানীয় পান নাই। এই সকল চিন্তায় তিনি আরও ব্যথিত হন এবং মৃত্যু সংবাদ প্রথম শ্রুত হইবামাত্র মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত † হইয়া পড়েন। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে দারা চৈতন্যলাভ করতঃ অতিশয় শোকাতুর ভাবে নিজের বস্ত্র ছিন্ন করেন। ‡ ইহার পূর্ব্বে তিনি আর যে সকল শোক বা দুঃখ পান, তৎসমুদয়ে ঠিক যেন নির্লিপ্ত ভাব প্রদর্শন করেন; কিন্তু এবার তাঁহার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। বন্ধুবর্গের নানা সান্ত্বনা বাক্যেও তিনি সুস্থ হইতে পারেন না। অতঃপর তিনি সময়োপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত এবং শিরস্ত্রাণের পরিবর্ত্তে মোটা ক্যালিকো বস্ত্র মাথায় জড়ান। এই শোচনীয় বেশে তিনি বিশ্বাসঘাতক জিয়ন খাঁর গৃহে পদার্পণ করতঃ ভূমি-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে আর এক নূতন বিপদ আসিয়া তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত করায় দারা জাগিয়া উঠেন। দারার দ্বিতীয় পুত্র নবীন যুবরাজ শেপার শেকোকে বন্দী করিবার কল্পনা জিয়নের ছিল। যুবরাজ বয়সে নবীন হইলেও শক্তি সামর্থে প্রবীণের ন্যায় ছিলেন। জিয়ন অনুচরবৃন্দ সহ তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিলে নবীন যুবরাজ তাঁহার তীর ধনুকের সাহায্যে তাহাদের তিন জনকে ভূতলশায়ী করেন; কিন্তু পরে বেশী লোক আসিয়া পড়ায় তিনি একাকী আত্মরক্ষার্থে অক্ষম হন। সপ্তরথীর বেষ্টনে তিনি শত্রুকর-কবলিত হন। দারা এই সংঘর্ষের শব্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন, পুত্রের হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে বন্ধন করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তদ্দর্শনে যুবরাজের হতভাগ্য পিতা দারা ঘৃণা ও দ্বেষ মিশ্রিত স্বরে জিয়ন খাঁকে বলেন,—"অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নর-পিশাচ! শেষ কর্! যে কাজ আরম্ভ

---

* মোনিয়ো বলেন, বেগম নিজেই বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। খাফিখাঁ বলেন,—তিনি আমাশয় ও পথ ক্লেশে মৃত্যু মুখে পতিত হন। কর্ণেল ডাউও শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

† কর্ণেল ডাউ তাঁহার হিন্দুস্থানের ইতিহাসে (Vol. III.) দারার এই সময়ের অবস্থা [illegible] তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

‡ [illegible]

করেছিস, তা' শেষ কর। আমাদের এখন অদৃষ্ট মন্দ, তাই আওরঙ্গজেবের অন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আহুতি রূপে প্রদত্ত হচ্ছি। কিন্তু মনে রাখিস্ নরাধম! আমি দু'বার তোর জীবন রক্ষা করেছি; তার প্রতিদানে আমার প্রাণ তো নষ্ট করবিই! ইহাতে বেশী দুঃখিত নই, কিন্তু আমার মর্ম্মান্তক ক্লেশের কারণ,—তুই আমার পুত্রকে পিঠমোড়া করে বেঁধেছিস্; মোগলরাজবংশের অপর কোনও যুবরাজ পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন নি।" জিয়ন খাঁ দারার বাক্য শ্রবণে বিচলিত হইয়া যুবরাজের বন্ধন মোচন করেন, কিন্তু পিতা-পুত্রের প্রহরায় লোক নিযুক্ত রাখিয়া দেন। তৎপর তিনি রাজা জেসম সিং ও আবদুল্লা খাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, দারা শাহ অনুচরগণ সহ ধৃত হইয়াছেন। এখন তাঁহার কি করা উচিত, পরামর্শ দিবেন। তাঁহারা সংবাদ অবগত হওয়া মাত্র যুবরাজের ধন রত্নের অংশ লাভের আশায় জিয়ন খাঁর গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই জিয়ন দারার সমস্ত মুল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করেন। এমন কি যুবরাজের পুত্র কন্যা ও পরিবার পরিজনের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজা এবং আবদুল্লা উপনীত হইয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজ ও তদীয় পুত্র পরিবারকে হস্তীতে করিয়া জাহানাবাদে লইয়া যান। পথিমধ্যে যুবরাজকে দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য লোক সমাগম হয়। তাহারা দারাকেই সম্রাট রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিবার আশা করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে জাহানাবাদের সমস্ত রাস্তা ও বাজার ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবার বন্দোবস্ত করেন। * ইহার উদ্দেশ্য, কেহ যেন পরে তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা না করে; এবং সম্ভবতঃ এইরূপ অসাধু উপায়ে ভ্রাতার উপর জয় লাভের শ্লাঘা প্রকাশার্থই তিনি এরূপ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া আসার † (Asser) প্রাসাদে পাঠাইবার আদেশ দেন। যাহারা এই হতভাগ্য দুরদৃষ্ট যুবরাজকে দেখিতে একত্র হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাঁহাকে—তাহাদের আইন-সঙ্গত অধিপতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্গ সঞ্চালন করিতেও সক্ষম হয় না। কেবল কতিপয় সদাশয় সৈনিক যাহারা পূর্ব্বে তাঁহার অধীনে কার্য্য করিত এবং যুব-

* বোর্ণিয়ো স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করেন। দারা যে ভাবে ধৃত হইয়া দিল্লীর সমস্ত রাজপথে হাতীর পৃষ্ঠে চাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হন, তাহার উজ্জ্বল চিত্র বোর্ণিয়োর ভ্রমণ কাহিনীতে প্রদত্ত হইয়াছে (৯৩ পৃঃ)।

† বোর্ণিয়ো বলেন, দারাকে এক উদ্যানে রাখা হয় কিন্তু খাফি খাঁ বলেন যে, তাঁহাকে খিজরাবাদে পাঠান হয়।

রাজের অনুগ্রহ ভাজন ছিল,—তাহারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতক জিয়ন খাঁকে * আক্রমণ করে। কিন্তু তৎকালে তিনি রক্ষা পাইলেও অবিলম্বে তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হন। জিয়ন খাঁ এই মহা গৌরবান্বিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে এক অরণ্য অতিক্রম করিবার সময় ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। †

ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব প্রকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ও সুনিপুণ ছদ্মবেশীর ন্যায় ঘোষণা করেন যে, দারাশাহকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন নাই; তিনি কেবল তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দারা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার অপরিচিত জিয়ন খাঁ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ধৃত করে এবং রাজ পরিবারের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া নির্লজ্জভাবে বালক শেপারশেকোকে পিঠমোড়া করিয়া বন্ধন করে। তাহার এই অপরাধের নিমিত্ত সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ইহা কেবল লোক ভুলানো কথা। কারণ, আওরঙ্গজেবের ঐরূপ আদেশ না থাকিলে কি পার তিনি ভ্রাতার শিরশ্ছেদের আদেশ করিতেন?

জাহানাবাদ হইতে দারাশাহ প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট

* বোর্ণিয়ো লিখিয়াছেন,—"তথায় কেবল মাত্র কতিপয় ফকির ও তাহাদের অনুগত কয়েকজন গরীব লোক ছিল। তাহারা পাপিষ্ঠ জিয়ন খাঁকে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে দেখিয়া তৎপ্রতি লোষ্ট্র, ইষ্টক প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে ও রাজদ্রোহী বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। * * * তথায় তৎকালে উচ্চ বিলাপধ্বনি এবং জিয়ন খাঁর প্রতি অভিসম্পাত ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না।" খাফি খাঁও ঐরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—"The idlers, the partisaus of Dara Shukho, the workmen and people of all *sports*, inciting each other, gathered into a mob, clud assailning Jiwan and his companions with abuse and imprecations, they pelted them with dirt and filth and clods and stones, so that several persons were kuocked down and killed, many were wonuded. * * * Ashes and pots full of urine and ordure were thrown down from the roofs of the houses upon the heads of the Afgans, and many of the bystanders were injured."

† Vide Bernier's Travels, P. 97. ডাউর (Dow's) হিন্দুস্থানের ইতিহাসে আছে,—"The country people rose upon him every where. They hunted him from place to place; till at length he met with his deserts and was slain when he had almost reached the bounderies of his own government." Vol. iii.

কারাগার অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একটি মনোরম স্থান দেখিয়া দারা তথায় বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে শিবির সন্নি-বেশিত হয়। তৎপর তাঁহার আহারান্তে শেফকান নামক এক ব্যক্তি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা আনয়ন করে। তাহাকে তাম্বুতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দারা তাহাকে আদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ব্যক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দেখিতে পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তদুত্তরে সেফকান বলে যে, এক সময়ে সে তাঁহার ভৃত্য ছিল বটে, কিন্তু এখন সে আওরঙ্গজেবের ক্রীতদাস। এই নবপ্রভু তাহাকে দারার মস্তক লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

দারা বলেন,—'তাহ'লে কি এখনই আমার মৃত্যু?'

সেফকান,—'সম্রাটের আদেশ তদ্রূপ এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমার প্রতি ভার অর্পিত হইয়াছে।' শেপার শেকো তাম্বুর অপর কক্ষে ছিলেন। তিনি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পিতার সাহায্যার্থে আসিতেই শেফকানের সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। দারা শাহ আত্মরক্ষার্থে নিজেই কিছুক্ষণ চেষ্টা করেন; কিন্তু একের চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া তিনি উপাসনা করিবার নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণের অবকাশ প্রার্থনা করেন। তাঁহার এই শেষ প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। ইত্যবসরে শেপার শেকোকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। উপাসনা শেষ হইতে না হইতেই এক পিশাচ আসিয়া হতভাগ্য যুবরাজের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করে! * এই ছিন্ন মস্তক সেফকান আওরঙ্গজেবের সকাশে লইয়া যায়। এই লোমহর্ষণ কাণ্ড শেষ হইলে শেপার শেকো গোয়ালিয়র প্রাসাদে খুল্লতাত মুরাদ বক্সের নিকট প্রেরিত হন। আর হতভাগ্য দারার ভার্য্যা ও দুহিতৃগণ † আওরঙ্গ-জেবের অনুগ্রহে তাঁহার হেরমের এক অংশে একটু স্থান প্রাপ্ত হন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* টাভারনিয়র কেবল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বোর্ণিয়ো বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত কয়েক বিষয়ের সহিত এই দুই ভ্রমণকারীর লেখার অনৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। বোর্ণিয়োর বিবরণে আছে যে, নাজের (সেক নহে) নামক এক ব্যক্তি এই নৃশংস কার্য্যে নিযুক্ত হয়। উপাসনার নিমিত্ত দারাকে তিলমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় না। ২।৩ জন ঘাতক অকস্মাৎ দারাকে আক্রমণ করে এবং নাজের তাঁহার গ্রীবা ছেদন করে। বোর্ণিয়ো বলেন,—"তৎপর দারার ছিন্ন মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট দুর্গে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা একখানি থালায় করিয়া জলসহ আনিতে আদেশ করেন। আদেশ পালিত হইলে তিনি একখানি রুমাল দিয়া মুণ্ড মুছিয়া জলদ্বারা দারার মুখ ও তৎসহ রক্ত ধৌত করেন। পরিস্কার করিয়া তিনি দারার মস্তক বলিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্ত হন। তৎপর কিঞ্চিৎ দুঃখিত ভাবে বলেন,—'আঃ বদ্-বক্ত! হা হতভাগ্য জীব'!—যাও, এখন লইয়া গিয়া হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে সমাধিস্থ কর।"

† বর্ণিয়ো লিখিয়াছেন যে, দারার একটি মাত্র পত্নী ছিলেন। তিনিও ইতিপূর্ব্বেই লাহোরে পরলোক গমন করেন। তিনি একটি মাত্র কন্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কন্যা শাহজাহান ও শাহজাদী জাহানারার (বেগম সাহেবার) অনুরোধ ক্রমে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হন।

ভারতীয় পারস্য কবি।

(সেখ আবুল ফজল।)

শেখ আবুল ফজলও একজন বিচক্ষণ পারস্য কবি। এই পরম পণ্ডিত কবিও সম্রাট আকবরের প্রিয়তম বন্ধু ও সর্ব্বপ্রধান রাজস্ব সচিব ছিলেন। কবি-সম্রাট আবুল ফয়েজ ফয়জীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি সম্রাট আকবরের সান্নিধ্য লাভ করেন। সম্রাট তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সরকারে কোন একটি উচ্চ বেতনের চাকরী প্রদান করেন। রাজ সরকারে উচ্চপদ লাভ করিয়া আবুল ফজল দিন দিন বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীপদে উন্নীত করেন। মন্ত্রীপদ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহী আকবর দেখিলেন, আবুল ফজলের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন, গুণবান, জ্ঞানবান ও বিদ্যাবান লোক অতি বিরল। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া প্রায় যাবতীয় বিষয় কার্য্যের ভার তাঁহাকেই প্রদান করেন। সম্রাটের সহিত আবুল ফজলের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল তিনি যাহা বলিতেন, সম্রাট তাহাই করিতেন; অন্যান্য পারিষদ এবং মন্ত্রিগণের কথা বড় একটা শুনিতেন না। তাহাতে সম্রাটের অন্যান্য মন্ত্রী এবং পারিষদগণ আবুল ফজলের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অল্পবয়স্ক অসংযতবুদ্ধি শাহাজাদা সেলিমকেও কুপরামর্শদানে তাঁহাদের সহকারী করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ আবুল ফজল তাঁহার পিতার জীবিতাবস্থায় রচিত পবিত্র কোরাণ শরিফের টীকা কয়েকখণ্ড নকল করাইয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তৎকালীন রাজবিধানানুসারে সম্রাট আকবরের নাম ভ্রম ক্রমে তাহাতে লিখা হইয়াছিল না এজন্য সম্রাট আবুল ফজলের প্রতি কতকটা অসন্তুষ্ট হন। সুযোগ পাইয়া অরিগণ মস্তকোত্তোলন করিল এবং একথা সেকথায় তিলকে তাল করিয়া সম্রাটের অসন্তোষকে আরও প্রবল করিয়া তুলিল। আবুল ফজল কিছুদিনের জন্য কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট পুনরায় আবুল ফজলের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যের এক যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আবুল ফজল রাজধানী অভিমুখে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন; ইত্যবসরে পথি মধ্যে শাহাজাদা সেলিমের প্রেরিত নরসিংহ দেব নামক জনৈক ঘাতকের হস্তে উজ্জিন নগরে * ১০১১ হিজরী মোতাবেক ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। আগরা নগরীতে তাঁহার পবিত্র সমাধি বর্ত্তমান আছে। বিশ্বস্ত বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করায় মহামতি আকবর পুত্রের প্রতি ভয়ানক বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইলেন এবং আবুল ফজলের সুযোগ্য পুত্র আবদুর রহমান দ্বারা নরসিংহ দেবকে তাহার দলবল সহ বিনষ্ট করাইয়া আবুল ফজলের হত্যার প্রতিশোধ লইলেন। তিনি শাহজাদা সেলিমকেও ত্যজ্য পুত্রের অবস্থায় রাখিলেন।

আবুল ফজল সকল বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহারই যত্নে সকলে আকবরকে যেরূপ রাজ নৈতিক বিষয়ে, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারই যত্নে তখন সকলে স্বাধীন ভাবে আপন ধর্ম্ম কার্য্য করিতে পারিতেন। তিনি আকবরের জীবনী "আকবর নামা" এবং শাসন প্রণালী "আইন আকবরী" প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও "কোরাণ," "তারিকী," "জিলার" প্রভৃতি ১২ খানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার ভাব অতি উচ্চ এবং সর্ব্বরসে রসাল।

সৈয়দ নূরুল হোসেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

অঙ্কুর—১ম বর্ষ—৯ম সংখ্যা—আশ্বিন।

এই নূতন পত্রখানি ইতোমধ্যেই বঙ্গীয় মাসিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ইহার সম্পাদক ও সুপরিচিত সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত আনন্দ গোপাল ঘোষ মহাশয় সহযোগী সম্পাদক। উপযুক্ত হস্তে পরিচালন-ভার ন্যস্ত হওয়াতেই ইহার এরূপ আনন্দজনক সফলতা, সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করিতেছি। অন্যান্য সংখ্যার মত সমালোচ্য সংখ্যা খানিও অনেক সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজিতে পূর্ণ। 'দীর্ঘ নিদ্রা ও যোগ'

* উজ্জিন—কি উজ্জয়িনী? কোঃ সঃ।

প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় দীর্ঘ নিদ্রা ও যোগের অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'প্রেমের তপস্যা' কবিতায় প্রেমিক হৃদয়ের সুস্পষ্ট আলেখ্য প্রতিফলিত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি; কিন্তু আমরা 'সত্রস্তে' ইত্যাদির মত দুষ্ট প্রয়োগ 'অঙ্কুরে' দেখিতে আশা করি না। 'কুমার সম্ভবে পার্ব্বতী' জনৈক স্ত্রী লেখিকার কৃত সমালোচনা। শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষের 'প্রেমের বিধান' কবিতাটির শেষাংশটি বড় সুন্দর লাগিল। 'রত্নমালার' শ্লোকগুলি বস্তুতঃই অন্বর্থনামা। 'শ্রীমদ্বেদানন্দ স্বামীর মেবসাশ্রম আবিষ্কার' প্রবন্ধে স্বামীজির জীবনী শিক্ষাপ্রদ। 'রমা' উপন্যাস আজও 'ক্রমশঃ' সুতরাং মতামত দেওয়া চলে না। 'মক্কাতীর্থ' প্রবন্ধে মৌলবী সেখ আহামদ সোবাহান সাহেব পবিত্র মক্কা মায়াজ্জমার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাষার একটা অভাব দূরীভূত করিতেছেন। এজন্য সেখ সাহেব সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন। নবব্রতী হইলেও তাঁহার লিপি-প্রণালী প্রশংসনীয় এবং ভাষাও সুন্দর। আশীর্ব্বাদ করি, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার সফলতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ হউক। 'স্নেহের জয়' শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, মহাশয়ের একটি ক্ষুদ্র গাথা। উহাতে উল্লেখযোগ্য আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, "প্রবেশিল আসি যবন সৈন্য হিন্দুর বাড়ী বাড়ী" উহার এই ছত্রটি সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নাই! বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, হিন্দু লেখকগণ আজ পর্য্যন্ত 'যবন' শব্দের মায়া কাটাইতে পারিলেন না! হিন্দুলেখকগণের এক হস্তে মুসলমানের প্রতি প্রীতিধ্বজা ও অপর হস্তে সম্মার্জ্জনী প্রদর্শন—এমন অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ কি বঙ্গসাহিত্যের দপ্তরে চিরদিনই দেখিতে হইবে? 'যবন' শব্দের সন্নিবেশ না হইলে এক সময়ে তাঁহাদের কবিতাসুন্দরী প্রসন্না হইতেন না সত্য বটে; কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আজ সংসারের সে অবস্থা ত আছে বলিয়া বোধ হয় না! বর্ত্তমানে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুগণের প্রীতি-সমুদ্র যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলেই বোধ হয় আবার সেই 'যবন' শব্দের আবির্ভাব! 'অঙ্কুরে' এরূপ দূষণীয় শব্দযুক্ত কবিতার স্থান হইয়াছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। এই দেশের জল বায়ুর দোষ না হইলে কি হিন্দু সম্পাদক মাত্রই এরূপ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিতেন? ভাল কথা, 'অঙ্কুর' ব্যাকরণের 'চিহ্ন-প্রকরণ' লইয়া হঠাৎ এত ব্যস্ত হইলেন কেন? বেচারা চিহ্ন প্রকরণের এরূপ অযথা আদ্যশ্রাদ্ধ দেখিয়া আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হইয়াছে। পাঠকগণ 'মক্কাতীর্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধ দেখিলেই আমাদের বিস্ময়ের হেতু নির্ণয় করিতে পারিবেন।

নবনূর—৪র্থ বর্ষ—৫ম সংখ্যা—ভাদ্র।

'আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' সুলিখিত উক্ত সম্রাট প্রবর সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ধারণার পরিবর্ত্তন একদিনে সম্ভব নহে। তবে চেষ্টা চলিতে বাধা নাই। 'স্বদেশী মঙ্গল' স্বদেশ প্রেমের মঙ্গল-নিক্কণে মুখরিত। এখন আমাদের বিষম সঙ্কট কাল উপস্থিত। এই সময় হইতে আমাদিগকে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; দেশীয় শিল্প ও উৎপন্নের শ্রীবৃদ্ধি সাধন

করিতে হইবে; বিদেশী বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারা নিজের অভাব মোচন করিতে হইবে;—আমাদের এই সংকল্প (যাহা অপেক্ষা মহৎ সঙ্কল্প আর হইতে পারে না) কার্য্যে পরিণত করিবার দিন উপস্থিত হইয়াছে; আর বসিয়া থাকার সময় নাই। 'টিলাকুঠি' উপন্যাস—আজও শেষ হয় নাই। 'হাই এবে্ন ইয়কজান' এবে্ন তোফায়েল কৃত দার্শনিক উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ নূতন। আমরা লেখক মোহাম্মদ কে চাঁদ সাহেবকে ধন্যবাদ দিতেছি। 'আত্মদান' শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্তের কবিতা। বেশ লাগিল। লেখক মুসলমানী বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অপরাপর হিন্দু লেখকগণও যদি তাঁহার এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেন, তবে মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাভাবিক ধারণা যেমন পরিবর্ত্তিত হইত, পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতিও তেমন আপনা আপনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। অত্যাচারে কাহারও প্রীতি আকর্ষণ করা অস্বাভাবিক। 'সৎ সাহস' একটি সত্য ঘটনা মূলক অত্যন্ত কৌতূকাবহ কাহিনী—উর্দ্দু হইতে অনূদিত। 'মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ভারতায় পারস্য ভাষায় রচিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের পরম উপকার করিতেছেন। তাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হউক।

কল্পতরু—১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা—আশ্বিন।

জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি ব্যতীত কোন জাতীর জাতীয়তা সংঘটন অসম্ভব। বঙ্গদেশবাসী হইয়া আমরা এতদিন বঙ্গভাষার প্রতি বিমুখ হইয়া আসিতেছিলাম। উহার সহিত আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও জড়িত সম্বন্ধ তাহাতে উহার প্রতি উদাসীনতা আমাদের উন্নতি পথের পরিপন্থী স্বরূপ গণ্য হওয়ার যোগ্য, সন্দেহ নাই। আমরা ধীরে ধীরে যেন আপনাদের সেই ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তাই আজ স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে মাতৃভাষা-চর্চ্চার অভিব উপায় স্বরূপ 'কল্পতরু'র প্রচারে ব্রতী হইতে দেখিয়া আমাদের আহ্লাদের সীমা নাই। ২।১ নং বংশী বাজার—ঢাকা হইতে উহা প্রকাশিত হইতেছে। মৌলবী সামসু জ্জোহা চৌধুরী সাহেব উহার সম্পাদক পদে বৃত। বার্ষিক মূল্য সাধারণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা এবং ছাত্র ও মহিলাদের পক্ষে ১৲ টাকা মাত্র। কোন পত্রিকারই ২।১ সংখ্যা মাত্র দেখিয়া উহার জীবনপ্রবাহ কোন্ খাতে চলিবে ঠিক বলা যাইতে পারে না। 'কল্পতরু' সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে উহার এই দুই সংখ্যা দেখিয়া আমরা যথেষ্ট আশান্বিত হইয়াছি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক লেখকই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া আমাদের আশা হয়, কালে 'কল্পতরু' একখানি উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্র হইতে পারিবে। আমরা এই নব সহযোগীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

মোহ-মুদ্গার।*

ত্যজ মূঢ়! ধনার্জ্জনে তব অভিলাষ,
মন্দমতি! কর তব বাসনা বিনাশ;
নিজ কর্ম্মফলে যাহা লভিলে যখন,
তাহাতেই কর তব চিত্ত-বিনোদন। ১।
অর্থ অনর্থক বলি ভাব অনিবার,
সুখলেশ মাত্র তাহে নাহি জে'নো সার;
ধনবান নিজ পুত্র-ভয়ে হয় ভীত,
এই নীতি-পূর্ণ কথা সর্ব্বত্র বিদিত। ২।
কে তোমার প্রণয়িনী? কে তব নন্দন?
অতীব বিচিত্র এই ভবের বন্ধন!
তুমি কার? কোথা হ'তে হ'লে সমাগত?
এই তত্ত্ব নিরন্তর চিন্তা কর ভ্রাতঃ! ৩।
ধন, জন, যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার,
নিমিষেই করে কাল সব ছারখার!
পরিহার করি এই বিশ্ব মায়াময়,
পরমেশ-পদে মগ্ন করহ হৃদয়। ৪।
সলিল নলিনী-দলে চপল যেমন,
তেমতি চপল এই মানব-জীবন!
ব্যাধি-রূপী বহু ভুজঙ্গম-আক্রমণে,
কি শোক-বিষাদ-মগ্ন হেরি সর্ব্বজনে! ৫।
তত্ত্ব-নিরূপণ কর নিত্য মনে মনে,
অভিলাষ ছাড় এই বিনশ্বর ধনে;
ক্ষণতরে সজ্জনের সঙ্গ-লাভ করি,
এ ভব-সমুদ্র তুমি যাও হে উত্তরি। ৬।
অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত জলনিধি,
পুরন্দর, দিবাকর, রুদ্র আর বিধি,
তুমি, আমি, চরাচর—শূন্য সমুদয়!
তবু কেন শোকাকুল বল এ সময়? ৭।
যত কাল ধনার্জ্জন-শক্তি র'বে ভবে,
তত কাল বশীভূত পরিবার সবে;
জরায় হইবে জীর্ণ শরীর যখন,
কেহ নাহি জিজ্ঞাসিবে হায়রে তখন! ৮।

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত 'মোহমুদ্গারের' অনুবাদ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করি পরিহার,
তুমি কে ? অন্তরে এই চিন্ত অনিবার ;
আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় মানব সকল,
দুস্তর নরকে ডুবি পচিছে কেবল। ৯।
নিবসতি দেবালয়-বিটপীর মূলে,
মৃগচর্ম্ম পরিচ্ছদ, শয্যা ভূমিতলে ;
বিষয়ে বিরতি, ত্যাগ সমুদয় ভোগে,—
কাহার না সুখ হয় এ হেন বিরাগে ? ১০।
পুলকে বালক সবে ক্রীড়ায় নিরত,
যুবকেরা যুবতীর প্রণয়-মোহিত ;
বৃদ্ধেরা বিষয়-চিন্তা-নিমগন রয়,
পরম ব্রহ্মেতে আহা ! কেহ মগ্ন নয় ! ১১।
শত্রু, মিত্র, পুত্র কিম্বা সুহৃৎ স্বজনে,
অভিলাষ পরিহর সন্ধি আর রণে ;
ভবে সম-ভাবময় হের সমুদয়,
অচিরে পরম ব্রহ্মে যদি চাহ লয়। ১২।
জন্মিয়াছ, পুনরায় লভিবে মরণ,
জননী-জঠরে পুনঃ করিবে শয়ন ; *
এই অতি দুঃখময় ধরায় কি ব'লে,
পুলকে মানব ! তুমি মোহিত হইলে ? ১৩।
দিবস, রজনী পুনঃ সায়াহ্ন, প্রভাত,
শিশির, বসন্ত ক্রমে করে যাতায়াত ;
কালের ক্রীড়ায় আয়ু হইতেছে ক্ষয়,
তবুও বাসনা-বায়ু ক্ষান্ত নাহি হয় ! ১৪।
শিরে শুভ্র কেশ, অঙ্গ হইল বলিত,
বদন-মণ্ডল হ'ল দশনে বঞ্চিত ;
তনুর কম্পন-ভরে যষ্টি নড়ে করে,
তবু বৃদ্ধ আশা-ভাণ্ড রহিয়াছে ধ'রে ! ১৫।
পরম ঈশ্বর এক, ভিন্ন ভিন্ন নরে,
বৃথা ভেদ অকারণ কর রোষ-ভরে ;
অপরে আপন সম একাত্ম নেহার,
সর্ব্বত্র বিভিন্ন জ্ঞান পরিহার কর। ১৬।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

* মোহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রমতে মানবের পুনর্জ্জন্ম নাই। কো—সঃ।

জবিহ্ আবদোল্লা।

মহাত্মা আবদল মোত্তালিব জমজমের পুনরুদ্ধার কালে কোরেশগণ কর্ত্তৃক স্বীয় আরদ্ধ কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তৎকালিক তাঁহার একমাত্র পুত্র হারেছ ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্বীয় পক্ষ ভুক্ত বা আপনার সাহায্যকারী প্রাপ্ত হন নাই। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান খোদাতাআলার সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে আল্লাহ! যদি তুমি আমায় দশটি পুত্র সন্তান প্রদান কর, তাহা হইলে একটি পুত্রকে আমি তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ (কোরবাণী) করিব।"

ক্রমে ক্রমে আল্লাহ-তাআলা তাঁহাকে দশটি পুত্র সন্তান প্রদান করিয়া তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ করিলেন। অনন্তর তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় বাক্য পালনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া আপনার পুত্রগণের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার প্রাণাধিকগণ সকলেই একবাক্যে কহিলেন, "দেব! আপনি আমাদের ভক্তিভাজন জনক। যদ্যপি আমাদের প্রত্যেককেই জগৎ পিতা আল্লাহ-তাআলার উদ্দেশে আপনি কোরবাণী করেন, তাহাতেও আমরা কায়মনোবাক্যে সম্মত ও প্রস্তুত আছি।" আবদল মোত্তালিব স্বীয় বংশধরগণের ঈদৃশ ভক্তি ও বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে কাহাকে কোরবাণী প্রদান করিবেন, ইহা স্থির করিবার জন্য পবিত্র কাবা-মন্দিরে গমন করত তাঁহার পুত্রগণের নাম লিপি-বদ্ধ করিয়া ভাগ্য ক্রীড়া (স্থর্ত্তি) আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তদীয় পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার অধিকতর প্রিয় সুকুমার আবদোল্লার নামই স্থর্ত্তি পত্রে উত্থিত হইল।

কুমার আবদোল্লার ললাট প্রদেশে "নূরমোহাম্মদী" প্রদীপ্ত ছিল। তজ্জন্য সে সময়ে সমগ্র আরবদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই রূপবান ছিলেন না। বল-বিক্রমেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। অন্য দিকে ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতার জন্য তিনি শত্রু-মিত্র সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। আবদোল্লা আশৈশব সর্ব্ববিধগুণের অধিকারী থাকায় মক্কার সর্ব্ব সাধারণেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং তাঁহার পিতৃ-হৃদয়েও যে অপর সহোদরগণ অপেক্ষা অধিকতর স্নেহপাত্র ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

আবদোল্লার নামে স্ফূর্ত্তি পত্র উত্থিত হওয়ায় আবদল মোত্তালিব বিমর্ষ চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন জন্য আবদোল্লার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক 'কোরবান গাহে' (বধ্যভূমিতে) উপস্থিত হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এই বিষাদ কাহিনী মক্কার সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল। মক্কার অধিবাসিগণ সকলেই স্বীয় দলপতির কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইল এবং আবদোল্লাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে ছলে বলে কৌশলে (যে কোন উপায়েই হউক) রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একযোগে উক্ত বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহারা দৃঢ়তার সহিত আবদল মোত্তালিবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া একযোগে বলিয়া উঠিল,—"আমরা কদাচ আবদোল্লাকে বধ করিতে দিব না, হে আবদল মোত্তালিব! আপনি আমাদের নেতা। যদি আপনি অবিবেচনার সহিত স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকে আজ "কোরবাণী" প্রদান করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেকেই আপনার কার্য্যের অনুসরণ করিতে পারে এবং ক্রমে দেশ মধ্যে এই প্রথার অত্যধিক প্রচলন হইলে আমাদের বংশও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে;—এমন কি, বিলুপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। তদ্ব্যতীত আপনার পুত্রগণের মধ্যে এই পবিত্র মক্কাধামে রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় আবদোল্লা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ স্থানীয়; সুতরাং এ হেন অমূল্য রত্নের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় দানবোচিত ব্যবহার করিলে আমাদের জাতীয় অধঃপতনও অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের নিকট প্রতিশ্রুতি বিধায় যদিও এই কার্য্য আপনার অবশ্য-প্রতিপাল্য হইয়া থাকে, তথাপি ইহা অতীব বিবেচনার সহিত প্রতিপালন করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। আপনি সহজে আমাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিলে আমরা যথাসাধ্য বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইব না।"

এই সময় হেজ্জাজ প্রদেশে একজন সুপ্রসিদ্ধ 'কাহেন'* মহিলা অবস্থিতি করিতেন। এই কাহেন-রমণীর গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী তৎকালিক প্রত্যেক আরব পরিবারের নিকট 'অহি' বা প্রত্যাদিষ্ট বাক্যের ন্যায় 'ধ্রুব সত্য' রূপে পরিগণিত হইত; অর্থাৎ কেহই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিত না।

এতৎকালে জ্বেন্ † (দৈত্য) গণের আকাশ মণ্ডলে উত্থিত হওয়া বা

---

* কাহেন—ভবিষ্যদ্বক্তা।

† জ্বেন্—অগ্নি হইতে সৃষ্ট বাক্‌শক্তি ও বিবেকশক্তি যুক্ত জীব।

ফেরেশতা (স্বর্গদূত) গণের সমীপবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরাদিষ্ট ভবিষ্যৎ ঘটনা-বিষয়ক কথোপকথনাদি করা বা তাঁহাদের স্তবারাধনাদির শ্রবণ ইহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না।

এই কোরবাণী ব্যাপারের প্রতিবাদকারিগণ সকলেই আবদল মোত্তালিবকে সেই দেশবিখ্যাত 'কাহেনের' নিকট গমন করিয়া এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত বিবৃত করত যুক্তি গ্রহণের পরামর্শ দান করিল। তাহারা আরও কহিল যে—এই 'কাহেন' যাহা বলিবেন, বা যেরূপ কার্য্য করিবার পরামর্শ দান করিবেন, তাহা সম্পন্ন করিতে আমরা আপনাকে কোনও রূপ বাধা প্রদান করিব না।

অনন্তর আবদল মোত্তালিব সেই কোরেশদল সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত কাহেন মহিলার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিলেন।

বৃদ্ধা কোরেশ-কুল-পতির মুখে এই ঘটনার সমুদয় কাহিনী অবগত হইয়া কহিলেন,—"আপনারা আগামী কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অদ্য নিশাযোগে 'জ্বেন'দিগকে আমি ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।"

সেদিন আবদল মোত্তালিব আপনার অনুচরগণ সহ বৃদ্ধার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন যথাসময়ে তাঁহারা আবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন বৃদ্ধা আবদল মোত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের দেশে প্রাণ বিনিময়-বিষয়ে কিরূপ প্রথার প্রচলন আছে?" তদুত্তরে কোরেশপতি কহিলেন,—"একটি মানবের পরিবর্ত্তে দশটি উষ্ট্র দান করিবার নিয়ম আমাদের দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া 'কাহেন' আদেশ করিলেন,—"আপনার যে পুত্রটির নামে 'ভাগ্য-পত্র' উত্থিত হইয়াছে, তাঁহার বিনিময়ে দশটি উষ্ট্র নির্দ্দেশ করিয়া উষ্ট্রগুলির ও আপনার পুত্রের নামে স্ফূর্ত্তি আরম্ভ করিবেন। যাবৎ স্ফূর্ত্তি-পত্র উষ্ট্রের নামে না উঠিবে, তাবৎ প্রত্যেক বারেই দশটি করিয়া উট আপনার পুত্রের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি করিতে থাকিবেন। এইরূপে যে বার ভাগ্য-পত্র উষ্ট্রের নামে উত্থিত হইবে, তখন জানিবেন যে, ঈশ্বর ততগুলি উষ্ট্র আপনার পুত্রের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

বৃদ্ধার এবম্বিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আবদল মোত্তালিব ও কোরেশগণ

মহা সন্তুষ্ট হইলেন। আবদল মোত্তালিব উৎফুল্লচিত্তে আরও কহিলেন,—
"যদ্যপি প্রাণাধিক আবদোল্লার জন্য আমার সমুদয় উষ্ট্র গুলিও খোদাতাআলার নামে উৎসর্গ করিতে হয়, তাহাতেও আমি মহাসুখী হইব।"

অনন্তর আবদল মোত্তালিব সদলে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আবদোল্লা ও বহুসংখ্যক কোরেশ সমভিব্যাহারে কাবামন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রথম দশটি উষ্ট্র নির্দ্দেশ করত পূর্ব্বোক্ত মতে স্ফূর্ত্তি করিলেন। সেবার স্ফূর্ত্তিলিপি আবদোল্লার নামেই উঠিল। এইরূপে দশমবারে যখন আবদল মোত্তালিব শত সংখ্যক উষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্ফূর্ত্তি করিলেন, তখন ভাগ্য-পত্র উষ্ট্রের নামে সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে কোরেশগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"হে আবদল মোত্তালিব! এইবার আল্লাহতাআলা আবদোল্লার প্রাণ বিনিময়ে শত উষ্ট্র গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।" তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহো রব্বোল কা'বতে' (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ যিনি কাবামন্দিরের অধীশ্বর,—তদ্ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই) এই পবিত্র 'তক্‌বির' উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন,—যাবৎ আরও অধিকবার স্ফূর্ত্তি-পত্র এইরূপ উত্থিত না হইবে, তাবৎ আমি শত উষ্ট্রেও সন্দেহহীন হইতে পারিতেছি না। এই বলিয়া তিনি আবার স্ফূর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর স্ফূর্ত্তি-লিপি প্রত্যেক বারই উষ্ট্রের নামে উত্থিত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি নিঃসন্দেহ মনে উষ্ট্রগুলি আবদোল্লার পরিবর্ত্তে 'কোরবাণী' প্রদান করিলেন। এই মহা ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হজরত রসুল মকবুল (দং) বলিয়াছিলেন,—"আনাব্নোজ্জবিহ্যায়েণ" অর্থাৎ আমার পিতৃপুরুষগণের মধ্যে দুইজন 'জবিহ্' বা খোদাতাআলার নামে 'উৎসর্গীকৃত' ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, হজরতের (দং) পিতৃদেব হজরত আবদোল্লা ব্যতীত তাঁহার অন্যতর 'জবিহ্' পিতৃপুরুষ নবীবর হজরত ইসমাইল (আ);—যিনি তাঁহার পিতা বণিইসমাইল ও বণিইস্রাইল-কুলের আদিপুরুষ মহানবী হজরত এব্রাহিম (আ) কর্ত্তৃক খোদাতাআলার নামে কোরবাণী (উৎসর্গীকৃত) হইয়াছিলেন।

মোহাম্মদ এব্‌রার আনসারী।

আওরঙ্গজেবের পত্র।

মোগল-শক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাহিনী নানা কারণে স্মরণীয়। এখানে সে চিরপরিচিত কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সেই মহাশক্তিশালী সম্রাট তাঁহার শেষ সময়ে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা যদি কিছুকাল পূর্ব্বে বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামে এখন পর্য্যন্ত হৃৎকম্প উপস্থিত হইত না; তাহা হইলে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহার শাসন প্রণালী পাঠ করিতে হইত না; হতভাগ্য সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়কেও হয়ত অকালে গুপ্ত আক্রমণে আত্মবলি দিতে হইত না। মানুষ মাত্রেরই ভ্রম হয়। যিনি অল্পকাল মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আপনাকে সংশোধন করিতে পারেন, নরসমাজে তিনি পূজনীয়। আওরঙ্গজেব কি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন না? আমরা বলি—পারিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক বিলম্বে। তখন তাঁহার শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছিল; তখন সকল সম্রাটের সম্রাট যিনি, তাঁহার নিকট হইতে 'তলব' আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট—মোগলের দুরদৃষ্ট—হিন্দুর দুরদৃষ্ট!

সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। সে পত্র দুইখানি সকল ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, আজ আমি আওরঙ্গজেবের পত্র কোথায় পাইলাম?

বাঙ্গালী ইতিহাসের আদর জানিত না;—বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। ইতিহাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালী আত্মপরিচয় দিতে পারে না। "বাঙ্গালার ইতিহাস" নাম দিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক যাহা কিছু বলিয়া দেন, তাহাই এখন বাঙ্গালীর ইতিহাস। কিন্তু মোগল-শক্তি যখন ভারতবর্ষে প্রবল, তখন মোগল মোগলের ইতিহাস লিখিতেন। সেই সকল ইতিহাসের ভিতর দিয়া মোগলের জয় পরাজয়, জীবন মৃত্যুর কাহিনী আজ এতকাল পরেও আমরা জানিতে পাইতেছি। সেই সকল কাহিনীর সঙ্গে প্রসঙ্গ ক্রমে হিন্দুর সুখ দুঃখের কথারও অভাব নাই।

"তারিখ-ই-ইরাদত্ খাঁ" একখানি সেইরূপ অতি প্রাচীন ইতিহাস। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনাবসান সময় হইতে ফর্‌রোকসিয়ারের সিংহাসন-বরোহণ কথা পর্য্যন্ত এই ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। ইংরাজ-ইতিহাসের

আদর জানে; তাই কাপ্তান জোনাথন স্কট বিদেশীয় লোক হইলেও বহু পরিশ্রমে 'তারিখ-ই-ইরাদতের' ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

লেখক ইরাদত্ খাঁ সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের 'মীর বক্‌সি' ছিলেন এবং তাঁহার পিতা শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসন সময়ে উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার নিজেও বাদসাহ আওরঙ্গজেবের সময়ে জগ্‌না, আওরঙ্গাবাদ এবং মাণ্ডুর ফৌজদার ছিলেন। ইরাদত্ খাঁ যে কেবল ঐতিহাসিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন।

ইরাদত্ খাঁ একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলিয়া সুপরিচিত। তাঁহারই গ্রন্থে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুইখানি পত্রের উল্লেখ আছে। প্রথম পত্র শাহ আজম শাহের নিকট লিখিত। সম্রাট লিখিয়াছিলেন:—

"তোমার কল্যাণ হউক। আমার প্রাণ তোমার নিকটে যাইয়াই রহিয়াছে। বার্দ্ধক্য আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে। বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা আমাকে চিরপরাভূত করিয়াছে। আমার সকল অঙ্গই এখন শক্তিহীন। আমি অপরিচিতের মত সংসারে আসিয়াছিলাম, অপরিচিতের মতই চলিয়া যাইতেছি! আমি কি, কোন্ কার্য্যের জন্য জন্মিয়াছিলাম,—আমার কোন কথাই আমি জানি না! শক্তি ও সমৃদ্ধিতে যে কাল গিয়াছে, তাহা কেবল শেষের জন্য দুঃখই রাখিয়া গিয়াছে! আমি আমার সাম্রাজ্যের প্রতিপালক এবং রক্ষক হইতে পারি নাই। আমার অমূল্য সময় বৃথাই কাটিয়া গিয়াছে। আমার আপন গৃহেই একজন মঙ্গলেচ্ছু প্রতিপালক (নিজের বিবেক) ছিলেন; কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ বলিয়া আমি তাঁহার পুণ্যালোক দেখিতে পাই নাই। জীবন চঞ্চল।—একবার যে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি, তাহার আর চিহ্ন মাত্রও নাই। ভবিষ্যতের যত আশা ভরসা ছিল, সকলই ফুরাইয়াছে। আমার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু অস্থি ও চর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্য আর কিছুই রাখিয়া যায় নাই। আমার পুত্র (কমবক্স) যদিও বিজয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু এখনও নিকটেই আছে। হে পুত্র! তুমি আমার আরও কাছে আছ। সম্মানার্হ শাহ আলম্ বহুদূরে। ঈশ্বরের নির্দ্দেশ ক্রমেই আমার পৌত্র আজিম-উস্-শান্ হিন্দুস্থানের সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমার সৈন্যসামন্ত এবং পার্শ্বচরগণ সকলেই শঙ্কিত ও সহায় বিহীন,—তাহারা আমারই মত শঙ্কান্বিত ও পারদের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আপন প্রভুর নিকট

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর যে তাহাদের কেহ নায়ক আছে, সে কথা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে।

সংসারে কিছুই আনিয়াছিলাম না,—মানুষের অসংখ্য দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে যাইতেছে না। আমার ভয় হয়, বুঝি আমার মুক্তি লাভ ঘটিবে না। বুঝি আমি অতি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইব। পরমেশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের উপর যদিও আমার চির-নির্ভর আছে, তবুও আমার কর্ম্মের জন্য আমি শঙ্কিত হইয়াছি। যখন সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব, তখন আর চিন্তার লেশ মাত্রও থাকিবে না। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হউক; আমি অকূল তরঙ্গে আমার তরণী ভাসাইয়াছি!

জগদীশ্বর যদিও আমার সৈন্যসামন্তাদি রক্ষা করিবেন, তবু আত্মপ্রকাশ করা আমার তনয়দিগের একান্ত কর্ত্তব্য। পৌত্রকে (বেদারবক্তকে) আমি দেখিতে পাইব না,—এই কষ্টই আমাকে দারুণ পীড়া দিতেছে। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তাহাকে দিও। বেগমকে দেখিয়া মনে হয়, সে নিতান্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরই মানুষের অন্তঃকরণ জানেন, মানুষে তাহা জানে না। রমণীর দুর্লভ চিন্তা কেবল শেষে নিরাশাই আনিয়া দেয়। বিদায়! বিদায়! বিদায়!”

উদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,'এক সময় যিনি ‘দিন দুনিয়ার মালেক’ ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর বেদনা তাঁহার অবসান সময়ে কেমন লেখনীমুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে! আত্মানুশোচনায় তিনি যে কত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ঐ ক্ষুদ্র পত্রখানির অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে। হায়! সম্রাট শেষে যাহা বুঝিয়াছিলেন, যদি সময় থাকিতে তাহা বুঝিতেন!

আওরঙ্গজেবের শেষ পত্রখানি সম্রাট্-পুত্র বাদশাহজাদা কম্‌বক্‌সের নামে লিখিত। তাহা এই :—

“হে পুত্র! আমার অন্তরতম! যদিও ঈশ্বরাদেশে এবং আমার শক্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া আমিও তোমার সহিত কত না কষ্ট সহিয়াছি,—বুঝি পরম পিতার তেমন ইচ্ছা নহে,—তাই তুমি আমার কথা শুনিলে না! আমি অপরিচিত পান্থের ন্যায় চিরদিনের জন্য বিদায় হইতেছি। আমি যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—কিছুই নই,—সেই কথা মনে করিয়া কত বেদনা অনুভব করিতেছি! ইহাতে আর আমার এখন কি লাভ? আমার স্বকৃত পাপ ও অপূর্ণতার ফল

লইয়া আমি এখন চলিয়া যাইতেছি। বিস্ময়কর বিশ্বপতি! আমি একা আসিয়াছিলাম, একাই যাইতেছি। এই সুদূর যাত্রীর পথ-প্রদর্শক আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

আমি দ্বাদশ দিবসকাল যে বিষম জ্বরে ভুগিতেছিলাম, তাহা আর নাই। যেদিকে চাহিতেছি, সেই দিকেই যেন স্বর্গদূতকে দেখিতে পাইতেছি। হায়! আমি আমার নিজের অবস্থা জানি না,—কিন্তু আমার সৈন্য সামন্তদিগের জন্য আমার দারুণ ভয় হইয়াছে। দুর্ব্বলতায় আমার পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়া গিয়াছে;—চরণও আর চলিতে চাহে না,—গতিশক্তি হারাইয়াছি। যে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি, তাহা চলিয়া গিয়াছে,—আমার জন্য এক বিন্দু আশাও আর রাখিয়া যায় নাই! আমি অসংখ্য কুকর্ম্ম করিয়াছি, জানি না কি বিষম দণ্ড আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

বিশ্বপিতা যদিও আমার সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবেন, কিন্তু যাহারা আমার বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতি আমার পুত্রগণের একান্ত যত্নবান্ হওয়া উচিত। আমি যতদিন জীবিত ছিলাম, ততদিন কেহ সে যত্ন লয় নাই। এখন আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি। ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রজাপুঞ্জের প্রতিপালন ভার পরমেশ্বর বিশ্বাস করিয়া পাত্রবিশেষে স্থাপন করিয়া থাকেন। সে ভার আমার পুত্রদের উপর রহিল।

আজমশাহ নিকটেই আছে। যাহারা সিংহাসনের চিরবিশ্বাসী, তাহারা যেন কখনও নিহত না হয়; তাহাদের দুঃখ-দৈন্য যেন আমার শিরে আসিয়া নিপতিত না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিও। আমি যখন যাইতেছি, তখন তোমাকে, তোমার জননী ও সন্তানকে পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণা পলকে পলকে আসিয়া আমারে আকুল করিতেছে।

বাহাদুর শাহ যেখানে ছিল, এখনও সেই স্থানেই আছে। তাহার পুত্র হিন্দুস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বেদার বক্ত গুজরাটেই আছে। হায়াত্-উন্-নিসা দুঃখ কাহাকে বলে জানিত না, কিন্তু সে এখন শোকবিহ্বলা। জানিও বেগম উদ্বেগহীনা। তোমার জননী উদয়পুরী আমার রোগশয্যা সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালেও আমার সঙ্গেই যাইতে চাহেন; কিন্তু সকল কর্ম্মই আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়।

দাস দাসী, এবং সভাসদ্‌গণ যতই কেন প্রতারক হউক না, কখনই তাহা-

দিগের প্রতি কুব্যবহার করিও না। কৌশল এবং নম্র ব্যবহার তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে।

* * * *

আমি চলিলাম। সৎ এবং অসৎ, আমি যে কার্য্যই করিয়াছি, তাহা কেবল তোমাদেরই জন্য। আমি তোমার প্রতি যে সকল অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হও, তাহা হইলে পরকালে সে সকল কর্ম্মের জন্য আর আমাকে দায়ী হইতে হইবে না।

কেহই আপনার প্রাণ বহির্গত হইতে দেখে নাই, কিন্তু আমি তাহা দেখিতেছি!"

মহাশক্তিশালী নরপতির করুণ লিপি যুগ যুগান্তরের পর পাঠ করিয়া আমরা আর কি বলিব? আমরা শুধু বলিব,—"হায় সম্রাট! তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক। আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই ভ্রাতা তোমার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিব। তাই আমরা আবার গলাগলি ধরিয়াছি।"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

হজরত মোহাম্মদ বোখারী (রহঃ) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

আমাদের পবিত্র হাদিস শাস্ত্রের অন্তর্গত বহু গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন ছয়খানি গ্রন্থ নিতান্ত প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থাবলীকে "সেহাসেত্তা" অর্থাৎ 'ষট্ সহি গ্রন্থ' বলে। যথাঃ—(১) সহি বোখারী; (২) সহি মোস্লেম; (৩) আবুদাউদ; (৪) তিরমিজী; (৫) সহি নেসাই; এবং (৬) সহি সননে এবেনমাজা। হজরত মোহাম্মদ বোখারী (রহঃ) সাহেবই প্রথমোক্ত 'সহি বোখারী হাদিসে'র প্রণেতা। হাদিস শাস্ত্র বিশারদ হজরত বোখারী (রহঃ) সাহেবের সম্পর্ক-গত নাম 'আবু আব্দুল্লা' (আব্দুল্লার পিতা)। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ; পিতার নাম এস্মাইল; পিতামহের নাম এব্রাহিম; প্রপিতামহের নাম মোগয়রা এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম বর্জ্জেজ্। এই মহাত্মা

বোখারাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'বোখারী' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার কৃত হাদিস গ্রন্থও "বোখারী" নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইনি আবার 'জোফী' নামেও পরিচিত। ইঁহার প্রপিতামহ মোগয়রা অগ্নি-পূজক ছিলেন, তিনি তদানীন্তন বোখারার শাসন-কর্ত্তা ইমাম জোফী-কর্তৃক এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধেই লোকে হজরত বোখারীকে 'জোফী' বলে। হজরত বোখারী হাদিসতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিত-কুলের অগ্রণী ছিলেন। "আমিরোল মোমেনিন ফিল হাদিস", "নাসেরোল আহাদিসোন্নবুওত" এবং "নাসেরোল ও মওয়ারিসোল মোহাম্মদীয়" এই কয়েকটি উচ্চ উপাধিও তাঁহার ছিল। দ্বিতীয় সহি হাদিস গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ হজরত মোস্‌লেম যখন হজরত বোখারীর নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার পদ চুম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই নীল নভো-মণ্ডলের নিম্নে হজরত বোখারী অপেক্ষা হাদিস-তত্ত্বজ্ঞ লোক কেহই নাই। সমগ্র হাদিস শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠাগ্রে বিরাজ করিত। অনেকে বলিয়াছেন, হজরত বোখারী ভূতলে ঈশ্বরের এক অলৌকিক নিদর্শন। তদানীন্তনকালে হাদিস শরিফ আবৃত্তি করা ও তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া এবং শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করা বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সৌম্য প্রকৃতি, প্রচুর জ্ঞান, প্রভূত বৈরাগ্য, একান্ত নিষ্ঠা, হাদিসের প্রণালী ও মূলতত্ত্বে সাতিশয় অভিজ্ঞতা, প্রকৃত সাধন-শক্তি, মূল তত্ত্ব হইতে তাহার শাখা প্রশাখা নির্ব্বাচন-দক্ষতা তাঁহার যেমন ছিল, এরূপ আর কাহারও ছিল না। হজরত বোখারী শৈশবকালে অন্ধ হইয়া ছিলেন; পরে দৈবানুগ্রহে অলৌকিকরূপে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হাদিস আয়ত্ত করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যে তিনি বহু উচ্চ উচ্চ গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার গর্ভধারিণীকে এবং তাঁহার ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া 'হজ' করিবার জন্য পবিত্র মক্কা-মোয়াজ্জমাতে চলিয়া যান। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হজরত রসুলে করিমের (আলাঃ) পারিষদ ও সহচরবর্গের মাহাত্ম্য-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপর মদিনা-মনোয়ারাতে হজরতের পবিত্র রওজা মবারকের নিকটে বসিয়া "তারিখে কবির" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিশাকালে চন্দ্রালোকের সাহায্যে লিখিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি হাদিসে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দুইবার তুরস্ক দেশে ও চারি-

বার মিসরে গিয়াছি; ছয় বৎসর হেজাজে স্থিতি করিয়াছি। হাদিসতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কয়বার যে কুফা নগরে ও বোগদাদে গিয়াছি, তাহা গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। প্রায় এগার শত লোকের নিকটে আমি হাদিস শ্রবণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।" হজরতের পরবর্ত্তী অনুগামী পঞ্চম পুরুষের অন্তর্গত লোক সকল হাদিসে তাঁহার শিক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার অনেক ছাত্রও ছিলেন। বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গেও তিনি সর্ব্বদা হাদিসের বিষয় চর্চ্চা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :—"আপন অপেক্ষা উচ্চ ও আপনার তুল্য এবং আপন অপেক্ষা কনিষ্ঠ লোকের নিকট তত্ত্ব সংগ্রহ না করিলে কেহ হাদিস-বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শী হইতে পারে না।" হাদিস শাস্ত্রকার হজরত মোস্‌লেম, এব্নে মরিম ও ফরফরী প্রভৃতি বোখারী হইতে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রায় লক্ষ লোক তাঁহা হইতে হাদিস সম্বন্ধীয় তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হজরত বোখারী (রহঃ) সাহেব পৈতৃক প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ অনাসক্ত, বদান্য ও মুক্ত পুরুষ ছিলেন যে, তৎসমুদায় বিষয় বিবিধ সৎকার্য্যে ও দীন দুঃখীদিগের সেবাতে এবং হাদিস শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের অভাবমোচনে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় অল্পাহারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপকরণশূন্য সামান্য রুটী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়িলে চিকিৎসক বলেন যে, শুষ্ক রুটী ভক্ষণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে বহু বাধ্য-বাধকতায় তিনি রুটীর সঙ্গে একপ্রকার শরবৎ ব্যবহার করিতে থাকেন। কথিত আছে যে, একবার তিনি নামাজে প্রবৃত্ত ছিলেন, এমন সময়ে বোলতা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ হুলাবাত করে। কিন্তু তিনি সেই বেদনা বোধ করিয়াও নামাজ পরিত্যাগ করেন নাই। হজরত বোখারী (রহঃ) সাহেব 'সহি বোখারী শরিফ' ব্যতীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ বোখারী যখন দেশ পর্য্যটন, সাধুসঙ্গ ও বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া স্বীয় জন্মভূমি বোখারাতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বোখারা নিবাসিগণ ক্রোশাধিক পথ দূর হইতে তাঁহাকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া বহু সম্মান ও অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করেন। সেই অভ্যর্থনা ভূমিতে তাঁহার জন্য বস্ত্রবেশ্ম সকল স্থাপিত ও বহু দীন দুঃখীদিগকে ধন বিতরণ করা হইয়াছিল। এ সময় যে কিছু কাল তিনি বোখারাতে বাস করেন, অধিকাংশ সময়ই হাদিস

ও শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরে বোখারার শাসনকর্ত্তা কতিপয় বিদ্বেষ-পরায়ণ স্বার্থপর অনুজীবীর পরামর্শানুসারে তাঁহার সভায় সহি গ্রন্থ ও তারিখে কবির পাঠ করিবার জন্য হজরত মোহাম্মদ বোখারীকে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি প্রেরিত দূতকে বলেন :—"আমি স্বর্গীয় বিদ্যার অবমাননা করিব না। মানুষের দ্বারে তাহাকে লইয়া যাইব না। যদি রাজ প্রতিনিধির জ্ঞানের কোন প্রয়োজন থাকে, তবে আমার মস্‌জেদে বা আমার আলয়ে কিম্বা আমার নিকটে তাঁহারই আগমন করা কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ বলেন, বোখারার শাসনকর্ত্তা লোক পাঠাইয়া হজরত বোখারীকে এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, 'এক বিশেষ সভা করা যাইবে; তাহাতে তিনি ও তাঁহার সন্তানগণ মাত্র থাকিবেন। হজরত বোখারী সাহেব আসিয়া তাঁহাদিগকে হাদিস শুনাইবেন।' তিনি তদুত্তরে জ্ঞাপন করেন যে, "অন্য সকল লোককে পরিহার করিয়া কয়েকটি বিশেষ লোককে হাদিস শুনাইতে কোন সভায় আমি যাইতে প্রস্তুত নহি।" এই কথা শ্রবণে বোখারার শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং আদেশ করেন যে, "এস্‌মাইলের পুত্র মোহাম্মদ বোখারা হইতে বহিষ্কৃত হউক।" তন্মতে অবিলম্বে তিনি বোখারা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। একমাস কাল অতীত না হইতেই সাধুর অবমাননা-কারী সেই শাসনকর্ত্তা স্বীয় পাপের প্রতিফল লাভ করিলেন। বাদ-শাহের আজ্ঞা ক্রমে তিনি কর্ম্মচ্যুত ও গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার পারিদষবর্গও বিশেষ শাস্তি লাভ করেন। হজরত বোখারী বোখারা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ সমরকন্দে পঁহুছিলে তথাকার অধিবাসি-গণ তাঁহাকে সমরকন্দে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। তিনি এই পত্র পাইয়া সমরকন্দের দিকে যাত্রা করেন। সমরকন্দের সন্নিহিত খোতন নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমরকন্দবাসীদিগের মতভেদ হইয়াছে। তিনি এই অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হন এবং খোতন গ্রামে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিয়া ভাবগতিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সবিশেষ জানিতে পারিয়া একেবারে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। একদিন নৈশিক নামাজের পর এরূপ প্রার্থনা করেন যে, "ধরাতলের বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার সম্বন্ধে ইহা অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়াছে। হে ঈশ্বর! এক্ষণ তুমি আমাকে ইহ লোক হইতে গ্রহণ কর।" তৎপর তিনি কিছু দিনের মধ্যেই পীড়িত হন

ও প্রাণত্যাগ করেন। হজরত বোখারী হিজরী ১৯৪ সালে শওয়াল মাসের ১৩ই কি ১৬ই তারিখ শুক্রবার আসরের নামাজের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও হিজরী ২৬৫ সালে শওয়াল মাসের ১লা তারিখ শনিবার ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন।

শেখ জমিরুদ্দীন।

উচ্ছ্বাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

(৭১)

মূর্খ ঘৃণ্য ছিল যা'রা, তা'রা বিশ্ব করিল উজ্জ্বল ;
উড়াইল জলে স্থলে ইস্‌লামের পতাকা চঞ্চল।
আরব আজম হ'তে দেবদেবী হ'ল অন্তর্হিত ;
উদ্ধারিল তরীদল ছিল যাহা হয়ে নিমজ্জিত।
ঘোষিল ত্রিলোক জুড়ি একত্বের গভীর সম্বাদ ;
"এক ভিন্ন দুই নাই" ঘরে ঘরে উঠিল নিনাদ !

(৭২)

মহাপাপী ছিল যেই, সে-ও, হ'ল পুণ্যের পাগল ;
অধর্ম্ম আঁধার-স্থলে পড়ে গেল ঘোর কোলাহল !
নিবিল পাবককুণ্ডে শতাব্দীর জলন্ত অনল ;
যাবতীয় পীঠস্থানে ধূলিরাশি উড়িল প্রবল !
শুধু র'ল মক্কা গৃহ একমাত্র মুক্তির আলয় ;
পূত পরিস্কৃত হয়ে একত্র হইল সমুদয়।

(৭৩)

খৃষ্টান তা'দের কাছে বিদ্যাবুদ্ধি করিল গ্রহণ ;
চরিত্রের পবিত্রতা শিখে' নিল তত্ত্বদর্শী জন।
নীতিশিক্ষা করিলেক চিরভ্রান্ত সাফাহানিগণ ;
অগ্নি-উপাসকবৃন্দ মানি নিল সে সব বচন।
মূর্খতার ক্ষীণ সূত্র ছিন্ন হ'ল প্রতি হিয়া হ'তে ;
আর না আঁধার র'ল সংসারের একটি ঘরেতে !

(৭৪)

আরাস্তর * মৃত শিল্প নব প্রাণ লভিল আবার ;
স্বর্গগত আফ্‌লাতুন † ফিরে এ'ল মরত মাঝার।
প্রতি পল্লী. প্রতি দেশ হ'ল যেন য়ূনানের মত ;
শিল্প-চর্চ্চা. জ্ঞানার্জ্জনে বিশ্ববাসী হ'ল উদ্দীপিত।
সংসারের চক্ষু হ'তে খসিল রে মোহ যবনিকা ;—
জাগিল জগৎবাসী,—সত্য-তেজ রহে কি গো ঢাকা ?

(৭৫)

প্রতি সুরালয় হ'তে ভরি' নিল অপূর্ণ পেয়ালা ;
প্রতি ঘাটে জল পিয়া নিবারিল হৃদয়ের জ্বালা।
বিমুগ্ধ পতঙ্গ সম ঝাঁপ দিল আলোর ভিতর ;
আঁচলে বাঁধিল যত্নে নবীর এ আজ্ঞা মনোহর।—
—"শিল্প ও বিজ্ঞানে জেনো মহামূল্য পরশ রতন ;
যেখানে পাইবে তাহা তুলে নিবে ভাবি নিজধন।" ‡

(৭৬)

লভিতে তাবৎ বিদ্যা, অপরূপ অনন্ত কৌশল
অতি ব্যগ্র হ'ল তারা ; উন্নতিও হইল প্রবল।
চরিত্র-সৌরভে যেন বিমোহিত হইল সংসার ;
পর্য্যটনে খ্যাতি লাভ করিলেক ধরায় অপার।
প্রতি দেশে প্রতি গ্রামে সংখ্যাহীন বিস্তৃত বসতি ;
জগৎ তা'দের কাছে শিখিল রে বাণিজ্যের নীতি।

* গ্রীসের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Aristotle। খৃঃ পূঃ ৩৮৪ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি আলেকজেণ্ডারের শিক্ষক এবং মহামতি প্লেটোর শিষ্য। খৃষ্ট জন্মের ৩২২ বৎসর পূর্ব্বে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

† নিবাস—য়ূনান রাজধানী। ইনি সোক্রাতের (Socrates) শিষ্য ও একজন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। খৃষ্ট জন্মের ৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ৮১ বৎসর বয়সে ইনি লোকান্তরিত হন।

‡ একটি হাদিসের অনুবাদ।

(৭৭)

নির্জ্জন পতিত ভূমি জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল ;
সুখের সখের তরে কত কি যে সামগ্রী সৃজিল।
ভীষণ সঙ্কটময় ছিল যেই পর্ব্বত প্রান্তর,
বিহার-উদ্যান সম আজি তাহা হ'ল তৃপ্তিকর।
চির স্থির যে বসন্ত মর্ত্ত্যালোক করেছে উজ্জ্বল,
সৌন্দর্য্য-সম্পদ তা'র তাহাদেরি আয়াসের ফল।

(৭৮)

এই যে সরল পন্থা শোভাময় মানস-মোহন, *
দু'টি ধারে ছায়াতরু সারি সারি কর বিলোকন।
পথের মাপক চিহ্ন, ভগ্ন স্তূপ, কূপ, পান্থাবাস,—
এ সব তা'দেরি কৃত ;—অস্তিত্বের কঙ্কাল বিকাশ!

(৭৯)

ভ্রমণের মত প্রিয় আর কিছু ছিল না তা'দের ;
জল স্থল তাই তা'রা ভ্রমিয়াছে বিশাল বিশ্বের। †
সিংহলে ‡ নিবাস যার বারবারাতে § বাসা ছিল তার,
স্বগৃহ ভাবিত তা'রা যথা তথা প্রান্তর পাহাড়।

(৮০)

এখনো ভুলেনি বিশ্ব তাদের সে ভ্রমণ কাহিনী ;
জগতের বক্ষঃ হ'তে এখনো সে পদাঙ্ক মুছেনি।

* প্রসিদ্ধ সম্রাট শেরশাহ তাঁহার পাঁচ বৎসর স্থায়ী রাজত্বকালে একটি সুদীর্ঘ ও মনোরম রাজপথ নির্ম্মাণ করান। পথের ধারে ধারে প্রত্যেক ৭ ক্রোশ অন্তর এক একটি পান্থশালা নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কূপ, উপাসনালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক উপাসনাগৃহে এমাম, মোয়াজ্জেন প্রভৃতি নিযুক্ত হন এবং পান্থশালা মাত্রেই সকল জাতীয় পথিকের সুবিধার জন্য হিন্দু মুসলমান কিঙ্কর নিযুক্ত করা হয়। পথের ধারে মাইল চিহ্নও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

† অর্থাৎ এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তাহারা প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

‡ এলব্বার এবং সিংহলে এখনও আরবজাতির বংশাবলী আছে।

§ বিশ্ববিখ্যাত সাহারা মরুভূমির উত্তর দিকে এই বার্ব্বরা ষ্টেট্ অবস্থিত। সাহারার বিস্তৃতি ৩০০০ মাইল।

এখনো মালয় দেশে মহিয়সী কীর্ত্তি বিদ্যমান ;
কাঁদিছে তাদের লাগি' এলব্বার হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
তাদেরে স্মরণ করি হিমাচল ফেলে নেত্রজল ;
দুর জিব্রালটর * শৈলে আছে স্মৃতি স্থির অবিচল।

(৮১)

জগৎ জুড়িয়া ছিল তাহাদের কীর্ত্তি অগণন ;
পৃথিবী তাদের স্পর্শে হয়েছিল নন্দন কানন।
আরব, মিশর, শাম, ওয়েল্স † কি স্পেন, হিন্দুস্থান
এখনো আকুল কণ্ঠে গাহিছে তা'দের জয়গান।
আদম পর্ব্বত ‡ হ'তে অতিদূর বয়জা মহীধর ;—
যেথা যাবে নেহারিবে তাহাদের চিহ্ন স্ফুটতর।

(৮২)

মর্ম্মর-মণ্ডিত সেই শুভ্র সৌধ কারুকার্য্যময়,—
কাঞ্চন নির্ম্মিত তুঙ্গ সমাধির গুম্বজ নিচয়,
পবিত্র ভজন-গৃহ শান্তিমাখা একত্ব নিলয়
যদিও নাহিরে আজ,—মিশে গেছে অকালে ধূলায় ;
তথাপি বিশাল বিশ্বে নাহি হেন নিরজন স্থান,
যেখানে মোস্লেম কভু পদধূলি করে নাই দান।

(৮৩)

নন্দন কানন-সম স্পেন § যেন ভরিল হাসিতে ;
এখনো সে দীপ্ত কীর্ত্তি ইচ্ছা হয় পার গো দেখিতে।

---

* জিব্রালটরকে আরবগণ জব্লে তারেক ও জব্লে ফাতাহ্ বলেন। আবু-আব্দুর রহমান মুসা বেন্-নসির যখন স্বীয় দাসকে স্পেন যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তখন সে সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে উপনীত হয়।

† গিলানের অন্তর্গত একটি পার্ব্বত্য প্রদেশের দক্ষিণাংশে এই ওয়েল্স অবস্থিত। ইহা প্রথমে পারস্যের সীমান্তর্গত ছিল, এক্ষণে রুশিয়ার অধীন।

‡ লঙ্কার যাবতীয় পর্ব্বতের মধ্যে এই আদম শৃঙ্গ বা আদম পর্ব্বত উচ্চ।

§ স্পেন রাজ্য সুদীর্ঘ ৭০০ শত বৎসর মুসলমানগণের করতলগত ছিল।

বয়েত হাম্‌রার (১) মুখে এখনও লাগা এ বচন,—
"আদনান বংশজগণ (২) দেহ মোর করেছে গঠন।
জগতে আমিই একা বুকে ল'য়ে চিহ্ন আরবীর
অতীত গৌরব সুখে দাঁড়াইয়া আছি উচ্চশির।"

(৮৪)

গ্রাণাডার (৩) গুণে হ'ল তাহাদের গৌরব বিকাশ ;
বল্‌নাসিয়ার (৪) দ্বারা অন্তহীন কৌশল প্রকাশ।
মহত্ব, ধীরত্ব, বীর্য্য বাতালুস (৫) করিছে স্মরণ ;
কাদেস (৬) তাদের লাগি এখনও করিছে ক্রন্দন।
অস্তমিত ভাগ্যরবি হইয়াছে আস্‌বেলিয়া (৭) ভূমে ;
কর্ডোভা (৮) কাঁদিছে হায়! তবু ভাই রলে ঘোর ঘুমে ?

(৮৫)

দেখ ভাই! ফিরে দেখ কর্ডোভার সৌন্দর্য্য সুন্দর ;
দেখ উপাসনা-গৃহ আজো আছে ভেদিয়া অম্বর !
দেখ ধনী হেজাজীর রত্নময় প্রমোদ প্রাসাদ ;
হায়! কেন ভেঙ্গে গেল অকালে সে অফুরন্ত সাধ ?

(১) এই বিশাল অট্টালিকা গ্রাণাডার মুসলমান জাতির স্মরণীয় ও উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ। খোলাফায় বণি ওর্ম্মিয়া হইতে দ্বিতীয় খলিফার রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়, এবং অষ্টাদশ খলিফার রাজত্বকালে স্পেনবাসিগণ মুসলমানদিগের নিকট হইতে ইহা হস্তগত করেন।

(২) বনি ওম্মিয়া ও বনি হাসেম সকলেই আদ্‌নানের বংশধর। এজন্য খোলাফায় বনি ওম্মিয়া অর্থাৎ স্পেনের খলিফাদিগকে 'আলে-আদনান' বলা হয়।

(৩) গ্রাণাডা স্পেনের একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর। আবু আলী ওমর বেন মোহাম্মদ সল্‌বিনি এলি নামক একজন বিখ্যাত আরব্য ব্যাকরণবিৎ এই নগরের অধিবাসী।

(৪) স্পেনের পূর্ব্ববিভাগে একটি নদনদী-পুষ্পোদ্যান শোভিত মনোহর নগর।

(৫) কর্ডোভার উত্তর পশ্চিমে ৬ দিনের পথ। এই নগরে মহাত্মা মত্‌ওয়াকাল এব্‌নে ওমর আকতস্‌ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান। এই অট্টালিকার উদ্দেশে মহাকবি এব্‌নে ফলাস কতকগুলি মনোহর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(৬) স্পেন রাজ্যের অন্তর্গত জফাক নদীর নিকটবর্ত্তী ১২ মাইল দীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

(৭) আল্‌বেলিয়া স্পেন রাজধানীর অন্তর্গত এবং কর্ডোভা হইতে ৪ দিনের পথ।

(৮) কর্ডোভা স্পেনের প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড নগর। ওম্মিয়া বংশের রাজত্বকালে এই নগরে ১৬০০ মসজিদ, ৯০০ হাম্মাম, ৫০টি চিকিৎসালয় এবং ৮০টি মাদ্রাসা বর্ত্তমান ছিল।

দেখ সেই খেলাফত্ কালক্রমে কি হয়েছে এবে !
হায় ! হায় ! কোন্ প্রাণে এ দুর্দ্দশা নেহারিব তবে ?
অন্ধকার খনি মাঝে কলঙ্কিত কাঞ্চনের মত
আজি বিশ্বে তাহাদের শিল্পজ্ঞান অযত্ন-লাঞ্ছিত !

(৮৬)

নিসর্গ জিনিয়া অই জগতের গৌরব কেতন
গরিষ্ঠ বাগ্দাদ ভূমি সুপবিত্র জ্ঞান-নিকেতন ! *
জলে স্থলে একদিন যার মুদ্রা ছিল প্রচলিত ;
আব্বাসীর কীর্ত্তিরাশি যেইখানে গৌরবে হাসিত ;
আরব যাহারে হেরি সসম্ভ্রমে হ'ত নতশির ;
আজি তা' শ্মশান-সম, চূর্ণ লুপ্ত রতন-মন্দির !
অহঙ্কার বায়ুসনে উড়ে গেছে জন্মের মতন ,
ভাসাইয়া লয়ে গেছে তাতারের তরঙ্গ প্লাবন !

শেখ ফজলল করিম ।

কবিতা কুঞ্জ ।

মত-ভেদ ।

সকলে তোমায় পূজে ; তবে কেন নাথ !
পরস্পরে ঘটে হেন অসূয়া বিবাদ ?
কেন ঘনাইয়ে আনে বৃথা পরমাদ
ক্ষুদ্র আয়ু পলে পলে করি অতিপাত ?
নিশিদিন ধরণীর লক্ষ দিক হ'তে
লক্ষ নদী ছু'টে চলে সাগর সন্ধানে,
তারা কিগো দেয় ব্যথা পরস্পর প্রাণে
সাধনা উজ্জ্বল দীর্ঘ অভিসার পথে ?
সে নির্ম্মল ঐক্য-তান, মুক্ত ভালবাসা
দেখিতে না পায় কেন বিশ্ব নরনারী ?
যেথায় হইবে তৃপ্ত সর্ব্ব সাধ-আশা,
তুচ্ছ মত নিয়ে সেথা করে কাড়াকাড়ি !
নানা বর্ণে নানা গন্ধে কুসুম-নিচয়
একই উদ্যান নাহি করে শোভাময় !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

* ১৩২ হিজরী হইতে ৬৫৬ হিজরী পর্য্যন্ত বোগ্দাদ নগর আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের রাজধানী ছিল। এই নগর এরাকে আরবের মধ্যে দজ্জলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।

স্মরনারী।

করি মনে অনুভব মনোভব-আগমন
সাজি রতি, পতিতরে বিহরে।
প্রেম-যমুনার তীরে ধীরে বহে সমীরণ;
পুলিন-কানন তাহে শিহরে।

বাসনা-কুসুমেবালা মালা গাছি গাঁথিছে,
আঙুলে হিঙ্গুল রং ফুটিছে।
কভুবা খোঁপাটি খুলে ভুলে চুল বাঁধিছে,
কভু বেণী পড়ি পাঠে লুটিছে।

কভু কেলি-মন্দির মঞ্জীর-নিনাদে
অবিরত মুখরিত করিছে।
যদিবা আলস-রসে খসে বাস অবাধে
ভাবি, নীবি চারু-করে ধরিছে।

কভু করতলে আঁখি ঢাকি, ধ্যানবলে সে
স্মরি স্মরে ভরে মনে ভাবনা।
কভু"ঐ এলো"বলে এলো চুলে চলে সে;
প্রীতি-সুখে সহে পথে যাতনা।

আমরি! রতির তনু অতনুর সাধনায়
হয় যত অবিরত দলিত,
ততযেন মন-লোভা শোভা ফোটেবেদনায়
সে সুচারু ছবি আরো ললিত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কবির কুটীর।

এ নহে শুভ্র মেঘ-চুম্বিত—
সৌধ নয়নানন্দ
জন-সঙ্কুল মহা নগরীর বক্ষে;
সেথা নাহি জ্বলে বিদ্যুদালোক,
নাহি সঙ্গীত ছন্দ—
বীণা-ঝঙ্কার-মুখরিত প্রতি কক্ষে!

নাহি সেথা কোন ধন সম্পদ
রাজ ভাণ্ডার তুল্য;—
শুনিয়াছি সেথা নাহি বিরাজেন লক্ষ্মী;
সে যে নির্জ্জন জীর্ণ কুটীর—
নাহি কিছু তার মূল্য,
চৌদিকে তার চীৎকারে শত পক্ষী!

কিন্তু সেথায় বসে বসে কবি—
কল্পনা-যোগ-মগ্ন—
বিশ্ব পাসরি ভাব-বিহ্বল চিত্তে;—
মুহূর্ত্ত মাঝে স্বর্গ তোরণ—
মন্ত্র কুহকে নগ্ন
মুগ্ধ হৃদয় সুর-কিন্নর-নৃত্যে!

সেথা আসি নামে নব নন্দন
মন্দার-সমাকীর্ণ,—
বসন্ত আসে বহি শত সুধা-গন্ধ!
কিন্নরী কুল মণিময় বীণা—
ঝঙ্কারি অবতীর্ণ;
জাহ্নবী-ধারা বহে-অতি মৃদুমন্দ!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

পশ্চিমধারের বসতিকে কর্‌থ এবং পূর্ব্বধারের বসতিকে আসকর-মেহদি ও রহাফা বলা হয়। ইহার পশ্চিমে দ্বীপ (ফোরাত নদীর মধ্য ভাগ) এবং পূর্ব্বদিকে এরাকে আজম। কাদিসিয়া, কুফা; বাগ্দাদ, মাদায়েন, বাবল, নহ্‌রে ওয়ান্ ওয়াস্তা ও বসরা ইহার প্রধান নগর।

অশ্রুমতী।

মানবের নয়নের অশ্রুবিন্দু সম
কোমল তরল অতি, অতি সুমধুর
বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে আছে নিরমম
সকরুণ মুখখানি বালিকা বধূর।

পিতার ভবন হ'তে শ্বশুর ভবন
পথখানি চির সিক্ত অশ্রুর ধারায় ;
উভয় সঙ্কট মাঝে চির আকিঞ্চন
হাসি তার অশ্রু মত করুণ দেখায়!

ক্ষুদ্র সেফালীর চারা কোণে আঙ্গিনার
অতি অপ্রতিভ যেন বিষাদে লজ্জাতে!
সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত ফুল প্রত্যহ প্রভাতে
অশ্রুসিক্ত হাসি মত ঝরে অনিবার!

ওরি মত অতি ক্ষুদ্র, অতি বিমলিন
সুতরল অশ্রুপূর্ণ দুইটি নয়ন,—
নিশিতে আঁধার কক্ষে যাহা চিরদিন
দেখা যায় সমুজ্জল আনন্দ মতন!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নীরব প্রেম।

(Longfellowর "Silent Love" পাঠে)

চাও যদি ভালবাসা হও গো নীরব!
ভালবাস প্রাণ দিয়ে
কথাটি নাহিক ক'য়ে
জীবন, যৌবন ধন সঁপে দিয়ে সব।
নীরব প্রণয়ে শুধু
মিলিবে প্রেমের মধু
শান্ত উন্মাদনাহীন বিমল সৌরভ!

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিন্তা।

সন্ধ্যার কোমল চারু হেমাভ কিরণ
গিয়াছে নিবিয়া এবে পশ্চিম গগনে ;
নিশার তিমির নামি' আসিছে এখন
গ্রাসিতে বিশাল ধরা অতি সন্তর্পণে।

আজিকার মত করি খেলা সমাপন
ছেলেরা গিয়াছে গৃহে ; স্তব্ধ নীরবতা
বসিয়াছে আবরিয়া ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ ;
পথে ঘাটে নাহি আর কোথাও জনতা।

ছাড়ি শূন্য বনভূমি বিহঙ্গমগণ
আশ্রয় নিয়াছে উচ্চ অশ্বত্থ শাখায়
প্রকৃতির সুশোভিত বন উপবন
ঢাকিয়া ফেলিছে ধীরে ঘন কালিমায়।

একাকী বসিয়া আজ চিন্তাকুল চিতে
ভাবিতেছি এমনি গো নীরব সন্ধ্যায়
এ জীবন রঙ্গভূমে নিতান্ত অজ্ঞাতে
পড়িবে মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা হায়।

শেখ ফজলল করিম।

মৃত্যু।

ছিল স্ফুট দিবসের আনন্দ আলোক
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গের মধুর ঝঙ্কার ;
ছিল লুব্ধ মধুপের আকুল গুঞ্জন
কম দেহ-কাননের ঘেরি চারিধার!
নিবে গেল, নিবে গেল, নিবে গেল দীপ
অমানিশা অন্ধকারে ছাইল ভুবন ;
কিছু নাই—অন্তহীন নীরবতা মাঝে!
মিশে গেল অন্তিমের নিশ্বাস পবন!
সুপ্তি আসি' পক্ষপুটে ঢাকিল জীবন ;
মায়া রাজ্যে মহাশান্তি পাতিল আসন!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিসর্জ্জন।

(৪)

ক্রমে অন্ধকারের যবনিকা ধরণীতল গ্রাস করিয়া ফেলিল। হতাশ হৃদয়ে সরযূ তীরে উঠিয়া সোপান অবলম্বনে বসিয়া পড়িল। বসিয়া কত কথা ভাবিল, কত চিন্তা করিল ; কত সময় চলিয়া গেল, কেহ আসিল না। আর যে সময় নাই, কাল সরযূ পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। তাহার বাবা তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। সরযূ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দ্বিতীয় বার সে মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইল না।

বিশেষ অনুসন্ধানের মধ্যে সরযূ প্রতিদিন অপরাহ্নে বাগানের পুকুরপাড়ে সে মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুসন্ধান কেমন করিয়া করিবে? কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইলে সে কিরূপে জিজ্ঞাসা করিবে, কি বলিয়াই বা পরিচয় দিবে? তাই সে নিজ অভিজ্ঞতার শেষ সীমা পুকুরপাড় পর্য্যন্ত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপন যত্নে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে। কিন্তু কই? যাহা একবার আসিল তাহা আর তো আসিল না। তাই অনেক ভাবনার পর সরযূ স্থির করিল, হয়ত যুবক এ গ্রামের বা এ দেশের কাহারও কিছু নয় ; ভ্রমণকারী পথিক মাত্র। কিন্তু সে যে-ই হউক, আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাহাকে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে স্থান দান করিয়াছি, আজীবন তাহার ধ্যান করিব। আবার সরযূর মন চঞ্চল হইল ; সহসা আর একটা চঞ্চল বৈদ্যুতিক স্পর্শ আসিয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া ফেলিল। যদি সে যুবক তাহার স্বধর্ম্মপরায়ণ বা তাহার স্বজাতীয় কেহ না হয়, কিংবা সম্বন্ধ ঘটনশীল না হয়, কিংবা যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হয়! না হয়, চিরজীবন তাহার ধ্যান করিব। তাহার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া চিরজীবন যাপন করিব। হঠাৎ সরযূ শিহরিয়া উঠিল। পশ্চাৎ হইতে কে তাহার চুল ধরিয়া টানিল। সরযূ ফিরিয়া চাহিতেই সে মূর্ত্তি অন্ধকারে মিশিয়া গেল। সরযূ তাহার পদানুসরণ করিল।

(৫)

নলিনীর বিবাহ। নলিনী বাড়ী আসিয়াছেন, হেম আসেন নাই। তিনি পারিলে বিবাহের দিন আসিবেন। পাঠক! এ প্রস্তাবনাটা যেন কেমন

কেমন বোধ হইল না কি? হেম নলিনী যমজ ভাই। তবে কেবল নলিনীর বিবাহ কেন? হেমের অপরাধ কি? অপরাধ হেম পিতৃপিণ্ড প্রয়োজনে রক্ষিত; কাজেই দরিদ্র। নলিনী জ্ঞাতি পিতৃব্যের ঔর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্যের জন্য জনক-জননী কর্ত্তৃক বিক্রীত বা পরিত্যক্ত; কাজেই অবস্থাপন্ন। কাহারও পিতা বর্ত্তমান নাই। কাজেই উপযুক্ত পুত্রের বিবাহের জন্য মাতা সম্পূর্ণ দায়ী, বিশেষতঃ অবস্থাভেদে। এমন স্থলে দত্তকপুত্র নলিনীর স্বার্থ হেমের অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের দায়ে আবদ্ধ থাকিতে কখনই পারে না। তাই কি সেই অভিমানে হেম নলিনীর বিবাহে আসিতে এরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলেন? না তাহা নয়, হেমের মনে নলিনীর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব একবারেই নাই? বরং গাঢ় অনুরাগের চিহ্নই সদা সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। তবে বর্ত্তমানে হেমের হৃদয়ে যে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, অভিন্নহৃদয় নলিনী সে ঝটিকার প্রবল আহবে আহত হইলেও তৎকারণ অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। হেমও সাহস করিয়া তাহা নলিনীর নিকট বলিতে পারিতেছেন না। তাই নলিনী দুঃখিত। না বলিতে পারিয়া হেমও দুঃখিত। নলিনী তাই হেমের প্রতি কার্য্যের তাচ্ছিল্য ভাব সরল হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন। নলিনীর ধারণা হেমের মানসিক পরিবর্ত্তন হইলেই সে পাগলামী ছাড়িয়া যাইবে। বাস্তবিক তাঁহাদের মধ্যে কোন দ্বিধাভাব নাই।

নলিনী বিবাহ করিতে বাড়ী আসিয়াছেন। বিবাহের আর ১৫ দিন বাকী। হঠাৎ সেদিন বিকাল বেলায় ডাকের পত্র পাওয়া গেল। নলিনীর ভাবী শ্বশুর নলিনীর মার নিকট লিখিয়াছেন, "পাত্র সম্বন্ধে লোকমুখে নানা কথা শুনিয়া বাড়ীর মেয়েদের মন বিগড়াইয়া গিয়াছে। আমি নিজে আপনার পুত্রকে দেখিয়াছি। বিবাহ নিতান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি, তবে বাড়ীর মেয়েদের মনটাও সুস্থ রাখা আবশ্যক। পাত্রটিকে একবার দেখাইলে ভাল হয়।"

পত্র পাঠ করিয়া নলিনীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল—হৃদয় নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আশা ভরসা প্রায় তিরোহিত হইয়া গেল। মনে কেবল ভাবিলেন, কিসের জন্য আসিলাম, কি হইল—লোকে কি বলিবে?

নলিনীর মা গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন—"এখানে ছেলের বিবাহ হ'বে না, আমি করাইব না।" নলিনী কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন।

নলিনী প্রিয় সহোদরের নিকট সকল বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে নিজ মন্তব্যে মানসিক ভাবের কতকটা আভাস দিতেও ছাড়িলেন না। যথা সময়ে হেমের উত্তর আসিল। হেম খুড়িমাকে লিখিয়াছেন "দুর্ণাম বা সুনামের কথা পৃথক। পাত্র পাত্রীর দেখা শুনা করিয়া বিবাহ হওয়াই কর্ত্তব্য এবং বিহিত। এতৎসম্বন্ধে অমত করিবেন না। বিবাহ না হয় সে পৃথক কথা।"

নলিনীর ভাবী শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

দুশ্চিন্তা।

ক্ষুদ্র কুটীরের পাশে সযতনে রচি' ফুলবন
সকাল সন্ধ্যায় নিত্য করিতাম সলিল সেচন!
ছোট ছোট তরু সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিস্তারিয়া
আকুল পরাণে মোর সুখশান্তি আনিত বহিয়া!
কচি কচি পাতাগুলি শ্যামশান্ত কোমল সুন্দর;
কত পাখী আসে সেথা, কত লুব্ধ ক্লিষ্ট মধুকর!
একদিন দেখিলাম গাছে গাছে দু'একটি কলি,
যৌবন-গরবে যেন আনমনে উঠিতেছে ফুলি'!
বড় আশা হ'ল প্রাণে, ফুটিবে রে যতনের ফুল,
এ পোড়া হৃদয় মোর সুধাগন্ধে হইবে আকুল!
ভোরবেলা উঠে দেখি ক্ষুধার্ত্ত পতঙ্গ একদল,
মহাহর্ষে মাতিয়াছে রণরঙ্গে তুলি' কোলাহল!
আধফুটা কলিদলে করিয়াছে নির্ম্মম-সংহার,
মাটিতে লুটায়ে তা'রা করিতেছে শুধু হাহাকার!
প্রভাতে দেখিনু হায় বিশ্ব জুড়ি' উঠিল ক্রন্দন,
দূর নিলিমার প্রান্তে মিশে গেল আশার তপন!

শেখ ফজলল করিম।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়।

(২)

অতঃপর ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ। ইংরাজগণ বণিক্‌বেশে এদেশে আগমন করিয়া বাদশাহ নবাবগণের অনুমতি গ্রহণ করতঃ নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল। তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজ, ফরাসিস্, পর্টুগিজ প্রভৃতি জাতিগণও ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য ব্যাপার চালাইয়া আসিতেছিল। অনন্তর ভারতবর্ষের

দক্ষিণাঞ্চলের অর্থাৎ হায়দরাবাদ ও আর্কটের শাসনকর্তৃগণের মধ্যে আত্ম-কলহের সুযোগ পাইয়া ফরাসিগণ ভারতবর্ষে আপনাদের রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করে। কিন্তু ইংরাজ জাতির কল্যাণে তাহাদের সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। সুপ্রসিদ্ধ ওয়াণ্ডেওয়াশের সমরে বিখ্যাত ইংরাজ-বীর কুটের হস্তে ফরাসী-বীর লালীর পরাজয় হইবার পর ফরাসিগণের সমস্ত আশা ভরসা বিলুপ্ত হয়।

ইহার পর ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়। বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহিত নানাকারণে ইংরাজ বণিক্‌গণের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অনন্তর ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানদের সৌভাগ্যরবি পলাশীক্ষেত্রে অস্তমিত হয় এবং তদবধি সমগ্র ভারতের শাসনদণ্ড ক্রমে ক্রমে ইংরাজ জাতির করায়ত্ত হয়। ইংরাজগণ বিদেশীয় জাতি। 'সাতসমুদ্র তের নদী' অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে ইংলণ্ড হইতে সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে রাজ্য পরিচালনা করিতে হইল। সুতরাং ভেদ-নীতি অবলম্বিত হইল। ইংরাজ দেখিল যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধানজাতি। অল্পদিন হইল, মুসলমানদের রাজ্য বিনষ্ট ও অধিকৃত হইয়াছে। সুযোগ পাইলেই হয়ত তাহারা আবার নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। ওদিকে মোগল বাদশাহগণের শেষ রাজত্বকালে শিখ, মারহাট্টা প্রভৃতি বলশালী জাতি সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে হইল। Divide and rule এই রাজনীতি মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া ইংরাজ দেশশাসন করিতে লাগিল। ইহার ফলে ইংরাজগণ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। তাহারা বাক্যে মুসলমানগণের শতদুর্নাম রটনা করিতে লাগিল; লেখনী ধারণ করিয়া মুসলমানগণের নানা কুৎসা ও নিন্দাবাদ জনসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিল। জনসাধারণের চক্ষের নিকট মুসলমান নৃপতিগণের ও তাঁহাদের রাজত্বের অতি কুৎসিত চিত্র ধারণ করিল। ইংরাজ-ঐতিহাসিকগণ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ পূর্ব্বক বিকৃত ও অসত্যকথাপূর্ণ ইতিহাস (?) রচনা করিতে লাগিল। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন ইংরাজদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হইল, অন্যদিকে তেমনই হিন্দু এবং মুসলমানগণের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ও বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ইংরাজগণ দেশজয় করিয়া দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিল। হিন্দুবালকগণ ইংরাজ রচিত পূর্ব্বোক্তরূপ ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহাতে মুসলমানগণের বিকৃত ও জঘন্য চিত্র দর্শন করিয়া তাহাই ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁহার "দেশের কথা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"ভেদনীতির বলে যাঁহারা ভারতশাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বর্দ্ধনের জন্য মুসলমানদিগকে অত্যাচার পরায়ণ ও অসভ্যরূপে ভারতীয় কোমল হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি,—মুসলমানেরা একহস্তে তীক্ষ্ণ কৃপাণ ও অপর হস্তে কোরান লইয়া কৃতান্তের বেশে নানাদেশ উৎসাদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক টমাস আরনল্ড সাহেব 'প্রিচিং অব্ ইসলাম' (Preaching of Islam.) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সভ্যজগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। * * * মহম্মদের (দং) একহস্তে কোরান ও অন্য হস্তে কৃপাণ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচারের আদেশ প্রদানের কথা সম্পূর্ণ অলীক। ভেদনীতি-কুশল ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণের কল্যাণেই এইরূপ নানা অনৈতিহাসিক অমূলক সংস্কার দেশের লোকের—বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে।" ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত তৎকালীন হিন্দুগণ ইংরাজ লিখিত ইতিহাস কেবল ভাষান্তর করিয়াই ইতিহাস রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঘটনাবলীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ বা অনুসন্ধান না করিয়াই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করত ধন্য হইতে লাগিলেন। ইতিহাস ব্যতীত সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সেই শিক্ষার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে লাগিল। গদ্যে,পদ্যে,নাটকে, নভেলে সকলেই মুসলমানের কুৎসা, মুসলমানের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহারা মুসলমানদিগকে নানারূপ অকথ্য ভাষায় ইতর লোকের ন্যায় গালাগালি পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। গালির তরঙ্গ নগর হইতে উপ-নগরে ও তথা হইতে গ্রাম-গ্রামান্তরে পঁহুছিয়া মুসলমানের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। মনঃকল্পিত ভিত্তিহীন অপকার্য্য সমুদায় মুসলমানের স্কন্ধে আরোপিত হইতে লাগিল। তাহারা দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, অত্যাচারী, জাতিধর্ম্ম নাশকারী, দুরন্ত যবন ইত্যাদি কতই মধুর বিশেষণে বিশেষিত হইতে লাগিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রথমে ধূমায়িত হইয়া পরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং দেশ

ব্যাপীরূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজী শিক্ষার যে সমস্ত কুফল ফলিয়াছিল, তন্মধ্যে হিন্দু মুসলমান বিরোধ বর্দ্ধনরূপ কুফলই অত্যন্ত বিকট বিষময় বলিতে হইবে।

ইংরাজরাজ একে একে ভারতবর্ষের সমূহ প্রদেশ জয় করিয়া একচ্ছত্র রাজা হইলেন। দেশ হইতে অশান্তির মূল উৎপাটিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। প্রজা সাধারণ ইংরাজরাজ স্থাপিত শান্তির বিমল ছায়ায় বসিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিল; অথচ হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বিদূরিত হইল না কেন? আমরা আশা করিয়াছিলাম যে,যখন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত হইল, বিধাতৃ-বিধানে উভয়েই যখন এক শাসনের অধীন হইল, উভয়েই যখন সমদশাপন্ন পরাধীন জাতি হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন সৌহার্দ্দ. প্রীতি, প্রণয় সংস্থাপিত হইবে. কিন্তু তাহা হইল না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রিটিশ স্থাপিত শান্তির সময় তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুভ্রাতৃগণই ইহার জন্য অধিকাংশে দায়ী।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় হিন্দুর আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। অনেকে স্বধর্ম্মে আস্থাহীনও হইয়া পড়িতেছিল। এমন কি, অনেকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবাগত খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। দেশে কদাচার ও অনাচারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সময় রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের অদম্য ও অক্লান্ত চেষ্টায় এবং প্রাণপণ প্রয়াসে উল্লিখিত পরিরর্ত্তনের গতিরোধ হইয়াছিল। অনেকের ধারণা এই যে, মহাত্মা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ যদি তৎকালে আবির্ভূত না হইতেন, তবে এতদিনে দেশে অনাচারের ও কদাচারের বহুল বিস্তার হইত এবং বহু হিন্দুসন্তান আজ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিমল আলোকে আলোকিত হইতেন! যাহা হউক, ইদানীং হিন্দুগণের মতি গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজকাল লোকে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে বটে; কিন্তু তাহা অর্থকরী শিক্ষার ন্যায় কেবল অর্থোপার্জ্জন নিমিত্ত। এদিকে আবার হিন্দুধর্ম্ম যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই হেতু আজকাল বড় বড় ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়াকলাপ সাধন করিতে দেখা যায়। ইহা অবশ্য হিন্দু-ভ্রাতৃগণের নিকট শুভ লক্ষণ বা শুভ সম্বাদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু ইহাকে অন্যদিকে অতীব অশুভ লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। কারণ অধিকাংশ

স্থলেই দেখা যায় যে, এই সকল শিক্ষিত হিন্দুগণই মুসলমানদিগকে অধিকতর ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং হিন্দু মুসলমানে বিরোধ জন্মাইয়া থাকেন। যে কোন পল্লীগ্রামে যাও দেখিতে পাইবে সাধারণ হিন্দু মুসলমানে বেশ সদ্ভাব—বেশ মিল; পরস্পরে সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু যেখানেই শিক্ষিত জমিদার, যেখানেই তথাকথিত তালুক-দার, ভূস্বামী, সেইখানেই নির্য্যাতন। শিক্ষিত হিন্দু জমিদার মনে করেন যে, মুসলমান তাঁহার পরমশত্রু, মুসলমান তাঁহার আঁখির বালি, সেইহেতু নানা উপায়ে তিনি মুসলমানকে বিপদগ্রস্ত করেন; কখন বা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী, কখন বা দেওয়ানী নালিশ উত্থাপন করিয়া তাহাকে জেরবার ও জ্বালাতন করেন; আবার কখন আপন অধীনস্থ নগদী পাইকাদি প্রেরণ করিয়া নানাপ্রকার উৎপীড়ন করেন। গো-বধের অছিলায় কত মুসলমানকে যে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? আবার কোথাও গোরক্ষিণী সভা, কোথাও সনাতন সভা, কোথাও আর্য্যধর্ম্ম সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসলমানগণকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক হিন্দুমুসলমান বিরোধের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়। মুসলমানগণও যে মধ্যে মধ্যে ইহার প্রতিশোধ না লয়, এমন নহে। সামান্য পিপীলিকাও পদদলিত হইলে দংশন করিয়া থাকে। ইহাই সংসারের নিয়ম। সুতরাং মধ্যে মধ্যে মুসলমানগণও যে প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে হিন্দুগণের উপর অত্যাচার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সকলেরই ত ধৈর্য্যের সীমা আছে!

অতএব হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের প্রধান প্রধান পাঁচটি কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ১ম, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন; ২য়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য; ৩য়,—ইংরাজজাতির ভেদনীতি; ৪র্থ, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও অপব্যবহার এবং ৫ম, হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান।

এক্ষণে উল্লিখিত কারণগুলি নিরাকরণ নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, দেখা যাউক।

প্রথমতঃ—ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন জনিত বিরোধের কারণ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ আজ বহু শতাব্দী যাবৎ মুসলমানগণ এদেশে বসবাস করি-তেছেন এবং এই ভারতবর্ষকে আপনার দেশ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন,—

শুদ্ধ স্বীকার কেন,—গৌরবও করিতেছেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এককালে এই ভারতবর্ষ আর্য্য বা হিন্দুদের দেশ ছিল না, কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা এদেশে আগমন করিয়া এদেশে বাস করেন এবং ইহাকে স্বদেশজ্ঞানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আখ্যাও প্রদান করেন। সেইরূপ মুসলমানও এদেশে বহু শতাব্দী যাবৎ বসবাস করিয়া ইহাকে আপন জন্মভূমি জ্ঞান করত ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অকাতর যত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। ফলকথা, এখন ভারতবর্ষ যেমন হিন্দুর দেশ, তেমনই মুসলমানের দেশ। এখন আর একে অন্যকে বিদেশীয় বা Inrtuder (অনধিকার প্রবেশক) বলিয়া বিবেচনা করেনা ,—এখন হিন্দু মুসলমানে আর জেতা ও বিজেতার ভাব নাই। যে সময়ে উহা হিন্দু মুসলমানে বিরোধের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে কাল এখন অতীতের অতি নিম্নগর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, "ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী" রূপ বিকট উপাধিধারী ছদ্মবেশী অকালকুষ্মাণ্ডগণ এখনও মুসলমানকে "ভারতীয়" বলিতে কুণ্ঠা বোধ করে। বিগত বর্ষের বৈশাখ সংখ্যার নব্যভারতে "গুরু গোরক্ষনাথ" প্রবন্ধে উক্ত লেখক বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ প্রকৃত ভারতীয় নহে। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান শূন্য ভুঁইফোড় লেখকগণ হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি সাধনের পক্ষে যে প্রধান অন্তরায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইতে ও অস্ত যাইতে থাকিবে, যতদিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে এবং যতদিন হিন্দু মুসলমান ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন হিন্দু মুসলমানে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিবেই রহিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দু, হিন্দুই থাকিবে এবং মুসলমান মুসলমানই থাকিবে। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রমতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এক সময় এজগতে এক সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব থাকিবেনা। তখন ধরাতলে যত বিভিন্ন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই ইস্‌লামের বিরাট দেহে বিলীন হইয়া যাইবে। সে সময়ের কথা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইতেছে না। কারণ, তখন জাতি বা ধর্ম্মগত কোন ভেদাভেদই থাকিবে না। তবে এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বা মিলন হওয়া সম্ভব কিনা? আমার বিনীত মত এই যে, তাহা কখনও অসম্ভব হইতে পারেনা। হিন্দু, হিন্দু থাকিয়া,

মুসলমান আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম বজায় রাখিয়া, উভয়ের মধ্যে মিলন কি অতিব অসম্ভব বা দুষ্কর? না, কখনই নহে। তুমি হিন্দু,—তুমি আপন দোল-দুর্গোৎসবাদি সচ্ছন্দে অনুষ্ঠান কর, তাই বলিয়া কি দেশের কল্যাণের নিমিত্ত, দশের মঙ্গলের জন্য তুমি মুসলমানগণের সহিত যোগ দিতে পার না? অথবা তাহাতে বাধাই বা কি? পক্ষান্তরে তুমি মুসলমান, তুমি তোমার রোজা-নমাজ পালন কর, হজ-জকাত সম্পাদন কর; তাই বলিয়া কি সাধারণ হিতকর কার্য্যে বা সদানুষ্ঠানে হিন্দুর সহিত যোগ দিতে তোমার কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক আছে? উভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ কর; পরকালে পুণ্যলাভ করিবে, কিন্তু তজ্জন্য দেশের কল্যাণকর সদনুষ্ঠানে পরস্পরে যোগ দিতে ত কোন আপত্তি দেখা যায় না!

এক্ষেত্রে চাই কি? চাই কেবল Toleration; চাই কেবল সহিষ্ণুতা; চাই কেবল অন্য ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাব প্রদর্শন। এই ভাব অন্তরে জাগরূক থাকিলে হিন্দু মুসলমান বিরোধের প্রধানতম কারণ সহজেই নিরাকৃত হইবে। আমি "ইসলাল প্রচারক" পত্রে প্রকাশিত "মুসলমান কি এতই ঘৃণার পাত্র?" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃত আর্য্য ধর্ম্মের সহিত ইস্লাম ধর্ম্মের পার্থক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক যুগে অর্থাৎ যে সময়ের লোক ধার্ম্মিক, সাধু, নিষ্ঠবান, সদাচারী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হন, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যে যে আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান মুসলমানগণও প্রায় সেই সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন। তবে কি জন্য হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুসলমানকে এত হেয় ও ঘৃণ্য মনে করেন? ফলকথা জাতি বা ধর্ম্মগত পার্থক্য হিন্দু মুসলমান বিরোধ জন্মাইবার অন্যতম কারণ হইলেও তাহা সহজেই দূরীভূত করিতে পারা যায়। উভয়ে উভয়ের প্রতি Toleration বা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিলে, পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাব দেখাইলে,—মামলা মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে হইলে উভয় পক্ষকে যেমন কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ পরস্পরে কিছু স্বার্থত্যাগ করিলে—উল্লিখিত কারণ আপনিই তিরোহিত হইয়া যাইবে।

ও, আলী।

মহাত্মা আলী।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য আবুতালেবের ঔরসে, আসাদের কন্যা ফাতেমা দেবীর গর্ভে, ২৩ পূর্ব্ব হিজরিতে রজব মাসের ২৩ তারিখ শুক্রবারে,মক্কা নগরে মহাত্মা আলী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হজরত অপেক্ষা ত্রিংশ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আবুতালেবের বহু পোষ্য ছিল; কিন্তু তেমন আয় ছিল না, কাজেই তিনি তাহাদের ভরণ পোষণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সর্ব্বদা বিপন্ন থাকিতেন। এক সময়ে মক্কা নগরে বিকট দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; সেই সময় হজরত স্বীয় পিতৃব্যের সাংসারিক ব্যয় সঙ্কোচনার্থ আলীকে গ্রহণ করেন। সেই হইতে আলী হজরতের চিরসঙ্গী হয়েন। তিনি ১০ কি ১২ বৎসর বয়সের সময় এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পুরুষদিগের মধ্যে মহাত্মা আলীই সর্ব্ব প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে হজরত-পত্নী খদিজা দেবী নব ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত সোমবারে আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত প্রকাশ করেন, মঙ্গলবারে আলী দীক্ষিত হয়েন।

মহাত্মা আলী অতুল শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। কোন কোন সময়ে তিনি এতাদৃশ অলৌকিক বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করেন যে, ইস্‌লাম-সমাজ তাঁহাকে "আসদোল্লা" বা "ঐশ্বরিক সিংহ" এই গৌরবাত্মক উপাধিতে ভূষিত করেন। এতৎভিন্ন তাঁহার আরও দুইটি বীর্য্যাত্মক উপাধি ছিল। যথাঃ—"কররার" বা "পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী" এবং "সফ্‌দর" বা "সৈন্যশ্রেণী ভেদকারী"। তাঁহার মাতৃ-দত্ত পূর্ব্বনাম "হয়দর" বা "শার্দ্দুল"। হজরত তাঁহাকে "আলী" অর্থে "সমুন্নত" এই আখ্যা প্রদান করেন। তিনি এই নামেই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা আলী অতি অল্প বয়সে যেরূপ হজরত-প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাহা জগতে একান্ত দুর্ল্লভ। একদা দুর্দ্দান্ত কোরেশগণ পরামর্শ করে যে, রজনীতে হজরত মহাপুরুষ নিদ্রিত হইলে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রাণের আক্রোশ ঘুচাইবে—হজরতকে হত্যা করিয়া নবধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিবে। হজরত পূর্ব্বাহ্নে ইহা অবগত হইয়া সতর্ক হয়েন। এদিকে আক্রমণকারীরা রজনীতে হজরত মোহাম্মদের (দং) শয্যা আক্রমণ করিয়া যাঁহাকে ধৃত করিল, তিনি একজন বালক মাত্র! তাহারা উক্ত বালকের নিকট হজরত-সম্বন্ধীয়

কোনও সন্দেশ অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বালক আর কেহই নহে, অসমসাহসী আলী সেই রজনীতে হজরতের শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন! নিজের জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, কিরূপে শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিতে হয়, তরুণ বয়সী মহাত্মা আলীর এতাদৃশ ব্যবহার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাত্মা আলী অতুল শৌর্য্য-বীর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন; এ জন্য অদ্যাপি মুসলমান বীর-পুরুষেরা আলীকে "বীর-দেবতা" বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। এমন কি, তাঁহারা সংগ্রামাদিতে বীরত্ব প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়া, "আলী" "আলী" বলিয়া সিংহনাদ করিয়া থাকেন। একবার ইহুদিদিগের সঙ্গে হজরতের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে হজরতের এক এক সেনাপতি এক এক দিন তাহাদিগের দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ ও পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাবীর আলীকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করা হইল। যুদ্ধে গমনের পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ (দং) তাঁহাকে স্বীয় কবচাদির দ্বারা সুসজ্জিত এবং "জোলফক্কার" নামক প্রচণ্ড তরবারী প্রদান করেন। অবশেষে নানা উপদেশ দিয়া যুদ্ধস্থলে পাঠাইয়া দেন। 'আসদোল্লা' আলী সেই যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহুদিদিগের দুর্গ অধিকার করেন। এরূপ কথিত আছে যে, যুদ্ধস্থলে কোনও শত্রুর দ্বারা আঘাতিত হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত ঢাল ভূমিতলে পতিত ও শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে তিনি দুর্গ পরিখা উল্লম্ফনে পার হইয়া, দুর্গের সম্মুখস্থ লৌহ-কপাট সিংহ বিক্রমে ভগ্ন করিয়া, স্বীয় ঢাল স্বরূপ গ্রহণ করেন! সেই কপাট খানি নাকি সাত জন বলবান মুসলমান এক যোগে চেষ্টা করিয়াও একদিক হইতে অন্য দিকে ঘুরাইতে পারিত না! চল্লিশ জনেও নাকি তাহা ভূমি হইতে তুলিতে অক্ষম হইত! এই অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার অতুল বীরত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অনন্য-সাধারণ গুণে মহাত্মা আলী হজরতের একান্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। হজরতের কন্যা ফাতেমা দেবী পরম ধর্ম্মপরায়ণা রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অনেক সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশীয় যুবক তাঁহার পরিণয়-প্রার্থী হয়েন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দং) তাঁহার একান্ত প্রেমাস্পদ ধর্ম্মপরায়ণ আলীকেই স্বীয় কন্যা ফাতেমাদেবীর উপযুক্ত পাত্র স্থির

করিয়া, হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে, রজব বা সফর মাসে উভয়কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের সময় মহাত্মা আলীর অত্যন্ত দৈন্যাবস্থা ছিল। তিনি আপন বর্ম্ম আবুবেকর সিদ্দিকের নিকট বিক্রয় করিয়া বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আলী বিবাহ সময়ে কয়েকটি মৃণ্ময় পাত্র ফাতেমা দেবীকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত মহাপুরুষ গদ্‌গদ চিত্তে ঈশ-সমীপে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন— "পিতঃ! এই মৃণ্ময় সামগ্রী যাহাদের প্রিয়, তুমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" হজরতের এ প্রার্থনা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই ভবিষ্যতে দাম্পত্য সুখে সুখী হইয়াছিলেন।

হজরত মহাপুরুষ মদিনায় অবস্থিতি করিবার সময় তথাকার "আন্‌সার" অর্থাৎ সাহায্যকারী দলের প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তির সহিত "মোহাজের" অর্থাৎ দেশত্যাগী দলের প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তিকে যথানিয়মে পবিত্র ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক দলের পঁয়তাল্লিশ ব্যক্তি এই ব্যাপারে সম্পর্ক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পরস্পর একে অন্যের উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারিতেন। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ মোহাজেরকেই এক একজন বিশিষ্ট আন্‌সার ভ্রাতা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আলী দুঃখ করিয়া মোহাম্মদকে (দং) বলিয়াছিলেন—"সকলেরই এক এক জন ধর্ম্মভ্রাতা হইল, কেবল আমিই বঞ্চিত রহিলাম!" হজরত তদুত্তরে বলিলেন—"আমিই তোমার ভ্রাতা হইলাম।"—কি সুন্দর স্নেহ বাক্য! এই একটি কথাতেই আলীর প্রতি প্রেরিত পুরুষের কি গভীর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে!

ইহার পর বহু বৎসর নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে মহাত্মা আলীর জীবন অতিবাহিত হইলে পর, কালক্রমে ইস্‌লাম সমাজের তৃতীয় খলিফা ওস্‌মান পরলোক গত হয়েন। তখন এস্‌লাম-মণ্ডলী মহাত্মা আলীকে সর্ব্বথা যোগ্যতর বিবেচনা করিয়া আপনাদের নেতৃত্ব পদে বরিত করেন। তাঁহার নেতৃত্বকালে বহুতর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটিয়াছিল। কিন্তু সবিশেষ আক্ষেপের বিষয়, অধিকাংশ স্থলেই নানা কারণে আপনাদের নেতার প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়াই, এস্‌লাম-মণ্ডলীর পরস্পর, পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। এই নিদারুণ আত্ম-দ্রোহিতাই সর্ব্বপ্রথম বিশাল মোস্‌লেম সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নানা দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাপি এস্‌লাম-সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সেই সকল যুদ্ধের বিষময় ফল উপভোগ

করিতেছেন। আত্মবিগ্রহের কার্য্যকারিতা শক্তি এমনই প্রবল বটে! সময় ও স্থানাভাব প্রযুক্ত সেই সমস্ত কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা হইল না।

খলিফা প্রবর আলী তদীয় সহধর্ম্মিণী ফাতেমা দেবীর জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত অন্য দারপরিগ্রহে বিরত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে আরও আটটি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন! তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পনের পুত্র ও সতের কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পনের জন পুত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনের বংশ রক্ষা পাইয়াছিল।

মহাত্মা আলী প্রায় পাঁচ বৎসর এস্লাম সাম্রাজ্যের অধিনায়কত্ব করিবার পর, ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় জনৈক পাষণ্ড ষড়যন্ত্রকারী কর্ত্তৃক নমাজ-মন্দিরে গুরুতর রূপে আহত হইয়া, হিজরী ৪০ সালে পরলোক যাত্রা করেন। তিনি হজরত মহাপুরুষের প্রতি যেরূপ প্রীতি-ভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি যেরূপ হজরতের একান্ত বাধ্য ও অনুগত ছিলেন, তাঁহার দেব-চরিত্রে যেমন শৌর্য্য-বীর্য্য-উৎসাহ আদির স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, সেরূপ জগতে একান্ত দুর্ল্লভ। এই সকল গুণে তিনি জগতে সকল সমাজেরই বরণীয় হইবার উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

উচ্ছ্বাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

(৮৭)

কান থাকে শুন অই কি কহিছে অণু পরমাণু —
—"যে কালে উদিত ছিল ইস্লামের তেজস্কর ভানু,
এখানের পূতবায়ু প্রাণদাতা ছিল গো কালের,
এথেন্স * য়ুনান ভূমি সঞ্জীবিত গুণে মোস্লেমের!

* এই নগর পুরাকাল হইতে গ্রীসের রাজধানী। গ্রীসের বড় বড় পণ্ডিত ও হেকিম-গণ এই নগরের অধিবাসী। এই জন্য আরবজাতি ইহাকে "মদিনাতুল হোকামা" অর্থাৎ

(৮৮)

লোকমান * ও সোক্‌রাতের † অদ্বিতীয় প্রদীপ্ত রতন,
বোক্রাতের গুপ্ততত্ত্ব, আফলাতুঁর মহাশিক্ষা দান,
আরাস্তুর জ্ঞানরবি, সোলনের ‡ বিজ্ঞান-বিধান,
কালের কুটিল চক্রে ছিল যাহা হয়ে মৃত প্রাণ ;—
এখানে সে জ্ঞানভাণ্ড খণ্ড হ'য়ে করিল মোহিত ;
এই পুষ্পোদ্যান হ'তে সে সুগন্ধ হ'ল বহির্গত !

(৮৯)

ভিষক্‌-দরশে রোগী রহে যথা পথ নিরখিয়া,
বিদ্যালাভ আশে তারা সেইমত ছিল লুব্ধহিয়া !

হাকিমদের নগর নাম দিয়াছেন। আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ যে কেবল গ্রীসের (ইয়ুনানের) নামই স্মরণীয় করিয়াছেন এমন নহে, বরং রুমি, ফারসী, সংস্কৃত, সুরিয়ানী প্রভৃতি ভাষার সংখ্যাতীত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করাইয়াছেন। আবু জাফর মনসুর দূত প্রেরণ পূর্ব্বক কায়সরে রুমের নিকট হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী এবং অনুবাদ আনয়ন করিয়াছিলেন ও ইউক্লীড্‌, মেজেস্তি, কলিলা, দামানা পুস্তক সমূহের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। হারুণ রশিদও বহু বিষয়ের বড় বড় পুস্তকাবলী লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। খলিফা মামুন কাবরুস দ্বীপ হইতে ইউনানী বিজ্ঞানের বহুল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইউরোপের যে স্থানেই গ্রন্থাদির অনুসন্ধান পাইয়াছেন, সেই স্থান হইতেই তাহা আনয়ন করাইয়া তাহার রক্ষার উপায় করিয়াছেন।

* লোকমান একজন মিষ্টভাষী জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইউনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অমূল্য উপদেশরাজি ন্যূন বিংশতি ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই উপদেশ-রত্নাবলীই মূর্খকে জ্ঞানদান, অজ্ঞকে বিজ্ঞ, অত্যাচারীকে সদয়, বিদ্রোহীকে আজ্ঞাবহ করিয়াছে। অবশেষে ডলফী নামক স্থানে তাঁহার প্রতি লা-মজ্‌হাবীত্বের (অর্থাৎ সম্প্রদায়-বিদ্রোহিত্বের) দোষারোপ হওয়ায়, তিনি লজ্জায় পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ঝম্পপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

† সোক্রাত (Socrates) এথেন্স নিবাসী একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং মানব মাত্রেরই হিতৈষী পথ-প্রদর্শক। ইঁহার বক্তৃতার খ্যাতি সমুদয় ইউনান প্রদেশে ব্যাপৃত ছিল। লোকে ইঁহার উক্তি সমূহকে বহু চেষ্টায় একত্র করে। খৃষ্ট জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ-প্রয়োগে কেহ ইঁহাকে বিনাশ করে।

‡ সোলন—ইনিও এথেন্স নিবাসী এবং একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যবস্থা-বিশারদ সুধী।

দুর্দ্দম সে জ্ঞান-তৃষা কিছুতে না হ'ত নিবারিত ;
শিশির-বর্ষণে কি গো অগ্নিকুণ্ড হয় নির্ব্বাপিত ?
মিশর, য়ুনান হ'তে ভারবাহী শ্রান্ত উষ্ট্রদল
নিত্য রাজধানী মাঝে যোগাইত দপ্তর সকল !

(৯০)

অই যে তারকারাজি প্রাচ্যভূমি করিত উজল,
পাশ্চাত্যের দীপ্তালোক তাহাদেরি সাধন-সুফল।
যাদের রচনা-কলা আজো বিশ্ব বিস্ময়ে হেরিছে;
লণ্ডন, পারিস, রুমে যাহাদের গ্রন্থশালা আছে ;
জগৎ জুড়িয়া ছিল যাহাদের খ্যাতি প্রসারিত,
বোগ্দাদের গোরস্থানে আজি তারা সুখে নিদ্রাগত !

(৯১)

মনে কর সেই দিন,—অতীতের কীর্ত্তি অগণন।
সাঞ্জার কুফার * মাঠে যেইদিন ভৌগোলিকগণ—
একত্র হইয়াছিল গোলত্ব মাপিতে পৃথিবীর,
—দেশ মাপি করিলেক মহাদেশ-পরিমাণ স্থির।
আকুল বসুধা-বাসী—আজো কাঁদে বোগ্দাদে স্মরিয়া,
হায় ! আব্বাসীর সভা কোথা গেল অকালে মিশিয়া ?

(৯২)

উদ্দাম অতল সিন্ধু একদিন হেলায় তরিয়া
মান-মন্দিরের † ভিত্তি প্রস্থাপিল যা'রা স্পেনে গিয়া,—

* দর্জ্জলা এবং ফোরাতের মধ্যস্থিত 'দিয়ারে বরিয়া' নামক দ্বীপের একটি পুরাতন নগরের নাম সান্জার। এখানে 'বরিয়া' নামে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে। এক সময় এই স্থানে এবং কুফার মাঠে মামুন-বেন-রশিদের আদেশে ভৌগোলিকগণ একত্র হইয়া ভূমণ্ডলের গোলাকৃতির পরিধি ২৪০০০ হাজার মাইল নির্ণয় করিয়াছিলেন। মুসা-বেন্-সাকারের পুত্র-চতুষ্টয়—আবুজাফর, মোহাম্মদ, আহ্মদ্ এবং হোসায়েন এই কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

† সমরকন্দ হইতে স্পেন পর্য্যন্ত যাবতীয় মানমন্দির মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহা পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হইত ; উচ্চতা ১০০গজ। মরাগা, কসিউন প্রভৃতি স্থানেও মুসলমানগণ কর্তৃক মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আজর বায়জান প্রদেশে মহম্মদের পুত্র মরু-ওয়ানের দ্বারা মরাগা নগর স্থাপিত হয়। এই নগরের বহির্ভাগে একটি অত্যুচ্চ স্থানে হালা কু

এখনো পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের পদাঙ্ক শোভন,
হায়! কোথা গেল সেই মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদগণ ?

(৯৩)

সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ল'য়ে আজি যেই ইতিবেত্তৃগণ
চমকিত করি ধরা ইতিহাস করিছে রচন ;
নখাগ্রে বিচ্ছিন্ন করি পড়িতেছে জগদিতিহাস, *
আরবী তাদের হৃদে ঢেলেছে এ শুভদ প্রয়াস !

(৯৪)

অন্ধতমসের মাঝে ইতিহাস ছিল আবরিত ;
অপগত আলোচনা, রওয়ায়েত কাল-কবলিত !
বদন ব্যাদান করি প্রেত-সম অজ্ঞতা বিকট
গ্রাসি' জ্ঞান-দিবাকর কালমূর্ত্তি করিল প্রকট।
আরবী সে অন্ধকারে জ্বেলে দিল প্রদীপ রতন।
সুপন্থা হেরিয়া বিশ্ব সুখসরে হইল মগন !

(৯৫)

প্রেরিতের প্রথা মত একদল পথ ধরেছিল,—
প্রতি মিথ্যাবাদীকেই শেষে তারা সবলে বাধিল।

খাস্বীয় রাজত্বকালে খাজা নসিরউদ্দীন তুসী প্রভৃতির সাহায্যে একটি মানমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কসিউন দামেস্কের উত্তরদিকস্থ একটি পর্ব্বতের নাম। কথিত আছে,—এই স্থানে কাবিল হাবিলকে হত্যা করিয়াছিল। মামুন-রসিদ ২১৫ হিজরীতে কসিউন এবং বাগদাদে খালেদ-বেন-আব্দুল মালেক প্রভৃতির দ্বারা মানমন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২১৮ হিজরীতে যখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল। পুনরায় শরফ উদ্দীন-বেন-আজদদ্দৌলা বাগদাদের পার্ব্বত্য প্রদেশে দিজন-বেন-ওস্তম প্রভৃতির দ্বারা মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* ইতিহাস আলোচনায় ইউরোপীয়ানেরা বর্ত্তমানে জগৎপ্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে তাঁহারা যে আরব জাতির নিকট সমধিক ঋণী, তাহা অস্বীকার করেন না। আক্ষেপের বিষয়, আজ মুসলমানদিগের নিকট জাতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য। আবু রাসেদ, হাজি খলফা, এব্নে বাতুতা, এব্নল আছের, মেহ্‌রিতি, মস্উদি, তেব্‌রি, হামজা, আসফাহানী প্রভৃতির মধ্যে কাহারও একখানি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইঁহাদের অমূল্য গ্রন্থরাশি আজ ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও রুমের গ্রন্থশালাগুলির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

গুপ্ত পাপ-সাধনের সূক্ষ্ম রন্ধ্র উপেক্ষা না করি
অপদস্থ করিলেক মিথ্যাবাদী জনে জনে ধরি!
"জরূহ" ও "তাদিনের" * বিধিবদ্ধ হইল আইন;
প্রবঞ্চনা—নিত্য পাপ একেবারে হইল বিলীন!

(৯৬)

সত্যের বিমলালোকে অনায়াস হ'ল পর্য্যটন;
অবাধ জ্ঞানের পথে সকলেই করি বিচরণ—
ধর্ম্ম-তত্ত্ব-খনি বলি যেথা যার পাইল সন্ধান,
তারি কাছে যেয়ে তারা তত্ত্ব-সুধা করিলেক পান।
বসিয়া স্বাধীন-চিতে নিজে তার করিল বিচার;
আপনি আস্বাদি' পরে অপরেরে করা'ল আহার!

(৯৭)

দোষ গুণ যে রাবীর যাহা ছিল প্রকাশ করিল।
নাহি হিংসা, স্বার্থ কিছু সে বিচার এমনি হইল!
তাপস, মণ্ডলীপতি দোষ গুণ ছিল যার যাহা,
একটি একটি করি অসঙ্কোচে প্রকাশিল তাহা।
ধর্ম্মধ্বজী কপটের ভেঙ্গে গেল স্বপন সোনার;
সাধু, মোল্লা কেহ নাহি সে বিচারে পাইল নিস্তার!

(৯৮)

"রেজাল" ও "আছানিদে" † আরবীর সত্যনিষ্ঠা-রবি
আজিও বিকাশি আছে সত্যের সে তেজোদীপ্ত ছবি!

* জরহ—মোহাদ্দিসগণের নির্ণয় মতে কোন রাওয়ীর (?) অসাবধানতা, স্মরণশক্তির হ্রাস, মিথ্যা, জালিয়াতি ইত্যাদি সাব্যস্তকরণ। তায়াদিল—কোন রাওয়ীকে সচ্চরিত্র সাবধান, বিশ্বাসী ইত্যাদি প্রমাণ করণ। হাদিস সংগ্রাহকগণ যে প্রকার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, এবং ব্যক্তিগত চরিত্র সংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছেন, জগতের ইতিহাসে সে প্রকার সত্যনিষ্ঠা একান্ত বিরল। নিতান্ত পাষণ্ডেরও কোন গুণ থাকিলে ইঁহারা তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত বা তাহার প্রতি সমাদর দেখাইতে ক্ষান্ত হন নাই। ইউরোপীয়গণ এ বিষয়টি আরবীয়দের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছেন।

† রেজাল—বিদ্যাবিশেষ—যে বিদ্যায় পণ্ডিত এবং হাদিস সংগ্রাহকগণের বিবরণ বিশুদ্ধ-রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। আছানিদ—হাদিসবিদ্যা—যাহার মধ্যে তিনটি হাদিসের সঙ্গে এক একটি রাওয়ীর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। Dr. Spring লিখিয়াছেন,—"এল্‌মে রেজাল ও

শুধু তারা করে নাই স্বজাতির প্রিয় উপকার,
ঋণ-বদ্ধ বিশ্ববাসী—একথা কে করেনা স্বীকার ?
পৃথ্বী-পথ-প্রদর্শক ছিল বটে মোস্লেম-নন্দন।
"লিবার্টিতে" আজি যারা লভিয়াছে গৌরব আসন,
তারাই বলুক দেখি কবে তারা "লিবারেল" ছিল,
এ শিক্ষা কাহার কাছে শিখিবার কতদিন হ'ল ?

(৯৯)

"ফাছাহাৎ" "বালাগৎ" *—মধুময় অলঙ্কার রাশি
অন্ধকারে ঢাকা ছিল,—রাহুগ্রস্ত যথা পূর্ণ শশী।
রোমের কবিত্ব-বিভা মৃতপ্রায় খদ্যোতের মত,
পারস্যে সাহিত্য-বহ্নি চিরতরে যবে নির্ব্বাপিত ;
হেনকালে মরুভূমে অকস্মাৎ বিজুলী হাসিল !
অন্ধের সম্মুখে যেন রাঙা ঊষা সাজিয়া দাঁড়াল !

(১০০)

আরবীর অগ্নি-বাক্য যবে তারা করিল শ্রবণ,
অলঙ্কৃত কথামৃত বিমোহিল রসহীন মন।
গৈরিকনিস্রাব সম তেজোগর্ব্ব কবিতা-প্রবাহ,
ভাবাত্মক মুখবন্ধ, মায়াময় পদ-দল-মোহ,—
কমকণ্ঠ কোকিলের "কুহু" সম করিল মোহিত।
বুঝিল আঁধারে মোরা এতদিন ছিনু নিমজ্জিত !

শেখ ফজলল করিম

এল্‌মে-আছানিদে মুসলমানগণ যে গৌরব করেন, তাহা সত্যই করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না, বা বর্ত্তমান নাই, যাঁহারা মুসলমানদের মত ১২০০ বার শত বৎসর পর্য্যন্ত বিরম্মণ্ডলীর ধারাবাহিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমি অনুসন্ধান করিলে ৫ পাঁচ লক্ষ বিখ্যাত পণ্ডিতের জীবনী ইঁহাদের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি।"

* ফাছাহাৎ" ও "বালাগৎ"—বাক্যালঙ্কার বিশেষ। ইহা আরবের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহাদের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণ উত্তেজিত হইত এবং বিপক্ষদল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িত। আরবীর সে বজ্রবাক্য গদা, তরবারি ও ধনুর্ব্বাণের কার্য্য করিত। জন ডিভনপোর্ট বলেন,—"একদা আরব্য-সাহিত্য রুম এবং ইউনানের সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল।" "লিটারেল্ ট্রানস্লেসন্ মিটিং"য়ে প্রথম সাব্যস্ত হয় যে, সাহিত্য, গল্প এবং জীবনী এই বিষয়ত্রয়ে আরবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মতীচূর—সমালোচনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এখন অর্দ্ধাঙ্গ-সম্পর্ক এবং স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি লইয়া (কঠোরতা-কোমলতা এবং শাসন ও সেবা সম্বন্ধে) আলোচনা করা যাউক।

স্ত্রী পুরুষের অধীন না হইলে স্ত্রীকে পুরুষের সমান কাজ করিতে হইত; কিন্তু তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তাই নানা কারণে স্ত্রীর অপটুতায়, স্বভাব ও সমাজ উভয়ে মিলিয়া সংসারের সমধিক পরিশ্রম-সাধ্য কঠিন কার্য্যগুলি পুরুষের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিল। সেই হইতে পুরুষ এত-কাল কঠোরতার মধ্যে গঠিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির দুইটি মূর্ত্তি,—কঠোর এবং কোমল। স্ত্রী তাই সমাজের কোমলভাগে পরিণত হইয়াছেন। এই কোমল-কঠোর বৈষম্য না থাকিলে সমাজ-সংসার টিকিত না। লেখিকা যে 'Sweet home' এর কথা বলিয়াছেন, সে Home এ কি হয়?—

"Here man, creation's tyrant casts aside
His sword and sceptre, pageantry and pride,
While in his softened looks benighly bend
The sire, the son, the husband, brother, friend."

হেথায় মানব,—সংসারশাসক আসি'
ত্যজি সুখে হাসি'
ভীম অসি, রাজদণ্ড, সমারোহ আর,
দণ্ড যত তা'র,
আনত নয়ন প্রেমে অভিভূত হিয়া,
প্রেমে শিহরিয়া
পিতা, পুত্র, পতি, ভ্রাতা, প্রিয়বন্ধু-সম
রাজে অনুপম!

আর এ গৃহে—

"Here woman reigns; the mother, daughter, wife,
Strew with fresh flowers the narrow way of life!"

ললনার লীলাভূমি এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবে
জায়া, মাতা সবে

কঠোর জীবন পথ দেয় বিছাইয়া

প্রেমপুষ্প দিয়া !

এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবের ললনারাজ্ঞীর কেমন মূর্ত্তি ?—

"In the clear heaven of her delightful eye,
An angel-guard of loves and graces lie"

নির্ম্মল উজল তাঁর গগন-তুলন

প্রশান্ত নয়ন,

রাজে তাহে প্রেম দয়া, স্নেহ মূর্ত্তিমান,

মমতা কল্যাণ !

আর কিরূপ তথাকার কর্ম্মের চিত্র ?—

"Around her knees domestic duties meet,
And fireside pleasures gamble at her feet"

লক্ষ গৃহকার্য্য হয় সম্পাদিত দ্রুত

সে শক্তি সম্ভূত

করুণায়। প্রেমনৃত্যে খেলে শিশু হর্ষে

তারি পদপার্শ্বে।

পাশ্চাত্য দেশেও সুগৃহের ইহাই প্রকৃত আদর্শ চিত্র। বাস্তবিক অন্তঃপুর মধ্যে মমতা কল্যাণ ঢালিয়া দিয়া, শান্তির অনন্ত বিমল আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদনই স্ত্রীর সেবাব্রত। রাজা যদি প্রকৃত পক্ষে দেশের সেবক, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ললনা-রাজ্ঞী তবে গার্হস্থ্য ব্যাপারে সেবিকা দাসী না হইবেন কেন ? সংসারে প্রলয় এবং বহ্নিসংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সমাজে এই শান্তির বিধি হইয়াছে। শান্তিপূত অন্তঃপুরের শান্তিময়ী এই কোমলা মূর্ত্তি— রমণী ; আর কঠোর বহিঃসংসারের কঠিন ছবি—পুরুষ। পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ হইলেও কোমলতা ও কাঠিন্যানুযায়ী রমণী ও পুরুষের কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকার। স্ত্রী পুরুষের অঙ্গবিভাগ দিবা-রাত্রির ন্যায়। পুরুষ তপ্ত দিবাভাগ,— রমণী জ্যোৎস্নাময়ী স্নেহশান্তিরূপিণী যামিনী। অথবা পুরুষ কুঠারের লৌহ-ফলক, স্ত্রী তাহার কাষ্ঠদণ্ড। উভয়ের সহায়তা ভিন্ন সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা চলেনা। কিন্তু উভয়ের কর্ম্ম পাশাপাশি,—অথচ বিভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'তে এ তথ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। পুরুষ-ভাবে গঠিত হইলেও প্রফুল্লকে পরিণামে পতি ব্রজেশ্বরের স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া সেবাব্রত গৃহিণীধর্ম্ম

গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বামিত্ব স্বীকার করিলেই 'গোলাম' হইতে হয় না, —অভিভাবক স্বীকার করা হয় মাত্র। এরূপ না করিলে সভ্যতার গৌরব করা যায় না; সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।

"পুরুষের গৃহই স্ত্রীর গৃহ, স্ত্রীর স্বতন্ত্র গৃহ নাই"।

ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। যেমন বীজগত বংশ এবং ক্ষেত্রের নামকরণ হয়, তেমনই পিতৃগত কুল এবং গৃহের নামকরণ হয়। ইহা কৃত্রিম সভ্য-সমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণোদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিধি। স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহ হইলে সমাজ-বন্ধনে শিথিলতা আসিত। পাশ্চাত্য দেশে অনেকেরই গৃহ নাই; পিতা আসিয়া পুত্রের আবাসে ভোজন করিয়া গেলে 'বিল' পরিশোধ করিতে হয়। সে দেশেও স্বামী স্ত্রীর আবাস স্বতন্ত্র নহে। সেরূপ স্ব-স্ব-প্রধান হইতে গেলে সমাজ থাকে না,—গৃহ থাকে না। প্রাচ্যের আদর্শ সেরূপ নহে। প্রাচ্যের সুদৃঢ় সমাজবন্ধনে হিন্দু-মুসলমান কেহই উক্তরূপ দৃশ্য কখনও দেখিতে চাহিবেন না।

"গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণীজগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে, নাই কেবল আমাদের। * * * * 'এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া' বলিয়া আমি ভুল করি নাই। ঐ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। যখন আমাদের চালের উপর খড় না থাকে, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়,—টুপ টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি, চপলাচমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই,—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি! * * * অথবা গেরস্তের বৌ-ঝি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি। আর যখন চৈত্রমাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিসপত্র সহ ধাউ ধাউ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!! (জানি না, কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কিনা!!)"

গ্রন্থকর্ত্রী ভুল বুঝিয়াছেন। কন্যাকে পিতামাতার, বধূকে শ্বশুর-শাশুড়ীর অভিভাবত্ব স্বীকার করিতে হইবে না—এ কেমন কথা? তবে পুত্রও ত পিতার অভিাবকত্ব স্বীকার না করিলে পারে! এই সকল কথায় কি সমাজ-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝা যায়? স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য প্রকৃত সমাজ-সম্মত হইতে

পারে না। এ যে মানবের সমাজ বন্ধন, ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীজাতিকে আশ্রয় দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। পুরুষ বরং আশ্রয়হীন হইয়া থাকিতে পারে, স্ত্রী সর্ব্বত্র তাহা পারেন না। সুতরাং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। যে কারণে অন্তঃপুরের সৃষ্টি, যে কারণে বোরকা ব্যবহারের প্রয়োজন, সেই সকল কারণেই স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ত্তব্য—সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্র—এক বা সমান নহে; এবং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। অভিভাবক-বিধি বিধান করিয়া সমাজ স্ত্রী-জাতিকে আশ্রয় দিয়াছে, -নানা বিপদ হইতে রক্ষার উপায় করিয়াছে। সমাজের এই উৎকৃষ্ট বিধি তাঁহাদের প্রতিকূল নহে,—এবিধি স্ত্রীজাতিকে কখনও নিরাশ্রয় করিয়া দেয় নাই।

"ইংরাজীতে Home বলিলে যাহা বুঝা যায়,'গৃহ' শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই।"

লেখিকা তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। স্ত্রী-পুরুষের গৃহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলে,—গৃহ অভিভাবক হীন হইলেই কি ঐ 'Home' হইত? ওরূপ হইলে বস্তুতঃ সে Home 'Sweet home' হইত না, Bitter home হইত। সম্মিলিত পরিবারের "গৃহ" যে শান্তি, যে সমবেদনা-সহানুভূতি,—পরস্পরের সহায়তায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায়—সুখনিকেতন হয়, হর্ষমধুর মুক্ত কল-হাস্যে মুখরিত হয়,—স্বতন্ত্র গৃহ সেরূপ হইত না। ঠাঁই—ঠাঁই হইলে শক্তি কমিত, স্ত্রী-পুরুষের 'পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ' আখ্যা অনর্থক হইত।

স্ত্রী যখন বৃষ্টিধারায় ভিজিতে থাকে, তখন কি পুরুষ-অভিভাবকের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে? যখন দুষ্টলোক-কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন কি স্ত্রীদিগকে রক্ষা করাই পুরুষের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্যস্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই?

তবে, এমন পুরুষ অভিভাবক যদি কেহ থাকেন, যিনি স্ত্রীর বিপত্তি কালে নিদ্রা যান, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা মৃত সমাজের ব্যক্তিগত বিকৃত চিত্র। তাহার সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক।

সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক; কিন্তু সে সংস্কার দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী হওয়া উচিত। শীতপ্রধান প্রতীচ্যে যে সকল সমাজবিধি সঙ্গত, উষ্ণ প্রাচ্যে সে সমস্তই ঠিক উপযুক্ত নহে। কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দ্বিবিধ শ্রেণীকে স্ব স্ব উপযোগীভাবে—কোমল এবং কঠোর এই দ্বিবিধভাবে গঠন করাই সঙ্গত।

অতএব,তাঁহাদের শিক্ষাও পুরুষের মত না হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যোপযোগী

হওয়া উচিত। প্রকৃত সুগৃহিণী যাহাতে হইতে পারেন, তাঁহাদের সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন। গ্রন্থরচয়িত্রী 'জেনানা স্কুল—কলেজ' চাহিয়াছেন। 'পাশ করা বিদ্যা' যদি 'শিক্ষা না' হইল,তবে জেনানা-স্কুল-কলেজের কি প্রয়োজন? * আর সেখানে শিক্ষাই বা হইবে কিরূপ? যত্ন করিলে মহিলারা গৃহেও যে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, গ্রন্থকর্ত্রীই স্বয়ং তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন। সমাজ উদার হইলে শিক্ষা লাভে স্ত্রীজাতির কোনই বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

তুলনায় স্ত্রীজাতির শক্তিহীনতা, কর্ত্তব্যের ও শিক্ষার বিভিন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা স্ত্রী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে। জননী-সন্তান সম্পর্কে জননীরূপ রমণীই সংসারে সর্ব্বপ্রধানা। এখানে পুরুষ নগণ্য,—জননীই সব। সন্তানের কাছে সংসার জননীর মহীয়সী শক্তির অপূর্ব্ব লীলা-ক্ষেত্র—জননীর অব্যক্ত অবর্ণনীয় অনন্ত প্রেমমধুর শান্তি মূর্ত্তিময় আনন্দভবন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই — জন্মিয়াই মাকে দেখে;—কাঁদে মা বলিয়া, জানে কেবল মাকেই। মার স্তন্য-অমিয়-ধারা পান করিয়া আনন্দে বিভোর হয়। মার বুকে শিশু সকল যাতনা, সকল ভয় ভুলিয়া যায়,—নির্ভাবনায়—মহাসুখে—নিশ্চিন্তে ঘুমায়! মার একটি মধুর চুম্বনে শিশু অব্যক্ত সুখে নাচিয়া উঠে,—প্রেমে প্রাণ ভরিয়া যায়। এইজন্য মা স্নেহময়ী, আনন্দময়ী, শান্তিময়ী,—সর্ব্বস্ব। মার স্নেহে শিশু বাড়ে, ক্ষীরামৃত ধারায় পুষ্ট হয়,—দেহ পায়, কান্তি পায়, বল পায়। মার ভাষায় প্রথম কথা ফুটে, মার কাছ হইতে প্রথম জ্ঞান উন্মেষিত হয়,—মা ভাষার জননী; মা জ্ঞানবিধাত্রী। এই জন্য ভাষা মাতৃভাষা, জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী মাতৃমূর্ত্তি। পিতার সঙ্গে শিশুর এ

* পূর্ব্বতন কালে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যে সকল স্ত্রী পুরুষোচিত বিদুষী হইয়াছিলেন, পুরুষের অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত,—আর তাঁহারা কয়জনে স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়াছিলেন? স্ত্রীর পুরুষোচিত বিদ্যা, আর পুরুষের স্ত্রী-উচিত বিদ্যাচর্চ্চায় প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা করা বেশীর ভাগ মাত্র। কোন কোন পুরুষ যে পাকপ্রণালী বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা না করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইত কি? এ বিষয়ে বরং স্ত্রী-লেখিকার কাছেই সমাজ আশা করিয়া থাকেন। পুরুষের লেখা বেশীর ভাগ মাত্র। পুরুষের সকল কার্য্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর সকল কার্য্য পুরুষে পরিবর্ত্ত-গ্রহণ করিলে যেমন অঘটন হইত, জাতিগত ও প্রকৃতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যার যার ইচ্ছামত কার্য্য লইলেও সমাজে সেইরূপ একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ঘটিত। কোন ব্যবসায়ই উৎকর্ষলাভ করিত না।

সকলের কোনই সম্পর্ক থাকে না।—যেমন ভাই ভগিনী পরিবারস্থ অন্য সকলে, তেমনই যেন পিতা একজন হিতৈষী আত্মীয় মাত্র। মার প্রেমে ভরপূরপ্রাণ, মার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিশু বাড়ে, কথা কয়, হাসে, খেলে। মার বুকে ঘুমায়, মার বুকে—মার হাতে খায়। মার হাত ধরিয়া হাঁটিতে শিখে; তারপর বাহির সংসারে বাহির হয়। এই জন্য মার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ,—মা বলিয়া সন্তানের এত প্রাণের টান। সংসারের কাহারও সাথে ত এমন সম্পর্ক নাই!—পিতার সঙ্গেও না!! এই জন্য মাতৃনামে মানুষের এত আনন্দ, মা ডাকিয়া এত সুখ—এত শান্তি। এই জন্য মার মর্য্যাদা সংসারের সকলের উপর।—বিশ্বের সকল বিষয়ে মার মহিমা দেখিবার জন্য অন্তর এত ব্যাকুল। মা নামে প্রাণে প্রেম উথলে, শরীরে পুলক দেয়, আবেশে নয়ন গলে—এই জন্য। শোকে সন্তপ্ত, যাতনায় জর-জর—নিরুপায়—নিঃসহায়ে এই জন্যই শান্তির আশায় মা, মা বলিয়া ছুটে! মা এই জন্যই মা! মার তুলনা নাই,—মার বড় নাই। মাতৃরূপে জননীজাতি নিখিল ভুবনে অতুলনীয়, মা নিখিল নম্যা। মাতৃরূপিণী জননীজাতির চরণধূলি রেণুতে এমন কোটি কোটি পুত্র—কোটি কোটি বিশ্ব যুগ-যুগ হইতে প্রেমবিভোরে লুটাইয়া ঘুমাইতেছে। *

বলিয়াছি, পাশ্চাত্য আদর্শ প্রাচ্যের উপযোগী নহে। গ্রন্থরচয়িত্রীর নামের পূর্ব্বে 'মিসেস্' সংযোগ দেখিয়া পাশ্চাত্যে যে তাঁহার অনুরাগ আছে, তাহা বুঝিলাম। ইহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়। প্রাচ্যের কি কিছুই নাই,—না ছিল না? আমরা জানি, প্রাচ্যের সংস্পর্শেই পাশ্চাত্য আজ এত উন্নত। কাচ, টিন, মাটির দুইটা বিলাস-সামগ্রী, তামসিক উন্নতিসূচক ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া নবাভ্যুত্থিত প্রতীচ্য উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাব-বৃদ্ধ প্রাচ্য কি সর্ব্বথা তাহার অনুকরণ করিবে? আমরা এমন কথা বলি না যে, পাশ্চাত্যের কাছে বর্ত্তমানে আমাদের কিছুই শিখিবার নাই; কিন্তু প্রকৃত সভ্যতা এবং সমাজাদি সম্বন্ধেও কি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে যাইবে? আমাদের বহির্ব্বাটী যে কারণেই হউক, পাশ্চাত্য ভাবসাগরের তরঙ্গ মধ্যে ডুবু-ডুবু। আমাদের অন্তঃপুরও যদি ঐ ভাবে ডুবিতে যায়, তবে বড় আশঙ্কার কথা। আমরা তাহা আশা করি না। অন্তঃপুরে প্রাচ্যভাব

---

* মার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও পুরুষ-শিশুতে পৌরুষভাব ফুটে, কন্যা কোমল হয়—স্বভাবের নিয়মে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। (লেখক।)

আছে বলিয়াই আজও প্রাচ্যের চিহ্ন সংসারে টিকিয়া আছে। আমরা কামনা করি, প্রাচ্য-ললনা প্রাচ্যভাবে জাগিবেন।

ভারতললনা না জাগিলে দেশ জাগিবে না সত্য, কিন্তু জেনেনা-কলেজ করিয়া পুরুষের পূর্ণদাসত্ব শিক্ষার দিনে স্ত্রীরাও দাসত্বোপযোগী শিক্ষা শিখিলে এবং সেই ভাব সন্তানাদিতে বর্ত্তাইলেই কি দেশ জাগিবার উপায় হইবে? এ শিক্ষা ত শিক্ষা নহে। বরং দেশ জাগাইতে হইলে পুরুষেরও বর্ত্তমান শিক্ষার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ভারতললনা প্রকৃত ভারতললনার উপযুক্ত সুগৃহিণী এবং সুজননী যাহাতে হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা পাইলেই দেশ জাগিবে,—অন্যরূপ শিক্ষায় নহে।

অতএব সন্তানকে সুসন্তান করিতে হইলে সুজননী গঠন কর্ত্তব্য। এইজন্য আমরা অন্তঃপুরে জননীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে চাই। অন্তঃপুরে মুক্ত বায়ুর, মুক্ত আলোর প্রবেশ দেখিতে চাই। উপযোগী স্ত্রীশিক্ষায় সমাজের উদারতার আকাঙ্ক্ষা করি। ব্যায়াম,—সুগৃহিণীরা তাঁহাদের গৃহকার্য্যগুলি যত্নে সুলক্ষ্যে সম্পাদন করিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা এইরূপ সংস্কারই কামনা করি। ইহাতে তাঁহাদের ভীরুতা ঘুচিবে, অথচ কোমলতার ব্যাঘাত ঘটিবে না। প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্য ভাবে নহে; প্রাচ্য ভাবেই হইবে।

এখন এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যখন 'নবনূরে' স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছিলাম, তখন ঐ সকলের কতক কথায় সহানুভূতি ছিল, কতকে ছিল না। সাময়িক দুই একটা প্রতিবাদও হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে। তখন জানিতাম না, লেখিকা পূর্ব্বাকারেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থনিবদ্ধ করিবেন। এ কয় প্রবন্ধে 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধে সংস্কার আবশ্যক ছিল। তথাপি তাঁহার 'মতীচূরে'র দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আশায় সকল সাহিত্যহিতৈষীই উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন; আমরাও রহিলাম। ভরসা করি দ্বিতীয় ভাগে আমরা মনোমত বস্তু পাইব। 'পিপাসা' আমাদিগকে যেরূপ পিপাসিত করিয়াছে, আমরা অচিরে তদুপযুক্ত সুশীতল জল পাইবার কামনা করি।

ভগবানের কাছে আমরা রচয়িত্রীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। আর কামনা করি,—সমাজের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল প্রকৃত ক্ষত চিত্র দেখাইয়া সমাজ সংস্কারে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, সে সমস্তের উপযুক্ত

সংস্কার হউক। তাঁহার মঙ্গল-উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক,—তাঁহার পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করুক।

যাঁহার সহায়তায় তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-প্রসূত এ অমূল্য রত্নখণ্ড তিনি তাঁহার সেই হৃদয়বান ভ্রাতার নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু লেখিকার নহে, পাঠকেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই সহৃদয় ভ্রাতার প্রতি স্বতঃই উৎসারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। গ্রন্থরচয়িত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য ভাল বুঝিয়াছিলেন; পাঠকেরাও কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

গ্রন্থকর্ত্রীর সাধনা সফল হউক। গ্রন্থের কোন-কোন বিষয়ের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা তাঁহার লেখনীর ক্রমোন্নতি ও সাফল্য বাঞ্ছা করি।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

দুঃখের বিষয় বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকি। গ্রাহকগণ মূল্য সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। আমাদের সকাতর প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিতেছেন না। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সকলের সাহায্য না পাইলে আমরা নিরুপায়। গ্রাহকগণের নিকট নিয়মিত মূল্য প্রাপ্তির উপর যে পত্রিকার জীবন-মরণ—উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গ্রাহক-গণের অমনোযোগিতা পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের অন্তরায় স্বরূপ। তাঁহাদের নিকট সময়ে মূল্য না পাইলে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও প্রচার অসম্ভব।

আমরা এখন হইতে "কোহিনুর"কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া বাহির করিতে প্রয়াস পাইতেছি। বঙ্গীয় মোস্‌লেম সমাজের প্রধান প্রধান লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং কৃতবিদ্য প্রত্যেক লেখকই ইহাতে স্ব স্ব লেখনী পরিচালনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সহৃদয় খ্যাতনামা কৃতী হিন্দু লেখকগণও ইহাতে মাসে মাসে লিখিতেছেন এবং লিখিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছেন। এখন গ্রাহক মহোদয়গণ ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিলে ইহার উন্নতির সমূহ ব্যাঘাত হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে দেয় মূল্য অবিলম্বে প্রেরণ করিয়া কোহিনুরের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের সহায় হইবেন। গ্রাহক-বর্গের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। নিবেদন ইতি।—

সিদ্ধি। *

(১)

যুগ, যুগ, শত যুগ—
নীরবে, নিঃশব্দে, ধীর অকম্পিত শঙ্কিত চরণ,—
উপলে কঙ্করে নাহি অণুরেখা করিয়া অঙ্কন
চলে গেল, নিখিলের রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত বন্ধুর
সুদূর সীমান্ত পথে।—জানিল না একটী অঙ্কুর!

জানিল না, জাগিল না, মহাঘুমে নিঝুম নিথর
আজন্ম অধ্বংস-মৃত্যু-আলিঙ্গী সে কঠিন প্রস্তর
বিলুণ্ঠিত, কুহকীর মন্ত্রবদ্ধ অজগর প্রায়
অনাদি—অনন্ত ঘোর অনাহত অভঙ্গ নিদ্রায়।

লক্ষ শূল—নভোভেদী লক্ষকোটী মহা তীক্ষ্ণ বাণ
দারুণ আঘাতি' নিত্য লক্ষ মুখ খুলি' জ্বলমান
নিয়ত প্রয়াসি' সে যে শত চূর্ণে হয়েছে নিস্ফল,—
অধ্বংস মরণে যেন বিশ্ব-ভবে সে চির-নিশ্চল!

অখিলের মহাজ্যোতি ক্লান্ত এবে—বিশুষ্ক-দহন,
ঘুচিল না সে তামসী, ঢালি' এত অকুণ্ঠ কিরণ!
জ্বলদগ্নি শ্মশানের মৃদঙ্গার স্তূপিত করাল
ধরণী-সীমান্ত দূরে হরগিরি ভীষণ বিশাল।

(২)

একদিন সহসা কখন—
লজ্জাহত, চমকিত, স্তব্ধ, করি' আড়ষ্ট মন্থর
অতর্কিত পবনেরে,—কোন্‌খানে খসিল কঙ্কর—
কোন্ মৃদু পরশে চঞ্চল!

---

* হরপর্ব্বত-শিখরে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জ্যোতি দর্শন।

চমকিত গিরিতল ;
শিহরিল বালু, রেণু, শিহরিল সমস্ত উপল—
অব্যাহত নীরবতা—অমন্থন—আকুল-নির্ভর,—
এ কি, কোথা গিরিতলে কোথা এ যে পত্রের মর্ম্মর !

স্তরে, স্তরে, মর্ম্মে মর্ম্মে—মরমের গূঢ় অন্তঃপুর
তড়িদিম সুচমকে খেলে গেল সেই ক্ষীণ সুর !
আলোড়িয়া সে কম্পন মুহূর্ত্তেকে উঠা'ল উছসি'
শতযুগ-পুঞ্জীকৃত সূচীভেদ্য ভীষণ তামসী !

কেন্দ্রে-কেন্দ্রে শিহরিল যুগ-যুগ-অনড় প্রস্তর,
কোটিলক্ষ নবাঙ্কুরে রোমাঞ্চ-পুলক থর-থর !

ধীরে, ধীরে অপসৃত তামসীর রুক্ষ জটাজাল,—
সহসা খুলিল ঊর্দ্ধে শেখর-গহ্বর সুবিশাল।
ধ্যানমগ্ন মহাসনে কি সুন্দর মহান্ গম্ভীর
অনবদ্য সৌম্য মূর্ত্তি উজলে সে শেখর-মন্দির !

(৩)

হর পর্ব্বতের শিরে—
ধীরে, ধীরে, অনন্তরে রচি' সূক্ষ্ম পথ হিরণ্ময়
নবারুণ-আলোকিত হ'ল সেই প্রভাত উদয়।
ধীরে, ধীরে, কুশাঙ্কুরে, তরুশিরে জাগিল চেতন,
তরঙ্গিয়া প্রকৃতির কনকিত শ্যামল কেতন।
ধীরে, ধীরে, গন্ধপূত মুকুলিত সুপল্লবদল
শত পুষ্পে বিকসিত বল্লভের সংগীত-বিহ্বল।

ধীরে, ধীরে, চারিদিকে উঠিল কি অব্যক্ত মধুর
সুমৃদু মোহন তান—অজানা সে শিহরণ সুর !
সে গীতের মধুধ্বনি কি ভঙ্গীতে পশিল শ্রবণ,—
পলকে সে সারা গিরি সঙ্গীতের পুণ্য তপোবন।

(৪)

শৈলময় প্রতি রেণু মাঝে—
শ্যাম সৌন্দর্য্যের যেন পরিপূর্ণ প্রফুল্ল উল্লাস,
হিল্লোলিত তৃণকুঞ্জে মাখামাখি প্রমত্ত উচ্ছ্বাস।
মৃদু-তপ্ত সৌরকরে পত্রে-পত্রে কন্দর শিখর
উৎসরে সহস্রধারা তরলিত জ্যোতির নির্ঝর।

উর্দ্ধ শৃঙ্গে জ্যোতিতলে বিটপীর শ্যাম ঘন ছায়
সুশীত নিবিড় কুঞ্জ, স্নিগ্ধ, মৌন মৃদুল প্রভায়।
ধীরে ধীরে, তরুতলে চারুচিত্র অতুল শোভন
জাগিল কুটীর এক, পর্ণে-পর্ণে নিপুণ রচন।
ধীরে ধীরে, উৎসরিল কোথা উৎস কোন্ গুল্মতল ;
বিদারি' তরুর গ্রন্থি বাহিরিল সুধাকুম্ভ ফল।
কেহ না জানিল কিছু, ধীরে ধীরে কখন সঞ্চার
নির্জ্জীব অচল-তলে সজীবতা-ললামসম্ভার।

কখন্, কুটীরদ্বারে, কম তৃণ পরশ-বিধুর,
মৃদুল নিক্কণে ওঠে বেজে কোন্ সংযত নূপুর !
কুটীর-দুয়ার হ'তে দরী-তল স্পর্শে ধীরি ধীর
অঙ্কে গিরির অঙ্গে পথ-রেখা কুটিল রুচির !

সেই বনপথে নিত্য দলি' উচ্ছ্বু নূপুর শিঞ্জন
ধীর-মন্দ পদক্ষেপে স্নিগ্ধ ভাতি করি' বিকীরণ
অভূষণ অর্ঘ্য বহি' অবহিত অভঙ্গী-সুন্দর
কল্যাণীর মৃদু গতি অদূর সে সাধন-গহ্বর।

তথা মহাযোগাসনে—বিশ্ব হতে পরম গোপন
তত্ত্ব-জলধির তলে মহাযোগী ধ্যান-নিমগন।
নিত্য অর্ঘ্য সাজাইয়া, নিরখি' সে মহামূর্ত্তি স্থির
ফিরেন কল্যাণী পুনঃ বনপথে আপন কুটীর।

কতদিন এই ভাবে।—সারা গিরি কিরণ-উজ্জ্বল ;
লুটি' বনভূমি ছোটে মুক্ত লাস্যে পবন চঞ্চল।
মুখরিয়া বনভাগ লক্ষ রাগে সে কি অফুরণ
—সহস্র যুগের গীতি বিকসিতে,—আলাপ পঞ্চম !
উদ্দাম শিশুর মত বিশ্বগ্রাসী উল্লাসে অধীর
কি উচ্ছ্বাস, সদ্যস্ফুট কর-দীপ্ত হর-প্রকৃতির !

(৫)

নিঃশব্দ নীরব—
সহসা প্রভাতে আজ, স্তব্ধ, রুদ্ধ হরগিরি-শির,
না চলে নয়ন, ভেদি' আবরণ ভীম কুজ্ঝটীর।
ধূ ধূ শ্বেত ধূম্রময় সুগম্ভীর সমস্ত অম্বর,
পবন-সঞ্চার ক্ষীণ, থাকি' থাকি' একান্ত নিথর।
কঙ্কর, বালুকা স্তব্ধ, স্তব্ধ যত সঙ্গীতের তান,
নির্বাত—নিষ্কম্প—স্থির—ভূধরের প্রকৃতি মহান্।

শ্যাম তরু, শ্যাম তৃণ, সুগভীর গহ্বর-গরভ
বিশূন্য-উছাস সব ;—উল্লাসের নাহি উপদ্রব।
নাহি কলরব কোন, চঞ্চলতা কোন উচ্ছৃঙ্খল,—
শৃঙ্খলিত শান্তি যেন রাজে ব্যাপি' সমগ্র অচল।
কেবল উদগ্র এক মহাভাবে যেন অনিবার
কি এক অতুলা শক্তি ঊর্দ্ধে—অধেঃ বাঁধিছে সংসার !

আজি যেন কেন্দ্রীভূত অকল্লোল বিনিরুদ্ধ-শ্বাস
এক মহাবিন্দু মাঝে সাধনার জলধি-আকাশ,—
বিশ্বের কল্পনা, চিন্তা, মর্ম্মোত্থিত ভাব-উর্ম্মিচয়—
সমস্ত কম্পন যেন এক ব্যূহে পরস্পরে লয় !

ধ্যানমগ্ন মহাঋষি—মূর্ত্তি আজ পূর্ণ-জ্যোতিষ্মান্,
আত্মার সকল দ্যুতি বিকশিত অনল সমান।
প্রতি রোমে-রোমে যেন বিলিখন সাধনা উন্মুখ—
সমস্ত বিশ্বের ধ্যান পাইয়াছে পূর্ণ পুণ্যালোক !

পরিপূর্ণ পুলকের, পরিপূর্ণ পরমসিদ্ধির
অনন্ত আলোকে যেন প্রতিভাত পুণ্য পুত শির।
পদতলে কম্প্রবক্ষা, বিস্ফারিত দৃষ্টি অপলক
কল্যাণী,—কপোল ঘিরি' বিথরিত বিচূর্ণ অলক,—
বিমুগ্ধা, নিরুদ্ধশ্বাস,—কোথা স্বর্গ, কোথা মর্ত্ত্যালোক,
কোন্ মহারন্ধ্র পথে এতদূরে আসিবে আলোক!

সহসা সমস্ত বিশ্ব পড়ে গেল মূর্চ্ছিত কখন—
ঈষদনুভবি শুধু—কোন্ দূরে কিসের কম্পন!

* * * *

দাঁড়াইলা গিরিচূড়ে সুধা-স্নাত নির্ম্মল-সুন্দর
—নবারুণ-আলোকিত শৈলশিরে সুবর্ণশিখর—
কল্যাণীর কর ধরি',—বিশ্বে-বিশ্বে ঘোষিল বিষাণ
পরব্রহ্ম-মহালোকে সাধনার পূর্ণ অবসান।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

জাতীয় জীবন।

(২)

বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানগণের দারিদ্র্যের যে সব কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আর ও ২।১টী কারণ আছে। যে জন্যই হউক দিন দিন আহার্য্য প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। আগে যে পয়সায় যে পরিমাণে জিনিস পত্র মিলিত, এখন সে পয়সায় আর তা মেলে না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল তাহা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের মূল্যত৷ ৪গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিস্তারে আমাদের নানা প্রকার বিলাসিতা প্রভৃতি এত বাড়িয়াছে, যে, বড় চাকুরেদেরই অনেক সময় অভাব ঘোচে না শুনিতে পাওয়া

যায়। ২০।২৫ বা ১০।১৫ টাকা বেতনের ছোট চাকুরেদের ত কথাই নাই। যদি জিনিস পত্র আগের মত সস্তায় মিলিত, বিলাসিতার বাজে খরচ এত না বাড়িত, তবে অন্ততঃ যাঁহারা চাকুরী করেন বা কোনও মতে পান তাঁহাদের এক রকম দিন চলিত। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহদের আমলে বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানদের অবস্থা এত হীন ছিল না। তখন ভদ্রলোকগণ সকলেই একেবারে চাকুরীর উপর নির্ভর করিতেন না। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য নিজেরাই অনেক উৎপাদিত করিতেন। ভদ্র গৃহস্থগণের সকলেরই প্রথমতঃ এই প্রধান লক্ষ্য ছিল, যাহাতে কিছু ক্ষেত্ত খামার করিতে পারেন, যে, বৎসরের প্রধান খাদ্য চাউল ও কলাই না কিনিতে হয়। ইহা ছাড়া গৃহস্থদের নানা প্রকার আহার্য্য জন্মাইবার প্রবৃত্তি ও যত্ন ছিল। এই প্রবৃত্তি ও যত্নফলে বসতবাটীসংস্পৃষ্ট বাগানে নানাপ্রকার ফল ফুলুরী ও তরী তরকারী জন্মিত, পুকুরে অনেক মাছ পাওয়া যাইত, গৃহপালিত গাভী দুগ্ধ দিত, গৃহিণীরা সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখনাদিও প্রস্তুত করিতেন। সুতরাং আহার্য্য পদার্থ ভদ্র গৃহস্থের মধ্যে অনেকের অতি কমই কিনিতে হইত। যাহা কিনিতে হইত, তাহা অনেক সুলভে মিলিত। এই সব কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য কেহ না কেহ বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু এখন বাড়ীতে থাকিয়া গৃহস্থালী করিবার প্রবৃত্তি কাহারও বড় নাই। সকলেই বিদেশে যাইয়া চাকরী করিবার জন্য ব্যস্ত। এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে ভদ্র গৃহস্থগণ নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়া ক্ষেত খামারের চাষ বাস, বাড়ীতে বাগান পুকুর গাভী ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। ইঁহারা শিক্ষিত চাকুরে না হইলেও, অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক চাকচিক্য ইঁহাদের মধ্যে না থাকিলেও, বাঙ্গালার ভদ্রলোকদের মধ্যে ইঁহারাই সুখী, ইঁহাদেরই অবস্থা ভাল ;—বর্ত্তমানের ভীষণ দারিদ্র্য ইঁহাদিগকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

তার পর এখনকার নব্য বাবু ও বাবুগৃহিণীগণের মত তখনকার গ্রাম্য গৃহস্থ ও গৃহিণীগণের এত বিলাসিতা ছিল না—এত নানাবিধ কাপড় জামা জুতা অলঙ্কারাদি লাগিত না। বাজার করিতে চাকর দরকার হইত না, ঘরের বেড়ার বাঁধন ছিঁড়িলে ঘরামী লাগিত না, লাউ কুমড়া-গাছের গোড়ায় একটু মাটি দিতে কৃষাণ লাগিত না, বামুন না হইলেও পাক হইত, ঝি না থাকিলেও বাসন মাজা চলিত, দেশলাই ছাড়াও প্রদীপ জ্বলিত ; বার্ডসাই মিলিত না, ফুটবল ক্রিকেটের চাঁদা ছাড়াও খেলা হইত, চা পান ব্যতীত শরীর সুস্থ থাকিত, সোডা লিমনেড্ ছাড়া হজম হইত, কুন্তলীন বিনা কেশ বিন্যাস চলিত, অডিকোলন ল্যাভেণ্ডার

ছাড়া মাথা ঠাণ্ডা থাকিত,—কত আর বলিব? দারিদ্র্য দুঃখ কি এক রকমে বাড়িয়াছে? এক রকমে কি আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে? আমরা কাচের চাকচিক্যে সোনা ছাড়িয়াছি; চক্ষু নষ্ট করিয়া চশমা পরিয়াছি; নদী সেঁচিয়া রাস্তা বাঁধিয়াছি; ধানের ক্ষেতে টেনিস খেলিতেছি; কীর্ত্তন ছাড়িয়া বল নাচিতেছি।

বাঙ্গালী দরিদ্র, তাই বাঙ্গালী দুঃখী। কিন্তু যে সব গুণে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য সে সব গুণ যদি বাঙ্গালীর থাকিত, তবে এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙ্গালী মানব সমাজে আদৃত হইত;—হীন অধঃপতিত জাতি বলিয়া জগতে হেয় হইয়া থাকিত না। যে কারণে বাঙ্গালী দরিদ্র, ঐ সব গুণ থাকিলে সে কারণ দূর করিয়া বাঙ্গালী দারিদ্র্য ঘুচাইতেও পারিত। নিজের বুদ্ধি ও প্রকৃতির দোষে যেখানে লোকে দুঃখ পায়, সেখানে আর কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও প্রতিকূল ঘটনা প্রভাবে লোকে নিজ দুঃখ দূর করিতে অসমর্থ হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। সে জন্য দুঃখীকে সকলেই সহানুভূতি করে, কেহ দোষ দেয় না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক অধোগতিও বাঙ্গালীর দুরবস্থার আর একটী প্রধান কারণ। সুস্থ সবল কর্ম্মঠ এবং শ্রমক্লেশ-সহিষ্ণু দেহ মানবজীবনের প্রধান কাম্য বিষয়। জীবনের কর্ত্তব্য পালনের জন্যই হউক অথবা সুখ ভোগের জন্যই হউক, এরূপ শক্তিসম্পন্ন দেহ ব্যতীত মানব জীবন ব্যর্থ। বাঙ্গালী সাধারণতঃ নানা রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ। বাল্যাবধি বাঙ্গালী এরূপ অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হয়, যে, সুস্থ সবল দেহসৌভাগ্য লাভ তার পক্ষে বড়ই দুর্ঘট। অতি শৈশবেই বালকগণ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। আমাদের গরম দেশ, তাই বরাবর নিয়ম ছিল, প্রাতে ও অপরাহ্নে লোকে কাজ করিত, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। প্রাচীন কালের রাজসরকারে কাজ কর্ম্মের ঐ ব্যবস্থা ছিল শুনিয়াছি। এখনও সেকেলে দেশী ভাবে যেখানে কাজকর্ম্ম হয়, অর্থাৎ জমিদারসরকারে, টোলে ও পাঠশালা প্রভৃতিতে ঐ নিয়ম দেখা যায়। শীতপ্রধানদেশবাসী ইংরেজ-রাজার নিয়মানুসারে এখন সব উল্টা হইয়া গিয়াছে। শিশুর বিদ্যালয় হইতে প্রবীণের আফিস কাছারী প্রভৃতি সবই দুপুরে বসে। দুপুরের গরমে বালক-গণকে উপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচল বিহীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয় গৃহে ৪।৫ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকিতে হয়। পাঠ্য বিষয় ও পুস্তকাদি তাদের কোমল মস্তিষ্কের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ এবং দুঃসহ ভারবৎ। শিক্ষাদান প্রণালীও সেই দুঃসহ ভারের উপর কঠোর

আঘাত মাত্র। অনেক স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি সেই কঠিন আঘাতে জড়নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। অতি অল্পসংখ্যক বালকেই প্রকৃত বিদ্যা-ভ্যাসের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। কেবল অযথা শরীর ও মস্তিষ্কের ক্ষয়ই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ফল দেখা যায়। ছেলেরা স্কুলে যাক, রাতদিন পড়ুক, ভাল পাশ করুক, আমরা এই চাই। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারেই নাই। অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এবং সুস্থ সবল দেহ গঠনের জন্য ব্যায়াম ক্রিয়াদি এবং পুষ্টিকর আহার্য্য নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি একেবারেই নাই। বালকগণের ক্রীড়া ও ব্যায়ামপ্রসক্তি আমরা ভাল চক্ষে দেখি না। বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়াই আবার সন্ধ্যাপর্য্যন্ত যদি ছেলে পড়ে, মোটে বাড়ীর বাহির না হয়, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের ভাল ছেলের প্রধান লক্ষণও ইহাই। কিন্তু এই ভাল ছেলে যে কালে নানা ব্যাধিগ্রস্ত ও সর্ব্বকর্ম্মে অক্ষম হইয়া দুর্ব্বিসহ দেহভার কোনও মতে বহন করিয়া মৃতবৎ জীবন কাটাইবে, তা আমরা একেবারেই বিবেচনা করি না। বালকগণের ব্যায়াম সম্বন্ধে যেরূপ, তাদের উপযুক্ত আহার সম্বন্ধেও আমরা তদ্রূপ উদাসীন। অনেকে দারিদ্র্য বশতঃ সন্তানের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু যাঁরা পারেন তাঁরাও করেন না। সর্ব্বদা নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনার জন্য আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক সর্ব্বদা ক্ষয় হইতেছে। একমাত্র উপযুক্ত আহারেই সেই ক্ষতির পরিপোষণ হইতে পারে। স্বাস্থ্য নীতির এই গূঢ়তত্ত্ব আমরা জানি না, জানিয়াও বড় গ্রাহ্য করি না। মিতব্যয়ী গৃহস্থ আহার্য্যের ব্যয়সংক্ষেপে যা কিছু মিতব্যয়িতা দেখান। অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্ম, ভদ্রোচিত চাল চলন বেশভূষা সবই নিয়মমত চলিতে থাকে। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং" ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ। এই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যা আমরা বাঁচাইতে পারি, তাই অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা সাধারণতঃ এই ধর্ম্মের হানি করিয়া অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করি। যা দিয়াই হউক কোনও মতে দুবেলা পেট ভরিতে পারিলেই আমরা মনে করি, যথেষ্ট আহার হইয়াছে। কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে শরীর পুষ্টি, কেবল উদরপূর্ত্তি নয়, একথা আমরা মনেই করি না। এই উদ্দেশ্য এবং ইহার অত্যাবশ্যকতা যদি আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তবে অযথা ভদ্র লোকের চাল চলন ইত্যাদি ছাড়িয়াও—চাষার মত থাকিয়াও—দেহ-রক্ষা-ধর্ম্ম আমরা পালন করিতাম। প্রথম বয়স—যে বয়সে

লোকের শরীরপুষ্টি ও শরীরগঠন হয়, সে বয়স আমাদের এই ভাবে কাটে; তারপর পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া যখন সংসারে প্রবেশ করি, তখন উদরান্নের জন্য চাকুরী অন্বেষণ, সেই চাকুরীতে রাত্রিদিন বদ্ধগৃহে মস্তিষ্ক চালনা, দারিদ্র্যজনিত নানাবিধ দুশ্চিন্তা, আহারের অভাব, শরীর চালনায় বৈমুখ্য ইত্যাদি কারণে পাঠ্যাবস্থায় ভগ্ন স্বাস্থ্য জীবনে আর শোধরাইতে পারি না। ইহার উপর বিলাতী সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে আমরা মজিয়াছি, বিলাতী বিলাসিতায় একেবারে গা ঢালিয়াছি। বিলাসিতা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আইসেনা, তবে যদি তাহাতে শরীর অকর্ম্মণ্য না হয়, তবে সচ্ছন্দ টাকা থাকিলে তাহাতে কোন বিশেষ হানিও দেখা যায় না। সাহেবদের টাকা আছে, তারা বিলাসীও খুব। কিন্তু এই বিলাসিতা সত্বেও সাহেবরা সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ। বিলাসী সাহেব অনেক কাজ করিতে পারে,—তার শরীরে অনেক সয়। বিলাসবিহীন সেকেলে পল্লী গৃহস্থও অনেক কাজ করিতে পারে, তার শরীরেও অনেক সয়। কিন্তু সাহেবী বাঙ্গালী বাবু না এদিক না ওদিক। তাঁর শরীর যে কি কাজের উপযুক্ত, তাঁর শরীরে যে কি সয় তা ভাবিয়া পাই না। দু পা চলিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইয়া তাঁকে পাখার বাতাস খাইতে হয়। ফ্লানেল নহিলে তাঁর গায় ঠাণ্ডা লাগে, জুতা মোজা নহিলে পায় ঠাণ্ডা লাগে, ছাতা :নহিলে মাথায় রৌদ্র সয়না, চা না খাইলে শরীরে স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহাতে কোথায় কার শরীর ভাল থাকে ? সুস্থ শরীরে হাওয়া রৌদ্র বৃষ্টি সব সহিবে, সুস্থ শরীর সকল কার্য্যে সমর্থ হইবে। শরীর সুস্থ করিতে হইলে তাহাতে হাওয়া রৌদ্র বৃষ্টি সহাইতে হয়, যাহাতে তাহা সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ হয়, তাই করিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু ফ্লানেল জড়িত হয়, ফ্লানেলে জড়িত হইয়াই পরিবর্দ্ধিত হয়। গরম দেশে অত সহিবে কেন ? সর্ব্বদা বসনাবৃত দেহ যখনই উন্মুক্ত হয়, তখনই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য আরাম ও পরিচ্ছন্নতা কিছুর জন্যই আমাদের দেশে অত কাপড় লাগেনা। ব্যবহার করিয়া অযথা অর্থ ব্যয়ও হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার শরীরটিও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলি। আবার পুনঃ পুনঃ স্বেদসিক্ত দুর্গন্ধ ইস্ত্রী করা সার্ট কোটে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যে কতদূর রক্ষা হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। নানা কারণে স্বাস্থ্য নাশে এবং ভোগবিলাসিতার প্রবল আসক্তিতে বাঙ্গালী দেহে পুরুষোচিত বলবীর্য্য, সামর্থ্য, দৃঢ়তা, কর্ম্মকুশলতা, শ্রমক্লেশ-সহিষ্ণুতা গুণ একেবারেই নাই। যে দেশে মাতৃকরচ্যুত শিশুভীমের দেহ ঘাতে

পাষাণ ভগ্ন হইয়াছিল; যে দেশের কবিগুরু কালিদাস "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শাল প্রাংশু মহাভুজ," প্রভৃতি বিশেষণে পুরুষরূপের আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন; যে দেশের আদর্শ রমণী মূর্ত্তিমতী কোমলতা সীতা চিত্রাঙ্কিত রামের "দেহ সোহগে্গণ অণাদর ক্ষুড়িদ সঙ্করসরাসণঃ" মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই দেশেই শিশিরস্নাত উষার সেফালীবৎ স্নিগ্ধলাবণ্যময় নধর কোমলদেহত্ব বাঙ্গালীপুরুষের দেহসৌভাগ্যের চরম আদর্শ হইয়াছে। বাঙ্গালীর দেহ যেন বিধাতা কুসুম শয্যার মাধুরীময় আরাম উপভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষোচিত কোন কার্য্যের জন্য নয়। দীন বাঙ্গালী ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ, শ্রমকাতর, ক্লেশকুণ্ঠ। অলস বাঙ্গালী সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম বিহীন, ভোগবিলাস ও আরাম বিরামে একেবারে গা ঢালা। হীন বাঙ্গালী নিজের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম সুখ স্বার্থ প্রভৃতি মানব জীবনে যা কিছু কাম্য, সমস্ত রক্ষার ভার পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত। পরে শিক্ষা দিলে বাঙ্গালী শিখিবে, পরে খাইতে দিলে খাইবে, পরে মান রাখিলে তার মান থাকিবে, পরে ধরিয়া তুলিলে উঠিবে, ফেলিয়া দিলে পড়িয়া থাকিবে, পড়িয়া পড়িয়া গালি দিবে। আমার ঘরে আগুণ লাগিয়াছে, আমি হুঁকাটি লইয়া আগুণের তাপ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলাম, পাঁচ জনে আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল; তাদের এমন কি গরজ যে আমার ঘরের আগুণ নিভাইবে? আমি নিজে যদি মাল কোঁচা আঁটিয়া কলসী কাঁধে করি, তারাও মাল কোঁচা আঁটিয়া কলসী কাঁধে করিবে। আমার গোলার ধান গুমিয়া নষ্ট হইতেছে, আমি শুইয়া থাকিব, আর কে আসিয়া সেই ধান শুকাইয়া ভানিয়া দিবে? ইংরেজের অধীন বাঙ্গালী, ইংরেজ যা করিতে দিবেনা, তা করিতে পারেনা। তাই বলিয়া যা পারে তাইবা করেনা কেন? সকল কাজেত ইংরেজরাজা আসিয়া আমাদের হাত চাপিয়া ধরেনা? ক্ষেত পড়িয়া আছে, চষিতে গেলে ইংরেজ হাল গরু কাড়িয়া লইবে না। জল কষ্ট হইয়াছে, আমরা পুকুর কাটিলে ইংরেজ সে জল সেঁচিয়া ফেলিবেনা। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে আমরা ক্ষুধার্ত্তকে ভাত দিলে ইংরেজ তার মুখ চাপিয়া ধরিবে না। আমাদের ছেলে পিলেকে আমরা মনোমত লেখাপড়া শিখাইলে ইংরেজ যাদুমন্ত্রে তাহা ভুলাইতে পারিবে না। আমরা গিয়া সাহেবের দোকানের বাবুয়ানা জিনিশ না কিনিলে তারা বাড়ী বহিয়া দিয়া যাইবে না। আমরা জোলার ধুতি পরিলে মাঞ্চেষ্টরের বণিক তাহা কাড়িয়া লইয়া তাদের কাপড় পরাইয়া দিবেনা। আমরা কেরাণী-

গিরি না করিলে ইংরেজরাজা গলায় গামছা দিয়া তাদের আফিসে টানিয়া নিবেনা। যদি নেয়, তখন উপায় নাই। যতদিন না নেয়, ততদিন কেন আমাদের কাজ আমরা না করিয়া ইংরেজ কেন করিল না বলিয়া গালি দিব? শান্তি পূর্ণ ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সভ্যতা বিস্তারে আমরা বড়ই উন্নত ও সভ্য হইয়াছি বলিয়া মনে করি। সর্ব্বত্র স্কুল কলেজে সহস্র সহস্র বালক ও যুবকের বিদ্যাভ্যাস, সভাসমিতি, বক্তৃতা আন্দোলন, প্রত্যহ সংবাদ পত্রে গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ, সরস তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায় শাসননীতির অবাধ সমালোচনা, এই সব দেখিলে সত্যসত্যই মনে হয়, আমরা যেন কত বড়ই হইয়াছি। কিন্তু সবই মাকাল ফলের বাহ্যিক শোভা,—তুবড়ী বাজির ফাঁকা জাঁকাল আগুণের ঝাড়। আমরা ইংরেজের মত ভাবিতে পারি, লিখিতে পারি, কথা কহিতে পারি; পারিনা কেবল ইংরেজের মত কাজ করিতে, ইংরেজের মত নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে। ইংরেজের মত সাজিতে শিখিয়াছি, ইংরেজের চাল চলনে চলিতে শিখিয়াছি; শিখিনাই কেবল ইংরেজের মত সাধারণ কর্ত্তব্যে স্বার্থ বলি দিতে, মন্ত্রের সাধনে শরীরপাত করিতে। ইংরেজের মত রাজার শাসননীতির দোষ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি, শিখিনাই কেবল রাজার শাসন কার্য্যের সাহায্যার্থে এক বিন্দু স্বার্থ ত্যাগ, এতটুকু আরাম বিরামের ব্যাঘাত করিতে। বাঙ্গালীর যা কিছু উৎসাহ উদ্যম ছাত্রজীবনেই দেখা যায়। সভাসমিতি আন্দোলন যেখানে যাই হউক, অঙ্গপুষ্টি ছাত্র সমাবেশেই হয়। ছাত্র বাদ দিলে বড় কিছু থাকেনা। ছাত্র জীবনে অনেক সভাসমিতি ও আন্দোলনে অদম্য উৎসাহ উদ্যম দেখাইয়া, কত উচ্চ আশা, উচ্চ সংকল্প বুকে লইয়া যুবকগণ সংসারে প্রবেশ করেন। খড়ের আগুণ যখন জ্বলে বেশ দেখায়, তবে দপ্ করিয়া পড়িয়া যায়। চাকুরে যুবক চাকুরীর নিশ্চিন্ত সুখ সম্ভোগের আরামে আলবোলার নলটি মুখে লইয়া, তাকিয়ায় গা ঢালিয়া একবার নয়ন মুদিলে, ভারত মাতার জীবন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি ক্রমে স্বপ্নের ক্ষীণ ছবি হইতে ক্ষীণতর হইয়া কোথায় মিলাইয়া যায়! তখন সাহেব ঠেঙ্গান হাতের লাঠি সাহেবের পথরোধকারী হীন নেটিবের পৃষ্ঠে পড়ে। ঘুসি বদ্ধ হস্ত কোমল হইয়া সাহেব চরণের আরাম সাধন করে। ওজঃস্বিনী বক্তৃতাময়ী রসনা সাহেব তুষ্টির মিষ্ট রস বর্ষণ করে। উপার্জ্জিত অর্থ সাহেব বণিকের অর্থকোষ পূর্ণ করে। জীবনের সমস্ত লক্ষ্য, সমস্ত সংকল্প, নিজের পদোন্নতি

ও পুত্র জামাতার চাকুরীপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। নিজের দোষ আমরা দেখিনা, দেখিতে চাইনা, কিন্তু দেখিলে বলিয়া শেষ করা যায়না। গভর্ণমেণ্ট ইহা করিল না, তাহা করিল না বলিয়া গালি পাড়ি। কিন্তু এমন হতভাগ্য অসারপ্রকৃতি জাতির উন্নতিসাধন প্রজারঞ্জনে সর্ব্বত্যাগেচ্ছু স্বয়ং রামচন্দ্র রাজা হইলেও করিতে পারিতেন না। আত্মোন্নতি সাধনে যত্নশীল ব্যক্তি বিপদে অন্যের সাহায্যে উপকৃত হইতে পারে। অলস ভিখারীর হাতে কুবেরের ধন সঁপিয়া দিলেও, দুদিন পরে সে যে ভিখারী সেই ভিখারীই হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। হিন্দু ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দুগণের অন্তরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি এক অতি ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক বিশ্বাস বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, মুসলমানধর্ম্ম Toleration শিক্ষা দেয় না এবং অসিবলেই বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ বিশ্বাস বা সংস্কার যে অতিশয় ভ্রমসঙ্কুল ও হিন্দু মুসলমানের মিলন পক্ষে মহদন্তরায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে একেবারে নিষেধ করা হইয়াছে; বরং অন্য ধর্ম্মের প্রতি Toleration বা উদার ভাব প্রদর্শন জন্য বিহিত আদেশ করা হইয়াছে। অসি সাহায্যে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার হওয়ার কথা যে সম্পূর্ণ অলীক, তাহা বহু লোকে বহু পুস্তকে বহু প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন। হিন্দু ভ্রাতৃগণ সেই সকল পুস্তকাদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাঁহাদের উল্লিখিত ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁহার প্রণীত "দেশের কথা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"সম্প্রতি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক টমাশ আরনল্ড্ সাহেব Preaching

of Islam নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সভ্যজগতকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শান্তভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নাম ধাম লিখিয়া তিনি তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক যে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাহা কি তরবারির বলে? চীনে কোনও সময়ে মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ীরূপে প্রবেশ করেন নাই বা রাজত্ব করেন না ই সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও এবং আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অধ্যবসায় দ্বারাই ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার একদল লোকের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু মুসলমানগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহাদের ধর্ম্মে পুরোহিত প্রথা না থাকাতে সকল লোকেই বিশেষতঃ আরব বণিকগণ অবসর মত ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এবং সুদৃষ্টান্তের দ্বারা বহুদেশে ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। আরনল্ড্ সাহেব বলেন, যদিও মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অত্যাচার করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে সহজে অনুমিত হয় যে, মুসলমান রাজত্ব সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের ভারতবর্ষ ব্যতীত খৃষ্টান জগতে তাঁহারা কোন সময়ে কখনও সেরূপ ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেন নাই। কোরানের ইংরাজী অনুবাদক ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী খৃষ্টান জর্জ্জ সেল সাহেবও কোরানের উপক্রমণিকার ১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, খৃষ্টানগণ য়িহুদী বা মুসলমান অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মবিষয়ে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। মহম্মদের (দং) এক হস্তে কোরান ও অন্য হস্তে কৃপাণ ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ প্রদানের কথা সম্পূর্ণ অলীক।"

তদ্ভিন্ন আজকালত কোন বিষয়েই কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে পারা যায় না। এমন কি, জমিদার মহাজন আপনার পাওনা আদায় জন্য প্রজা বা খাতকের গবাদি অস্থাবর মালামাল জোর করিয়া লইলে দণ্ডবিধির নানা ধারামতে শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং সে কাল আর নাই। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।—প্রতি দশ বৎসরে ভারতবর্ষে যে আদমসুমারী হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাইতেছে। এ সম্বন্ধে বেঙ্গলী প্রভৃতি সংবাদপত্র হিন্দুগণকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেছেন। আমরাও বলি, তর্কস্থলে ইসলামধর্ম্ম বলপূর্ব্বক প্রচারিত হইয়াছে ধরিয়া লইলেও এখনত আর বলপ্রয়োগ করিবার দিন নাই! তবে মুসলমানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে কেন? ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? এই একই জলন্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে উপরিলিখিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের মূলে কি কুঠারাঘাত হইতেছে না?

তৃতীয়তঃ—ইংরাজরাজের ভেদনীতি। সাম্য-মৈত্রী-ভয় প্রভৃতি যে যে রাজনীতি রহিয়াছে, তৎসমুদয় রাজাধিরাজ বা নৃপতিবৃন্দেরই বিশেষ আলোচনার কথা। স্বদেশ বা স্বরাজ্য রক্ষার্থে তাঁহারা যখন যে নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন মনে করিবেন, তখনই সেই নীতির অনুসরণ করিবেন।* রাজনীতি অতি কুটিল ও জটিল জিনিস; আমরা তাহা বুঝি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ জাতি এখন ভারতবর্ষের অধীশ্বর। ভারতবর্ষ তাঁহাদের শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যখন যে রাজনীতির অনুসরণ আবশ্যক মনে করিবেন, তাহারই প্রয়োগ করিবেন। তাহাতে আমাদের কোন হাত আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভেদনীতির বল নিষ্ফল করণ জন্য আমরা কিছু করিতে পারি কিনা? যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইংরাজ জাতি মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করিতেছেন বা উত্তেজিত করণ জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অথবা যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তখনই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে যে, ইংরাজ জাতির কথা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির কথা বলিয়া বিবেচনা করিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হওয়া। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অনেক সময় ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন যে, অমুক কার্য্য আমাদের মধ্যে একের হিতের ও অন্যের অহিতের বিষয় কিনা? সেরূপ স্থলে একটু বিবেচনার সহিত কার্য্য করাই উচিত। এস্থলে কথামালার বৃষ ও সিংহের উপাখ্যান দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দু মুসলমান যদি সম্মিলিত হয়, উভয়ে উভয়কে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে, তবে সহস্র ভেদনীতি তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে সক্ষম হইবে না। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লিখিয়াছিল:—
"The objects of the scheme are briefly, first, to destroy the collective power of the Bengal people; secondly to overthrow the political ascendency of Calcutta and thereby to foster in East Bengal the growth of Mohamedan power

* আজকাল আমরা ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাইতেছি। কোঃ সঃ।

which, it is hoped, will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu Community." ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দুদিগের বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দুদিগের বৰ্দ্ধিতায়তন ক্ষমতা দমন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান শক্তি প্রবল করা বঙ্গবিভাগ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অন্যপক্ষে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এতদ্দ্বারা হিন্দু মুসলমান যেন আরও সম্মিলিত হইতেছে; তাহাদের মধ্যে দূরত্ব যেন হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

এক্ষেত্রেও হিন্দু ভ্রাতৃগণকে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, বৰ্ত্তমান সময়ে মুসলমানগণ নানা কারণে নানা বিষয়ে হিন্দুর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং ন্যায়-পরায়ণ গভর্ণমেণ্ট যদি কখন দয়াপরবশ হইয়া মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কোন কৃপাকণা বিতরণ করেন, তাহাতে হিন্দু ভ্রাতার ক্ষুণ্ণ হওয়া বিধেয় নহে। কারণ, এস্থলে গভর্ণমেণ্ট ভেদনীতি অনুসরণ না করিয়া বরং সাম্যনীতি অবলম্বন করিয়াই মুসলমানকে হিন্দুর সমান করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে হিন্দুর স্বার্থে আঘাত লাগিল বলিয়া বৃথা চীৎকার করিলে চলিবে না। এরূপ স্থলে একটু স্বার্থত্যাগ ও একটু উদার ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। আজ পঞ্চাশ বর্ষাধিক সময় হইতে হিন্দুগণ বিশেষতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থা সমধিক উন্নত করিয়াছেন এবং সরকারী বেসরকারী প্রায় সমুদায় পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অন্যপক্ষে মুসলমানগণ এতদিন মোহনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছিলেন; সম্প্রতি সেই মোহঘোর কাটিতেছে মাত্র, সুতরাং মুসলমানগণ জীবনপথে হিন্দুর বহুপশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে হিন্দু ভ্রাতৃগণ বড়ই চীৎকার আরম্ভ করেন এবং গভর্ণমেণ্টকে অযথা আক্রমণ করতঃ অন্যায়রূপে পক্ষপাতিত্বের দোষ দিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে হিন্দু ভ্রাতৃগণের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহাদের মধ্যে ও মুসলমানে কেমন আকাশ পাতাল প্রভেদ! তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, গভর্ণমেণ্ট উদার ও সাম্যনীতি অনুসরণ করিয়াই সময়ে সময়ে আমাদের প্রতি—আমাদের দুরবস্থার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাই বলি,

পরস্পরে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করত সহগুণ প্রদর্শন করিলে হিন্দু মুসলমানের মিলন আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে।

চতুর্থতঃ—ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজী শিক্ষা কখনই আমাদের অমঙ্গলের হেতু নহে। বরং ইহা স্বীকার্য্য যে, ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের নানা বিষয়ের জ্ঞান নানারূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনুদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার বিমল আলোক আমাদের মনের মলিনতা বিনাশ করিয়াছে; আমাদের মনের সংকীর্ণতা বিদূরিত করিয়াছে এবং আমাদের বিবিধ প্রকার কুসংস্কারকে বিতাড়িত করিয়াছে। ফলকথা, উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা ও ভাবের সমাবেশে ভারতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা বা ইহার বিস্তার যে একান্ত প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে কাহারও অন্যমত নাই। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারজনিত সুফল ও কুফল ফলিয়াই থাকে। ইহা অনিবার্য্য। আমরা ইংরাজ রচিত কাব্য ও নাটকাদি পাঠ করিয়া অপার আনন্দলাভ করি; তাহাদের লিখিত দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করি; আবার তেমনিই ইংরাজ রচিত ইতিহাসাদিতে মুসলমানের কুৎসা ও নিন্দা পাঠ করিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে অবসন্ন হইয়া পড়ি। তাহাদের অঙ্কিত মুসলমানগণের জঘন্য ও বীভৎস চিত্র দর্শন করিয়া আমাদের নয়ন দুঃখনীরে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। (ক্রমশঃ।)

এস্. ও. আলী।

ভারতে আমীর।

ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মণীর যে প্রকার সম্বন্ধ, স্পেনের সহিত পোর্ত্তুগালের যে পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা, আফগানিস্থানের সহিত ভারতবর্ষেরও তদ্রূপ সম্পর্ক,—আফগান আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী। সুদূর ভূতকালে গান্ধার, পারস্য প্রভৃতি রাজ্য সমূহ বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎপূর্ব্বে আর্য্য পরিবারের একাংশ ঐ অঞ্চল হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সকল পুরাতন কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়

যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমার পরপারস্থ কাবুল রাজ্যের অধিবাসী পাঠান জাতি শুধু আমাদের প্রতিবাসী নহেন, উহাঁদের সঙ্গে আমাদের দূর জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধও বিদ্যমান।

ইরাণী, আফগান, গান্ধারী প্রভৃতি জাতিগণ আজ মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত আমাদের একাংশের বাহ্য ধর্ম্মগত একটা পার্থক্য দাঁড়াইলেও ইউরোপীয় আর্য্যগণ অপেক্ষা তাঁহারা আমাদের অতি নিকট সম্পর্কীয় এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার, হাব ভাব, আকৃতি প্রকৃতি, হৃদয় মন ভারতবাসীদের সহিত অনেকটা এক রকমের। ইউরোপীয়গণ আর্য্য-বংশ সম্ভূত হইলেও কালক্রমে তাঁহারা আর্য্যোচিত গুণ সমূহের অনেকগুলি হারাইয়া বিজ্ঞানবলদৃপ্ত, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, স্বার্থান্ধ ও ইহসর্ব্বস্ববাদী হইয়া পড়িয়াছেন; আর্য্যের ত্যাগস্বীকার, পরদুঃখকাতরতা, বিবেক, বৈরাগ্য, পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ যাহা কিছু প্রাচ্য-আর্য্যগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চিহ্ন মাত্রও ইউরোপখণ্ডে পরিলক্ষিত হয় না। সমগ্র ইউরোপ ঘুরিয়া কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না যে, এ দুনিয়া তিন দিনের, এ সংসার ভোজের বাজী বা ঈশ্বরই সত্য আর সকলই মিথ্যা। ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, মূর্খ জ্ঞানী, দুঃখী ধনী কেহ ভুলিয়াও বিবেক বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে জানেন না। দয়াধর্ম্মের অনেক কথা মুখে প্রচার করেন, কালী কলমে লিখিয়া থাকেন, গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করেন, কিন্তু আসল কাজের বেলা আপনার গণ্ডা কিছুতেই ছাড়েন না; তজ্জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত; পরদুঃখকাতরতার গান গাইতে গাইতে সময়ে সময়ে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া থাকেন; কিন্তু অপরকে পথের ভিখারী করিয়া নিজের ভুঁড়ি ভরিতে মজবুত বোধ হয় ত্রিসংসারে এমন আর একজনকেও দেখা যায় না। পরস্বাপহরণ করিবার জন্য এত ছল-বল-কৌশল প্রয়োগ পৃথিবীর আর কোনও দেশের লোকে কখন করিতে জানিত কিনা, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ।

যেদেশে বড় ছোট সর্ব্বপ্রকার লোক আপনাপন স্বার্থরক্ষার্থ সর্ব্বদা ভণ্ডামী ও ধূর্ত্ততায় পরিপক্কতা লাভ করিতেছে, সেখানে অসীম ক্ষমতাপন্ন নরপতির স্থান কি প্রকারে সম্ভবে? তদ্রূপ মহীপালের আবার ঐরূপ জল-বায়ুর মধ্যে লালিতপালিত হইয়া বিষম অত্যাচারী হইবারই কথা; কাজেই বিস্তর মারামারি কাটাকাটি শোণিতপাতের পর পাশ্চাত্য জগতে রাজা সম্বন্ধে একটা বিকট ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ প্রজার মতামত

অগ্রাহ্য করত শুধু রাজা এবং তাঁহার খাশ পরামর্শদাতৃগণ দ্বারা রাজ্যশাসন প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রজাশক্তি দ্বারাই সমুদয় রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। রাজা নামমাত্র একটা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন!

প্রাচ্যভূভাগে নৃপতি বলিলে রামচন্দ্র, নলরাজা, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অশোক, সবক্তগিন, বাবর, আকবর, শাহজাহান, আসফউদ্দৌলা প্রভৃতি দেবোপম প্রজাপালক ভূপালগণের ভাব মনে আইসে। নির্ব্বিশেষে সকল প্রজার মনোদুঃখ যদি রাজার গোচর না হইল,—অত্যাচারের প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক,—তাহা হইলে রাজা কিসের? অমন জড়ভরত রাজা থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। অভিধানে বলে,—"রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—প্রজারঞ্জনই রাজার কার্য্য। সেই প্রজারঞ্জন যদি রাজা দ্বারা না হইল, তবে তাঁহাকে রাজা বলিলে ভাষাগত আভিধানিক দোষ ঘটে। বাস্তবিক হাত পা বাঁধা সংকীর্ণভাবে থাকিয়া পাশ্চাত্য ভূপতিগণ অতি ক্ষুদ্রাশয় হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা শাস্ত্রের কথা, যে সর্ব্বদা নিজেকে যেমন ভাবিবে, ক্রমে তেমনি হইবে। ইউরোপের রাজারা সর্ব্বদাই শঙ্কিতভাবে চিন্তা করিতেছেন,—"'চাচা আপ্‌না বাঁচা" করিয়া কোন প্রকারে দিনযাপন করিতেছেন। ক্ষমতাত কিছুই নাই, তবু পদে পদে ভয়; বুঝি রাজপদ যায়। তার উপর 'কখন্ আছি কখন্ যে'তে হয় মা তারা',—কে কবে গুলি দ্বারা প্রাণপাখীটি পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেয়।" এভাবে অহোরাত্র কাটাইলে মানুষের মনকে ত্রাসে জড়সড় হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতেই হইবে। তদুপরি খরচপত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিচার চাই; কারণ বাঁধা মাহিনা পাওয়া হয়, অজস্র ব্যয় করিবার শক্তি কোথায়? এরূপ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নরপতি বা যুবরাজগণ যে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র কি?

প্রাচীন যুগের কথা থাকুক, সেদিন পর্য্যন্ত যে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ভারতবর্ষের লোকের মুখে শুনা যাইত, তাহার অর্থ কি? বাস্তবিকই প্রজাবর্গ জানিত যে, উপরে যেমন জগদীশ্বর তাহাদের স্রষ্টা-পাতা-পরিত্রাতা, ধরাধামে তেমনি দিল্লীর সম্রাট তাহাদের প্রবল প্রতাপান্বিত রক্ষক, যথার্থই **নরপাল।** বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে কোম্পানির চাতুরী প্রভাবে দিল্লীর তক্ত হীনপ্রভ হইলেও আপামর সাধারণের তৎপ্রতি যে অচলা ভক্তি ছিল, তাহারই জোরে বিখ্যাত সিপাহী যুদ্ধের অভিনয় হয়।

কথায় বলে, "মরা হাতী সওয়া লাখ।" দিল্লীর শেষ বাদশাহগণ ক্ষমতাশূন্য ও নিঃস্ব হইলেও তাঁহাদের মহানুভবতা কমে নাই; বিস্তর দীনদুঃখী তাঁহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। অযোধ্যার বাদশাহগণ মধ্যে আসফ-উদ্দৌলার দাতৃত্ব ও প্রজাপালনের খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত জগতে ঘোষিত,— "যিস্‌কো না দে আল্লা, উস্‌কে দে আসফউদ্দৌলা!" শেষ আউধেশ্বর ওয়াজেদালী শাহকে আমাদের মধ্যে অনেকেই মেটিয়াবুরুজে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহাকে ইংরাজেরা অকর্ম্মণ্য বলে। কেন না তিনি সংকীর্ণ হৃদয় স্বার্থপর দুনিয়াদার ছিলেন না। আমরা বহু প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি একজন নিরপেক্ষ বৈরাগী শান্তিপ্রিয় খোদা-পরস্ত ভূপাল ছিলেন।

যাহা হউক, সিপাহী যুদ্ধাবসানে শেষ দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ বিতাড়িত এবং ওয়াজেদালীর মৃত্যু হওয়ায় প্রাচ্য নরপতির ভাব আমাদের হৃদয় হইতে ক্রমে মুছিয়া যাইতেছিল। তার পর কত ইউরোপীয় যুবরাজ; এমন কি স্বয়ং বর্ত্তমান ভারতেশ্বর পর্য্যন্ত আসিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু প্রকৃতিবর্গের পেট ভরিল না! কত বাজী পুড়িল, কত তোপ উড়িল, কত বাদ্য বাজিল, কত পল্টন নাচিল, রাস্তাঘাট আলোকে আলোকিত হইল, তবু তৃপ্তি হইল না! তৃপ্তি পাওয়া দূরে থাকুক, দরবার-ঝঙ্কারের ভিতরে আমোদাহ্লাদের মধ্যে যেন একটা বিট্‌কেল বিজাতীয় ভাব অনুভূত হইল; নিরাশা আসিয়া হৃদয় ছাইয়া ফেলিল! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল রাজদেহে দয়াদাক্ষিণ্যের চিহ্ন, দুঃখী-দরিদ্রের প্রতি সমবেদনার নিদর্শন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই ভারতবাসীর মন পূরে নাই।

ভারতবাসীরা প্রাচ্য নরপতির ভাব বিস্মৃত হয়েন, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তাই খোদাতালার বিশেষ বিধানে এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে একজন স্বদেশী নরপাল আমাদের মধ্যে প্রেরিত হইলেন। পাঠান জাতির সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও একটু ঘনিষ্ঠতা আছে।—দিল্লীর সিংহাসনে বহুকাল আফগান বাদশাহ বিরাজ করিয়াছেন। আবার বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাঁহাদের আরও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক।— কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গদেশ স্বাধীন পাঠান নৃপতিবৃন্দের দ্বারা শাসিত হয়। সেই কাল বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতির কাল। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

অবতীর্ণ হইয়া ভারতে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য ও সহচর রূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় গৌড়ের পাঠান বাদশাহের পরম বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী ছিলেন; এমন কি তাঁহাদের দ্বারাই স্বাধীন বাঙ্গালার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। উক্ত পাঠান নৃপতিগণের সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের সমধিক উন্নতি হয়; ইহাও তাঁহাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

এখন দেখা যাউক, আফগানিস্থানের অধীশ্বর সিরাজল মিল্লতে ওদ্দিন আমীর হবিবুল্লা খাঁ মহোদয় ভারতে পদার্পণ করাতে আমরা কিরূপ প্রীত হইয়াছি এবং তাহার ফলই বা কি প্রকার দাঁড়াইল?

আমাদের লণ্ডনে অবস্থিতি সময়ে পারস্যের নরপতি নসিরুদ্দিন শাহ তথায় গমন করেন। তাঁহার নগর ভ্রমণ উপলক্ষে একদিন তত্রত্য দুই একটি রাজপথ কয়ঘণ্টাকাল সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে। ইতোমধ্যে অপরদিক হইতে ঐরূপ এক রাস্তায় বাহাদুরী কাঠ বোঝাই একখানা প্রকাণ্ড ওয়াগন গাড়ী উপস্থিত হইলে, মোড়ের পুলিস প্রহরী শাহের দোহাই দিয়া তাহাকে অবরোধ করিতে চেষ্টা পাওয়ায়, গাড়োয়ান তাচ্ছিল্যভাবে "Oh! what do I care for the Shah of Persia!"—(পারস্য শাহের আমি কি তোয়াক্কা রাখি) বলিয়া অবাধে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। শাহের অবস্থিতিকাল এবং তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর বালকগণ পথে ঘাটে একটু ময়লা রঙ্গের লোক দেখিলেই বিদ্রূপচ্ছলে তাহাকে প্রশ্ন করিত, "Have you seen the Shah?"—(শাহকে কি তুমি দেখিয়াছ?) এই প্রকার ত "সভ্য" ইংলণ্ডের "অসভ্য" প্রাচ্য নরপতির প্রতি শ্রদ্ধা! এরূপ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য মদমত্ত বৃটনের মুখপত্র টাইম্‌স সংবাদপত্র যে নানাবিধ প্রলাপ বকিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? টাইমসে প্রকাশ "এতকাল কাবুলের আমীরকে ভারতের সামন্ত রাজগণের শ্রেণীতে রাখিয়া "হিজ্ হাইনেস্" বলিয়া উল্লেখ করা হইত। এখন হঠাৎ আমীর হবিবুল্লাকে "হিজ্ ম্যাজেষ্টি" বলিয়া স্বাধীন ভূপালের সম্মান দেওয়া হইতেছে কেন? গবর্ণমেণ্ট কি বুঝিতেছেন না যে, ইহার দ্বারা আমাদের পোষ্য আমীরের মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার জন্মিবে?" ইহাতেও টাইম্‌স্-সম্পাদক সন্তুষ্ট নহেন; আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, ভারতের সন্নিহিত আফগানিস্থানের মুসলমান আমীরের প্রতি এরূপ

অযথা সম্মান প্রদর্শন করায় এখানকার মুসলমান প্রজাবর্গ গর্ব্বিত হইবে, সেটা কি ভাল কথা? এদিকে মুসলমানগণের প্রতি ইদানীং কিরূপ দয়ার স্রোত প্রবাহিত! উহা যদি সরল প্রেমসম্ভূত হইত, তাহা হইলে কি আর এই রকম মদগর্ব্বের ও ঈর্ষ্যার কথা দয়াময় প্রভুদের মুখে শুনা যাইত? কাজেই বলিতে হয়, "তোমার যে ভালবাসা, মোল্লার যেমন মুরগী পোষা!" এবম্প্রকার ডাইনের কান্নায় ভুলিবার সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে আর এমন বোকা লোক নাই, যাহার চক্ষে এই প্রাণসংহারিণী ভেদনীতির উপর গিল্টির কাজ খাঁটি সোণা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

বিপক্ষগণ আফগানিস্থানকে অসভ্য দেশই বলুন, আর তাহার অধীশ্বরকে অশিক্ষিতই বলুন, আমরা এবার বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, কাবুল রাজ্য অতি সুপ্রণালীতে শাসিত এবং তাহার রাজা আমীর হবিবুল্লা একজন খোদাপরশ্‌ত্‌, গরিব্‌পর্‌ওয়র, উদারহৃদয়, বিশ্বপ্রেমিক, প্রজাবৎসল নরপতি। তিনি আমাদিগকে যেরূপ সদাশয়তা ও রাজোচিত সদ্‌গুণাবলী দেখাইয়া গেলেন, তাহার প্রশংসা একমুখে করা যায় না। বিশেষ নানাস্থানে কথা ও কার্য্য দ্বারা হিন্দুদের প্রতি তিনি যে প্রকার উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধনকল্পে যেরূপ উপদেশাদি দিয়াছেন, তাহা দেবদুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমীর মহোদয় বাস্তবিকই প্রাচ্য ভূভাগের উপযুক্ত নরপাল। ইংরাজ বোধ হয় এবারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, আমরা কিরূপ রাজা চাই। নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসী সর্ব্বত্র তাঁহাকে প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে প্রকার ও যে পরিমাণ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদান করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বৃটিশ রাজের জ্ঞানোদয় হওয়া উচিত। অকপট হৃদয়ে এরূপ আনন্দ প্রকাশ হতশ্রী ভারতে যুগযুগান্তর পরে দৃষ্ট হইল।

আমীরকে নিমন্ত্রণ করতঃ ভারতে আনিবার গবর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, ফলটা কিন্তু যেন ঠিক বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। আমীর বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন যে, মুখে ও কালীকলমে ইংরাজ যতই উদার-নীতি প্রচার করুন না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে প্রাচ্যপ্রতীচ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত। অনেকস্থলে তিনি এবিষয়ে প্রশ্ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাকে যাহা যাহা দেখাইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, তীক্ষ্ণধী, সহৃদয় আমীর মহোদয় তদপেক্ষা অনেক বেশী বিচক্ষণতার সহিত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবাসীর হৃদয়ে এমন একটা ছাপ বসাইয়া

গিয়াছেন, যাহাতে তাহারা বহুকাল আমীর হবিবুল্লার জয় ঘোষণা ও মঙ্গল কামনা করিতে থাকিবে।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ ভেদনীতির বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুপ্রজাদিগকে ভয় দেখাইতে ছাড়েন না যে, ভারতবর্ষে যদি কখন দেশীয় শাসন হয়, তাহা মুসলমান সম্রাটের অধীনেই সম্ভব এবং তাহা হইলে পুরাতন উৎপীড়ন অত্যাচারের পুনরভিনয় হইয়া হিন্দুগণ উৎসন্ন যাইবে। ওরূপ ভয়ে হিন্দুরা আর ভীত নহেন, তাঁহারা এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, ওসকল কাল্পনিক "জুজুর ভয়" কেন প্রচারিত হইয়া থাকে। এবং এই সুদীর্ঘকালে তাঁহারা হাড়ে হাড়ে সমঝ্ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন দৈনিক শোষণ এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংহার অপেক্ষা আভ্যন্তরিন যুদ্ধবিগ্রহ লুণ্ঠনাদি লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। নিয়মিত শোষণে ও সাময়িক লুণ্ঠনে অনেক তফাৎ,—যাহা কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে; কিন্তু যাহা শুষিয়া যায়, তাহা লোকচক্ষুর অগোচরে কোথায় মিশাইয়া যায়, আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না। তারপর মুসলমানগণ হিন্দুদের সহোদর ভাই। যদি তাঁহাদের হাতে দুটা চড়চাপড় খাইতেও হয়, তাহা বিদেশীর সদর্প বুটাঘাত অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সহনীয় বোধ হইবে। পরন্তু যে শিক্ষা আমরা উভয়ে পাইলাম, তাহা সকলেরই অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিল। উহার ফলে হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, আর কেহ কখন ঐ শ্রেণীর বোকামী করিবেন না, ইহা নিশ্চয়। দুই জনেই খুব আক্কেল পাইয়াছি। ভ্রাতৃবিরোধের যে কি ভয়ানক বিষময় ফল, তাহা কথা দ্বারা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভ্রাতৃদ্বয়ে গলা ধরাধরি করিয়া যেরূপ কাঁদিতেছি, তাহা কখন ভুলিবার নয়। যদি মানুষের চামড়া আমাদের গায়ে থাকে, মরিলেও আর কখন গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইব না। একবার নয়, দুইবার নয়, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সহস্রবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আপোশের মধ্যে কলহ উপস্থিত করিয়া বাহিরের লোককে শালিশ মানিয়া যে কি অনর্থপাত হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবশেষে জিজ্ঞাস্য,—মুসলমান নরপতিগণের অধীনে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, কি বর্ত্তমানে দেশ মস্তকোত্তোলন করত পৃথিবীর মধ্যে গণ্যমান্য হইয়া উন্নত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে? সব রকমে তখনকার সঙ্গে তুলনায় এখনকার অবস্থা অধিক বাঞ্ছনীয় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে!

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কবিতা-কুঞ্জ।

সুমধুর।

আমার হৃদয়মণি! আমার পাগল!
তোরে ছাড়া জগতের সুধাও গরল!
আজি এই চন্দ্রালোকে মুক্ত বাতায়নে
উর্দ্ধে কোটী তারকার নয়ন তরল;—
পৃথিবীর ব'লে যেন নাহি লয় মনে
তোর ও আলোক মূর্ত্তি স্নেহ সুকোমল।
বল মোরে এইরূপ র'বি চিরদিন,
শরীর ভাঙ্গিবে যবে,—যবে পলে পলে
এক একটি ছিন্ন দল ঝরিবে ভূতলে,—
তখনো রাখিবি মধু হৃদয়-কমলে!
এ শরীর নিতান্তই মাটীর শরীর!
আভাবে মিলায়ে যায় ক্ষতি কি তাহায়?
মোদের এ দেশকাল-ব্যাপক গভীর
মানব হৃদয় দু'টি যদি থেকে যায়!
যদি থেকে যায় এই শান্ত আলিঙ্গনে
শূন্য-সংলগনা দৃষ্টি আধ নিমীলিত,
প্রাণখানি মূর্ত্তিমতী প্রার্থনার মত
উঠে যবে অসীমের সিংহাসন পানে।
আর থেকে যায় এই প্রেম অনশ্বর,—
সুধাসিক্ত নয়নের করুণ অঞ্জলি,
অগাধ দীনতা ল'য়ে চির সকাতর,—
আছি যাহে পরস্পরে খুঁজিয়া কেবলি!
আর কিছু নাহি চাই! জানি এ সংসার;
কাচের মতন হেথা সুখ ভেঙ্গে যায়,
মেঘের তরল বুকে ছায়াধনু প্রায়;
দেহের সুষমা আভা নিমেষে মিলায়!
কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হোক্, কোমল মসৃণ
কঠিন শিথিল হোক্! হৃদয়ের তলে
তখনও মাঝে মাঝে চাঁদের কিরণে
প্রাণের হীরকগুলি যদি উঠে জ্বলে!
এইরূপে চন্দ্রকর আহত হইয়া
প্রাণে যদি গলে পড়ে আর একটি প্রাণ,
পারি এই মত বুকে মাথা লুকাইয়া
শুনিতে শোণিততপ্ত হৃদয়ের গান।
আমরা দরিদ্র অতি; হৃদয়ে গোপনে
কি হল—মরিছে শত বাসনা অঙ্কুর?
চাহি না সুবর্ণ মণি! মাটীর ভাজনে
প্রণয়ের মধু সে ত আরো সুমধুর!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

মিনতি।

ভাল মোরে বাসিও না সখা!
চাহিনাক তব প্রেমদান;
দীনহীন ভগন পরাণে
কিবা আছে দিব প্রতিদান?

ঠেলিও না হেলায় চরণে,
সহিবে না উপেক্ষা তোমার;
দূরে থে'কে শুধু ভালবেসে
সুখী হবে পরাণ আমার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্মৃতি।

মনে ভাবি ভালবাসিব না,—
ভুলে যাব সকলি তাহার;
মুছে দিব তার নামটিরে
ফিরে নিব সকলি আমার!

দিছি তার সবি ফিরাইয়া—
প্রীতি স্নেহ প্রেম অশ্রুধার;
কিন্তু হায়! আজো ফিরে দিতে
পারি নাই স্মৃতিটি তাহার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

মর্ম্মব্যথা।

১

গিয়েছি ভুলিয়া হায় হৃদয় সঙ্গীত মোর
সংসারের কোলাহলে,
দহিছে সতত তাই অব্যক্ত কঠোর জ্বালা
মরমের অন্তঃস্থলে।

২

দিবস রজনী বসি' নীরবে ফেলিছি অশ্রু
তবু ব্যথা নাহি যায়;
বিস্মৃত সঙ্গীত রাশি ঝঙ্কারি হৃদয়-বীণা
উঠে না জাগিয়া হায়!

৩

তরুণ তপন করে পরাণ খুলিয়া এবে
গাহিছে বিহগবধূ
কাননে কাননে এবে উঠিছে অস্ফুট গীতি;
এ হৃদি নীরব শুধু।

৪

শুনিয়া বিশ্বের গান উছলিয়া উঠে প্রাণ
জাগে পুন সুপ্ত আশা
ব্যাকুল উচ্ছ্বাস রাশি বলিতে প্রকাশি হায়—
পাইনা খুঁজিয়া ভাষা।

৫

দিকদিগন্তর হ'তে পশিছে হৃদয়ে আসি
মধুর সঙ্গীত স্রোত
গভীর আবেগে আজ অধীর পরাণ মোর
হইতেছে ওতঃপ্রোত।

ঝঙ্কারি উঠেনা তবু নীরব হৃদয়তন্ত্রী,
দেয় না বারেক সারা;
গভীর উচ্ছ্বাসভরে দ্রবিয়া পরাণ আজ
বহে না সঙ্গীত ধারা।

৭

হৃদয়-সঙ্গীত মোর গিয়াছি ভুলিয়া হায়
সংসারের কোলাহলে
অব্যক্ত কঠোর জ্বালা দহিছে সতত তাই
মরমের অন্তঃস্থলে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

তুলনা।

(Shellyর কোন কবিতার ছায়ানুবাদ।)

তোমার চুম্বন দানে উথলে অমিয় বানে—
হৃদয় জলধি;
তাই আমি ভীত নিরবধি!

মৃদুল চুম্বন মম পরশে কুসুম সম
তব ওষ্ঠাধর;
তাই তুমি নহগো কাতর!

তোমার রূপের ছটা— গগনে বিদ্যুৎ ঘটা—
ঝলসে সদাই;
সহে না আঁখিতে মম তাই!

আমি অতি আভাহীন—উষার আকাশে লীন—
তারকার মত;
সহে তব নয়নে নিয়ত!

তোমার কণ্ঠেতে ঠিক—কুহরে পাপিয়া পিক—
ললিত পঞ্চম;
দহে মম বিরহী মরম!

আমি যে চকোর পাখী—নীরব নিশীথে ডাকি
প্রিয়ার লাগিয়া;—
সে যে তব ঘুম পাড়ানিয়া!

তোমার যা কিছু আছে আমার আঁখির কাছে
সব (ই) ভয়াবহ—
অতি তীব্র, অতীব দুর্ব্বহ!

তোমার নয়নে সতি, আমি যে মৃদুল অতি—
অতি অনুকূল,—
যেন তব খেলার পুতুল।

আমার অন্তর বালা,—কোমল কুসুম মালা—
নহে গুরুভার;
হইবে না দুর্ব্বহ তোমার!

হৃদয় নন্দনে দেবি, তোমারে নিয়ত সেবি—
যে ভকতি দিয়া,—
পবিত্র নির্ম্মল তাহা প্রিয়া!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

শেষ আশা।

এত ভাল বেসেছিনু যারে,
নাথ আজি ব্যাকুল অন্তরে
সামান্য আশ্রয় সাথে দিয়া
পাঠায়েছি সংসার সমরে।

জানে না সে জানে না কিছুই
জগতের রীতি নীতি চাল,
কাছে কাছে রাখিব বলিয়া
শিখাইনি কিছু এত কাল।

রাখিও রাখিও তারে, প্রভো!
সাথে সাথে থাকিও তাহার;
পরাজয় দেখিবারে যেন
কখনও নাহি হয় তার।

দুই জনে যেতেছি দু'দিকে
মরণ ভিতর দিয়ে যবে,
তোমারই ভিতরে আসিয়া
আবার মোদের দেখা হবে!

মুক্ত দেহ কারাগার হ'তে
সে সময়ে ভিতরে তাহার
একটুকু শরের অঙ্কন
দেখিতে হয় না যেন আর!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

"কৈফিয়তে" বক্তব্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

তৎপর কৈফিয়ত-দাতা কেশববাবু মোহাম্মদ কাসিম, মাহমুদ গজনী, মোহাম্মদ ঘোরী, টাইমুরলঙ্গ ও সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজী প্রভৃতি সম্রাড়গণকে "পশুশক্তিতে অনুপ্রাণিত ও নরঘাতক" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তা বেশ! কিন্তু এই সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম, পরশুরাম, ইন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করাও কি সঙ্গত ছিল না? কারণ তাঁহারাও অনেক সময় অকারণে বা সামান্য কারণে কিম্বা রাজ্য লাভের জন্য পশুশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া "উষ্ণ নর-শোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল অঙ্গ" লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ছিলেন। পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গুপ্ত মহাশয়েরই বাক্যানুসারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিতান্ত জঘন্য ছিল বলিয়া এই সমস্ত শোণিতপাতের জন্য তাঁহারা মোহাম্মদ কাসিম, মাহমুদ গজনী, মোহাম্মদ ঘোরী প্রভৃতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিলেন। কারণ লেখক মহাশয়ই বলেন,—"মুসলমানগণ ইস্‌লাম প্রচারার্থ যুদ্ধ করিয়াছিল।"

ইহার পর গুপ্ত মহাশয় হজরতের বন্ধু-শ্রেষ্ঠ ১ম খলিফা মহাত্মা আবু বক্কর (রাজিঃ) কে আক্রমণ করিয়াছেন। পয়গাম্বর সাহেবের প্রেরিত দূতকে হত্যা করার জন্যই তদীয় কথিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু সৈন্য প্রেরণ কালে হজরত আবু বক্কর সৈন্যগণকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—"হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমরা সৈন্যদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও, শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, যুদ্ধে জয়ী হইলে বৃদ্ধদিগকে বিনাশ করিও না, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রক্ষা করিও, খর্জ্জুর কিম্বা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করিও না, শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিও না, খাদ্যের জন্য আবশ্যক না হইলে গৃহপালিত জন্তুদিগকে হত্যা করিও না, আশ্রম দেবালয়ের লোকদিগকে সম্মান করিও এবং তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরগুলি রক্ষা করিও।" পাঠকগণ দেখুন, কি উদারতা, কি দয়া ও দাক্ষিণ্য-পূর্ণ উপদেশ! এরূপ ব্যক্তিকে কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকওত নরঘাতক বলিতে পারে না! ইতিহাসের এই অংশে বোধ করি কেশববাবুর অনুরাগহীন নয়ন পতিত হয় নাই!

যাঁহার হৃদয় পরদুঃখে এতই কাতর, যিনি পরোপকারার্থে নিজের সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন দেন, শত্রুর জন্য যাঁহার হৃদয় কাঁদে, সেই মহাপুরুষ মানব না দেবতা?

মোহাম্মদ-বিন্নে-কাসিম সম্বন্ধে কেশববাবুর ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। শুধু মোহাম্মদ আলির ইতিহাস দেখিলেই কি ইতিহাস-পাঠের সমাপ্তি হয়? 'তওয়ারিখে মোহাম্মদ কাসিম', 'তারিখে ফেরেস্তা', 'ফতুহাতল্ ইসলাম', 'তারিখে-ইসলাম', 'তারিখে আরব ও ইস্‌লাম', 'তওয়ারিখে হিন্দুস্থান', 'ফতুহাতে আরব ও আজম' প্রভৃতি বড় বড় ইতিহাসগুলির সাক্ষে কি তাঁহার আস্থা হইল না? না হয় মৌলবী আবদুল করিম বি, এ, সাহেবের "ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তকখানা একবার দেখিলেও ত বোধ করি কেশববাবু এত ভ্রমে পতিত হইতেন না! তাই বা কেন? তিনি মোহাম্মদ আলীর "কচ নামায়" প্রকাশিত মোহাম্মদ-বিন্নে-কাসিমের পত্রের কিয়দংশের উল্লেখ করিতে পারিলেন, কিন্তু তদীয় প্রভু হাজ্জাজ কর্ত্তৃক তদুত্তরে লিখিত পত্রখানা উদ্ধৃত করিতে দোষ কি ছিল?

সিন্ধুদেশ জয় করিয়া তদ্দেশের অধিবাসী হিন্দুগণকে তাহাদের ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে কিনা, এ বিষয়ে হাজ্জাজের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া মোহাম্মদ পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে হাজ্জাজ লিখিলেন, "যখন তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়াছে এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত আছে, তখন তাহারা আমাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে এবং তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদে থাকিবে। তাহাদিগকে তাহাদের দেব দেবীর পূজা করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। যে সকল দেব-মন্দির ভগ্ন হইয়াছে, সে সমুদায় তাহারা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব আবাস বাটীতে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারিবে"—ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি, ইহারই নাম কি 'উষ্ণ নর-শোণিতে ধরিত্রীর শষ্পশ্যামল অঙ্গ লোহিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া কাফেরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা? হাজ্জাজের এই আদেশ সিন্ধুদেশে মোহাম্মদ-বিন্নে-কাসিম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তবু কি গুপ্ত মহাশয়ের চক্ষে কাসিম অপরাধী?

কি কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন, ইস্‌লাম বিস্তৃতিই ইহার কারণ, না অন্য কোন কারণ ছিল? সিংহলদ্বীপের অধিপতি নানাবিধ দ্রব্য আটখানি জাহাজে করিয়া

হাজ্জাজের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তীর্থ যাত্রীগণ এবং সিংহল দ্বীপস্থ মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা-গণও এই সকল জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। পথি মধ্যে দেবালের কতকগুলি জলদস্যু ঐ জাহাজ লুণ্ঠন করে। উৎপীড়িতা হইয়া জাহাজের একটি স্ত্রীলোক "হে হাজ্জাজ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই সংবাদ বসরায় হাজ্জাজের নিকট পঁহুছিলে তিনি ইহার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ "আমি এখানে উপস্থিত" এই কথা বলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট বন্দীদিগের মুক্তির জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দাহির উত্তর দিলেন—"যাহারা জাহাজ লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহারা আমার শাসনাধীন নহে। তাহাদের উৎপাত নিবারণে আমি অসমর্থ।" সুতরাং হাজ্জাজ খলিফার অনুমতি লইয়া দেবালের বন্দর আক্রমণ করিবার জন্য সেনাপতি ওবেদুল্লার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ওবেদুল্লা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। পুনরায় হাজ্জাজ বুদেল নামক সেনাপতির অধীনে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধকালে বুদেল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং আরব সৈন্য পরাজিত ও বন্দীকৃত হয়। এই শোচনীয় সংবাদে হাজ্জাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিশোধ লইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পরে স্বীয় ভ্রাতা মোহাম্মদ-বিন্নে-কাসিমকে বিপুল সৈন্য সহকারে দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ অল্পকাল মধ্যেই দেবাল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ এবং সিন্ধু-রাজ্য জয় করিয়া তথায় মুসলমানশাসন স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই যুদ্ধের নামই কি "কাফেরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নর-শোণিত পাত?" কি ভয়ানক স্বার্থান্ধতা!

কেশববাবু সম্রাট সবক্তগীনের ভারত-আক্রমণ নিতান্ত অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ধর্ম্মের নামে মাতোয়ারা হইয়া সবক্তগীন ধরিত্রীকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি শুধু এক এক খানি ইতিহাসের দুই একটি মাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া মুসলমান সম্রাড়্গণকে দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে কোন বিষয়েরই আলোচনা করেন নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয় দলই কাটাকাটি করিয়া ধরিত্রীকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে; ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাতে একদেশদর্শিতার

পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। এখন দেখা যাক্, সবক্তগীন ভারত-আক্রমণের জন্য কি পরিমাণ অপরাধী। সবক্তগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাদের পূর্ব্ব-হৃত-রাজ্য কান্দাহার আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। ইহাতেই লাহোরাধিপতি জয়পাল মহা-উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন, সবক্তগীন বুঝি তাঁহার রাজ্যও আক্রমণ করেন! সবক্তগীন জয়পালের রাজ্য আক্রমণ-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন নাই। অদূরদর্শী ও আত্মাভিমানী জয়পাল স্থির করিলেন, সবক্তগীনকে নিহত করিয়া গজনীর সিংহাসন অধিকার না করিলে নিরাপদে ভারতে রাজত্ব করা দুরূহ ব্যাপার হইবে। কালে হয়ত মুসলমানগণ তাঁহার রাজ্যও কাড়িয়া লইতে পারেন। এই ভাবিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য এবং হস্তী সংগ্রহ করিয়া জয়পাল বীরদর্পে গজনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রাপ্তে অগত্যা বাধ্য হইয়া সবক্তগীনও সসৈন্যে রাজধানী হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইলে সেই রাত্রে হঠাৎ দুঃসহ তুষার পাত আরম্ভ হয়। তাহাতে জয়পালের অধিকাংশ সৈন্যই প্রাণত্যাগ করে। সবক্তগীনের দৃঢ়কায় ও কষ্টসহিষ্ণু পার্ব্বতীয় সৈন্যগণের তুষার পাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইল না। ইহাতে জয়পাল অত্যন্ত ভীত এবং নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সবক্তগীনও সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে অন্যায় রূপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া জয়পাল সবক্তগীনকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নগদ দশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং পঞ্চাশটি হস্তী দিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। প্রতিশ্রুত সমুদয় অর্থ সঙ্গে না থাকায় অবশিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য সবক্তগীনের কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বীয় রাজধানী লাহোরে উপস্থিত হন। ইতঃমধ্যে গজনীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সবক্তগীন ভারত সীমা হইতে চলিয়া যান। তাহাতে জয়পাল দুঃসাহসে সবক্তগীনের প্রেরিত কর্ম্মচারিগণকে অন্যায়রূপে বন্দী করেন।

বলা বাহুল্য, সবক্তগীন জয়পালের ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহারের বার্ত্তা শ্রবণান্তর অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পুনরায় সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া জয়পাল এবং তাঁহার সহায়তাকারী অন্যান্য রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দীদিগকে উদ্ধার করিলেন ও যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন পাঠকগণ বিচার করুন, এই যুদ্ধের জন্য অপরাধী কে? কাহার দোষেই বা যুদ্ধ বাধিয়া ছিল এবং সবক্তগীন কেন ভারতবর্ষ-আক্রমণ করিয়াছিলেন?

জয়পাল সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে অন্যায়রূপে বন্দী করিলেন, আর সবক্তগীন চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিবেন? ভৃত্য, প্রজা, আশ্রিত, স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে কি? 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই নীতি কাহার শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়, কেশববাবু জানেন না কি? কেশববাবু বক্ষঃস্ফীত করিয়া ভারতবর্ষ-আক্রমণের জন্য মোহাম্মদ ঘোরীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে "তাজ-উল-মাশীর" হইতে একটি নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন। তা বেশ! কিন্তু সৃষ্টির আদি কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত এই যে পৃথিবীতে এক জাতি রাজা হইতেছে, এবং অন্য এক জাতি পরাক্রান্ত হইয়া নরশোণিতে ধরিত্রী বক্ষঃ রঞ্জিত করত তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতেছে, ইহাতে কেশববাবু তাহাদের কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু মুসলমান সম্রাটদিগের খুঁটি নাটি দোষ ধরিয়া ন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে তিনি কেমন পটু! মোহাম্মদ ঘোরী যে হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং ঘোরীর আক্রমণে ও নর-শোণিতপাতে হিন্দুরাজগণই যে অধিকতর অপরাধী, তাহা অস্বীকার করিতে যাওয়া একদেশ-দর্শিতা এবং সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোহাম্মদ ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিল্লীর রাজা অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন। আজমীর এবং কনোজের রাজদ্বয় তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন। দিল্লীর রাজা আজমীরের পৃথ্বীরাজকে অধিকতর স্নেহ করিতেন; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। ইহাতে কনোজরাজ নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া আজমীর-পতি পৃথ্বীরাজের সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত হইয়া মোহাম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। কেহ কেহ বলেন, কনোজপতি রাজা জয়চন্দ্র আপনাকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্ব-প্রধান অধীশ্বর অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজ তাঁহার এই প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। জয়চন্দ্র স্বীয় অক্ষুণ্ণপ্রাধান্য স্থাপন-মানসে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নানাদিগ্‌দেশীয় ভূপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এরূপ উৎসবে অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে ভৃত্য-যোগ্য সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পৃথ্বীরাজকে দৌবারিকের কার্য্যের জন্য আহ্বান করা হইলে তিনি এরূপ অপমানসূচক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে

বিদ্রূপ করিবার জন্য কনোজাধিপতি দ্বার দেশে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ হইতে রাজনন্দিনী সংযুক্তা স্বয়ম্বর-প্রথানুসারে পতি নির্ব্বাচন করিবেন, এইরূপ আয়োজন ছিল। পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তার আসক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। রাজকুমারী সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া উপস্থিত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করত দ্বার দেশস্থ পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। এতদ্দর্শনে জয়চন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া সংযুক্তাকে শাস্তি দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দিল্লী-রাজ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যাকে তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দ্রুতবেগে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে কনোজাধিপতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে মোহাম্মদ ঘোরীকে ভারতবর্ষে আসিতে আহ্বান করেন। রাজা জয়চন্দ্রের সাহায্যার্থে মোহাম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে আসিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিলেন। এখন পাঠকগণ বলুন দেখি, এই যুদ্ধের নর-শোণিতপাতের জন্য প্রকৃত দোষী কে? এই যে ধরিত্রী-বক্ষঃ হিন্দুরক্তে রঞ্জিত হইল, ইহার জন্য দায়ী মোহাম্মদ ঘোরী না জয়চন্দ্র? এখানে মোহাম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্ম্মে কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্যই উষ্ণ নর-শোণিতে ধরিত্রীর শস্য-শ্যামল অঙ্গ লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল, না অন্য কোন কারণে? কেশব-বাবু ইহার কৈফিয়ত দিবেন কি? নিজেদের দোষ মোটেই না দেখিয়া শুধু মুসলমানগণের দোষ অন্বেষণ করা কি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের সমদর্শিতা, না কাপুরুষতা?

এখন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজীর কথা। কেশববাবু বলেন, আলাউদ্দিন খিলিজী স্বকীয় ধর্ম্মে কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার নিমিত্তই ধরিত্রীর অঙ্গ নর-শোণিতে রঞ্জিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে না। আলাউদ্দিন খিলিজী যখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কতবার মর মর অবস্থায় তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। মোগল-অধিনায়ক আমির দাউদ ও তৎপুত্র এবং রোকন খাঁর আক্রমণে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। এদিকে আবার গুজরাটের রাজা, রনস্তম্বরের রাজা, চিতোরাধিপতি, দেবগিরির রাজা, বরঙ্গল ও কর্ণাটের রাজা প্রভৃতি আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে যেরূপ ষড়যন্ত্র এবং অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন,

সেই সময় আলাউদ্দিন যদি তাদৃশী কঠোরতা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষাই ভার হইত কিম্বা ভারত-সাম্রাজ্যের আশায় চির দিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে পর্ব্বত গুহায় আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া নিতান্ত ঘৃণিত-ভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। কাজেই সেই সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীও বিদ্রোহী শত্রুদিগকে দমন করিতে আলাউদ্দিন অনেক লোকের প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন। রাজ্য ও প্রাণ রক্ষার জন্যই তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলি, ইহাও কি কেশববাবুর নিকট, বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিস্তার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ? রাজ্য লাভ, রাজ্য রক্ষা, বিদ্রোহ দমন জন্য হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, গ্রীক প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্ব-জাতীয় প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাড়্‌গণই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেশববাবু কিন্তু সেই সমস্ত নরপতিগণের কোনই দোষ দেখিলেন না ! যত দোষ নন্দ ঘোষ !

কেশববাবু তৈমুরলঙ্গের "মল্‌ফুজাতে তাইমুরী" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তৈমুরলঙ্গ কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। কেশববাবুর ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ কালে হিন্দুস্থানে মুসলমান রাজত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন নাম মাত্র দুই চারিজন হিন্দু রাজা মুসলমান সম্রাটের অধীনে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় তৈমুরলঙ্গ তাঁহার স্বরচিত "মল্‌ফুজাতে তিমুরী"তে কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই যে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন, একথা লিখিবেন কেন, বুঝা যায় না।

আমরা মূল পারস্য ইতিহাস যতদূর পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তৈমুরলঙ্গ স্বীয় রাজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্যই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিই সমান ব্যবহার পাইত। তিনি সকলের রাজ্যই আক্রমণ করিতেন। বিশেষতঃ মুসলমানের রাজ্যই তিনি অধিকতর আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি হিন্দু কাফেরদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে কোন উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে যে কয়টি হিন্দু রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত মুসলমান সম্রাটের অধীনেই ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ পারস্য, তুরস্ক, সমগ্রতাতার, জর্জ্জিয়া, মেসোপোটামিয়া, রুসিয়া,

সাইবিরিয়া এবং হিন্দুস্থান প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন্ কোন্‌টি কাফের বা হিন্দুদিগের রাজ্য, কেশববাবু তাহা বলিয়া দিবেন কি? কাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, তিনি কাফেরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই ধরিত্রীর শস্যশ্যামল অঙ্গ লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন? রাজ্য লাভের জন্য কোন্ জাতীয় রাজা যুদ্ধ না করিয়াছেন? কোন্ রাজা বিদ্রোহ দমন জন্য কঠোরতা অবলম্বন না করিয়াছেন? কোন্ জাতি রাজ্য বিস্তারের জন্য নর-শোণিতে ধরিত্রী বক্ষঃ রঞ্জিত না করিয়াছে? সেইরূপ ভারত-আক্রমণ-কারী মোহাম্মদ কাশিম, সবক্তগীন, সোলতান মাহমুদ, মোহাম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দীন, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি সম্রাড়্‌গণও রাজ্য বিস্তারের জন্যই নানাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাফেরদিগকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যুদ্ধ বা নর-শোণিত পাত করেন নাই। যাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ইঁহারা ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। আবার ইঁহাদের ভারত আক্রমণও অহেতুক ছিল না। তাঁহারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও প্রতারিত না হইয়া কাহারও রাজ্য অগ্রে আক্রমণ করেন নাই। ঐ সমস্ত আক্রমণ ও নর-শোণিত পাতের জন্য হিন্দুরাজগণকেই অধিকতর অপরাধী বলিতে হয়। যে মুসলমান শাস্ত্র অগ্রে কাহাকেও আক্রমণ করিতে নিষেধ করে, যে মুসলমানগণের সাম্য ও মৈত্রী এবং ধর্ম্মের উদারতা গুণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান, যে মুসলমান বীর পুরুষগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে যাইয়াও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিয়াছেন;—"তুমি অগ্রে আমাকে তিনবার আঘাত কর; তারপর আমি প্রতিঘাত করিব", সেই মুসলমান জাতি কি নিষ্ঠুর? যে মুসলমান রাজ্যে সর্ব্বজাতিকেই আপন ধর্ম্ম পালন করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, সেই জাতিই কি ধর্ম্মের জন্য নর-শোণিত পাত করিয়াছে? দোষগুণ লইয়া সংসার; কিন্তু চিরদিন শুধু আমাদের দোষান্বেষণই করিতে হইবে, ইহাত ভাল কথা নয়। যাহা হউক আমরা আশা করি, অতঃপর কেশববাবু একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া লেখনী পরিচালনা করিবেন। এরূপ মুসলমান বিদ্বেষ যেন তাঁহার লেখনী হইতে আর বাহির না হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ যাহাতে প্রশস্ত হয়, এখন সকলের তাহাই করা কর্ত্তব্য।

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

বিসর্জ্জন।

(৬)

হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় বাসনার বোঝা লইয়া হেম এখন তাহার দিনগুলি কাটাইতেছেন। যে দিনের বিমল প্রদোষে তাহার চিত্ত শূন্যদেহ রাখিয়া উড়িয়া গিয়াছে, আশার উন্মেষ স্ফূর্ত্তি সে মুহূর্ত্ত হইতেই তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যতায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার সলজ্জ বাসনা সে সময়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই হেম উপযুক্ত সময় হারাইয়া এখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে বসিয়াছেন। হেম উপযুক্ত সময়ে যদি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতেন, তবে রোগ তাহার পক্ষে এত মারাত্মক হইত কি না সন্দেহ।

সরযূ যতদিন তাহার মাতুলালয়ে ছিল, হেম সে পথ অবলম্বন করেন নাই। করিলে হেম দেখিতেন সরযূও তাহার জন্য হৃদয়ের অনন্তআবেগরাশী পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার উদ্দেশে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কিন্তু হেম তখন অদৃশ্য। হৃদয়ের দারুণ লজ্জাস্কর আবেগগুলি লুকাইতে না পারিয়াই তিনি তখন অদৃশ্য ছিলেন। তারপর যখন দেখিলেন, সে দুর্দ্দমনীয় আবেগের ঘাত প্রতিঘাত তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তখন সেই প্রেম-প্রতিমার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সরযূ তখন গ্রাম ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

হেম কত দেখিলেন কিছুতেই সেই লোকললামভূতা হৈম প্রতিমার দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না। তাই নিরাশার কঠোর দংশন সহ্য করিতে লাগিলেন।

হেম বাড়ীতে আসিয়া আসিয়া কতদিন রায়দের বাগান বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, কত সন্ধান লইয়াছেন, কত কথা কত জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহার সেই হৃদয়ানন্দকর উত্তরটি প্রদান করিয়া চির-কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না। তাই হেম সেই প্রতিহত নিষ্ফল জীবন লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সে জীবন তাহার নিকট অত্যন্ত ভারবহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হেম পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরীক্ষার হিসাব রক্ষার্থ কলেজে যান মাত্র। যখন তখন পুস্তক খুলিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে থাকেন। আকাশ-কুসুম কল্পনাই এখন তাহার প্রিয় সহচরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজও তিনি বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি নলিনীর। ভাবী শ্বশুর বাটী হইতে লিখিয়াছেন। নলিনী সহোদরের নিকট অনেক কথা লিখিয়াছেন। হেম তাহার কিছুই পড়িতে পারিলেন না। প্রথম গুটিকত লাইন পড়িয়াই হতাশ হইয়া পড়িলেন। "বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, আমার যিনি পত্নী হইবেন, তাহাকে আমি ইতঃপূর্ব্বে একদিন দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ, সে একদিন বসন্তের সন্ধ্যায়, রায়দের বাগান বাটীর পুকুরে। তাহার নাম সরযূ! এ বিবাহে তুমি সুখী হইবে সন্দেহ নাই * * *।" হেম ধৈর্য্য রক্ষার বৃথা প্রয়াস পাইলেন।

হেম সেই রাত্রেই মধুপুর চলিয়া গেলেন।

(৭)

নির্দ্দিষ্ট দিনে নলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। হেম বিবাহে উপস্থিত হন নাই। অভিন্ন-হৃদয় নলিনী হেমের এ অসঙ্গত ব্যবহারে দ্বেষপরতন্ত্র হইলেন না, বরং হেমের শারীরিক অসুস্থতার বৃদ্ধি অনুমান করিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন।

পরদিন হেমের নিকট হইতে চিঠী পঁহুছিল। মধুপুর হইতে হেম লিখিয়াছেন "আমার মস্তিষ্কের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশে মধুপুর আসিয়াছি। বিবাহে উপস্থিত হইবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তুমি আমার মন জান তাই শারীরিক গ্লানি বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিবাহের আমোদে যোগদানে বিরত রহিলাম।" নলিনী ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন।

সুখের বাসর কাটিয়া "মধুযামিনী" কাটিতে লাগিল। সেই মধু যামিনীর এক গভীর নিশীথে নলিনী সরযূর পীযূষ পূরিত অধর চুম্বন করিতে করিতে সাহ্লাদে বলিলেন "সরযূ, তোমরা আমার কি অপবাদ শুনিয়াছিলে?" সরযূ লজ্জায় নলিনীর বক্ষস্থলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। বলিল "সে কথা আমি বলিব না।" নলিনী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "কেন সরযূ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি!" সরযূ চঞ্চল চিত্তে বলিল "সে কথা বলিতে আমার লজ্জা করে—শুনিলে তুমি রাগ করিবে।" "এমন কি কথা সরযূ যাহা আমার নিকট বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হয়? এবং সে কথার জন্য বা আমি রাগই করিব কেন?" নলিনী অবশ হৃদয়ে কথাগুলি বলিয়া প্রেম-আলিঙ্গিত অভিমানী বাহু সরযূর দেহলতা হইতে তুলিয়া লইলেন, সরযূ চঞ্চল চিত্তে নলিনীর বাহু ধরিলেন। "রাগ করিও না। আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি," বলিয়া আকুল নয়নে নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে আরও টানিয়া বক্ষে চাপিয়া

ধরিলেন। নলিনীর সে ক্ষণিক অভিমান জল হইয়া গেল। প্রেমের এমনি মাহাত্ম্য! সে অলস চাহনির এমনি গুণ!

নলিনী বলিলেন "তবে বল।"

সরযূ সলজ্জভাবে বলিল "তোমাকে আমি দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে কি?"

"পড়ে বই কি! আমি হেম উভয়েই তোমাকে দেখিয়াছিলাম।"

"তাঁহার কথা আমি পরে শুনিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমি এক দেবতা জ্ঞানেই ধ্যান করিয়াছিলাম। ধ্যান করিয়াছিলাম—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—জীবনে যদি উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ না পাই, আজীবন এ কঠোর ব্রতে ব্রতী থাকিব।"

নলিনী সরযূকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিলেন। সরযূ উৎসাহ ও আবেশে বলিতে লাগিল—

"প্রতিদিন আসিয়া তোমার প্রতীক্ষায় রায়দের বাঁধা ঘাটলায় বসিয়া থাকিতাম। কত লোক আসিত, কত লোক যাইত, কিন্তু তোমাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তারপর একদিন যামিনী দিদির নিকট ধরা পড়িলাম। বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে হইল। তাঁহারই উদ্যোগে এবং যত্নে আজ তোমাকে লাভ করিয়াছি।" কথা শেষ করিয়া সরযূ উৎসুক নেত্রে নলিনীর দিকে তাকাইয়া রহিল। নলিনী বলিল "তা বেশ্।" এ কথাও আমি শুনিতাম, কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কি উত্তর সরযূ? "আমার সম্বন্ধে কি শুনিয়াছিলে?"

সরযূ বলিতে লাগিল "তোমার কোন অপবাদ আমি শুনি নাই। বাবা যে তোমাদের নিকট চিঠী লিখিয়াছিলেন তাহাও আমি তখন জানিতে পারি নাই। সে সকলই যামিনী দিদির কাণ্ড। আমি তাঁহার নিকট তোমার কথা আমার হৃদয়ের ভাব, প্রতিজ্ঞা সকলই বলিয়াছিলাম। তদনুযায়ী যামিনী দিদি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থার বলেই তোমাকে লাভ করিয়াছি।"

নলিনী—"যামিনী দিদি কে? তুমি তাহাদের বাড়ীতেই বা থাকিতে কেন?"

সরযূ—"রায়দের পাড়ার হরদেব রায়ের কন্যা যামিনী। হরদেব রায় আমার মামার বন্ধু। মামা বর্ত্তমান নাই। মা হরদেবকেই দাদা বলিয়া ডাকেন। বাবা ও মা পশ্চিম যাওয়ার কালে আমাকে কয়েক দিবসের জন্য তাঁহার বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র।"

নলিনী বলিলেন "তোমরা আমার কোন অপবাদ শুনিলে না, তবে আমাকে তোমাদের বাড়ী নিলে কেন ?"

"তা দেখ্‌বে—দেখ তবে।" বলিয়া সরযূ শয্যা ত্যাগ করিল। তারপর স্বীয় অঞ্চলাবদ্ধ চাবিগুচ্ছ হইতে চাবি লইয়া Trunk হইতে দু'খানা চিঠী খুলিয়া নলিনীর হস্তে সমর্পণ করিল। নলিনী আগ্রহের সহিত চিঠীগুলি পড়িতে লাগিলেন।

প্রথমখানা সরযূর মা'র নামে লিখা একখানা বেনামী চিঠী।

চিঠী এইরূপ :—

রাজিবপুর।

১১ই ফাল্গুন সোমবার।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার একমাত্র কন্যা সরযূর জন্য আপনারা যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া এমন পাত্রে জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে সমর্পণ করা সাগরে রত্ন বিসর্জ্জন ব্যতীত কি বলিব ? পাত্র আমাদের স্বগ্রামবাসী, চিরকাল তাহার সহিত বসত বাস করিতেছি।

পিতার কঠিন হৃদয়ের ন্যায় জননীর কোমল হৃদয়ও যদি অর্থের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হয় তবে বালিকার দুর্ব্বল হৃদয় কোথায় জুড়াইবে ?

একান্তই যদি প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন, নিজ দোষ বালিকার ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিবেন। নতুবা চিরকাল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইতি—

হিতাকাঙ্ক্ষী

শ্রী—

দ্বিতীয় পত্র সরযূর নামে তাহা এইরূপ :—

রাজিবপুর।

পোঃ নৈহাটী।

প্রিয় ভগিনি !

গত কল্য নলিনীবাবু বাড়ী আসিয়াছেন। আমার সহিত তাহার পরিচয় নাই। লোকমুখে শুনিলাম বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। অদ্য বাবার নিকটও শুনিলাম কথা ঠিক। এই কি সেই ? যদি তাই না হ'বে তবে তোমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলিবে কেন ? আমার ভ্রম মাপ করিও। এ তোমার সেই বসন্ত-

সন্ধ্যা-সমীর-আন্দোলিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালনকারী দেব মূর্ত্তি বলিয়া আমার ইতঃপূর্ব্বেই ধারণা হইয়াছিল। তুমি যে রাত্রে দুটি চিত্রের এক অনুরূপ বলিয়া আমার নিকট বর্ণন করিয়াছিলে এবং তোমার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া একটি চিত্রই মনে ধারণা করিয়াছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বুঝি বুঝিয়াও ছিলাম হেম নলিনীর যুগল মূর্ত্তি তোমার হৃদয় কন্দরে আদৃত। আমি বুঝিয়াছিলাম দুটির কোন একটিকে পাইলেই তুমি সুখী হও। তাই অবস্থার প্রতি তাকাইয়া নলিনীর সহিতই তোমার বিবাহের প্রস্তাব চালাই। বাবা এ বিবাহে ঘটক তা' তুমি জান।

তারপর যখন সব ঠিক হইয়া গেল, তখন তোমার মত প্রকাশ হইল, তুমি বিবাহ করিতে নারাজ। আমি প্রথমে তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। সে আমার নিজ ক্রটি।

আমার 'সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' স্মরণ হইল। বুঝিলাম নলিনীকে তোমার একবার দেখা আবশ্যক। যদি আমার কল্পনাই ঠিক হয়, তবে তোমাদের উভয়ের সম্মিলনে সুফল প্রসব করিবে সন্দেহ নাই। তদ্বিপরীতে প্রস্তাব উড়িয়া যাওয়াই সঙ্গত। তাই উভয় দিক রক্ষার উদ্দেশ্যে গত ১১ই তারিখ তোমার মার নামে এক বেনামী চিঠী পাঠাইয়াছিলাম। চিঠীর উদ্দেশ্য সফল হইল। দেখিলাম আমি ঠিক।

বাবা তোমার বিবাহে যাইবেন। এখানে আসিয়া আমাদিগকে গরীব বলিয়া ভুলিও না। আমি ভাল, ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—
২৫ ফাল্গুন।

তোমার হতভাগিনী
যামিনী।

নলিনী দুই তিনবার করিয়া পত্রগুলি পড়িলেন। যামিনীর কত প্রশংসা করিলেন ; শুনিয়া সরযূ সুখী হইল।

এইরূপে যুবক যুবতীর প্রেমালাপে সে রজনী প্রভাত হইতে চলিল। উষার স্নিগ্ধ করস্পর্শে নব দম্পতী নিদ্রাদেবীর শান্তিময়ী ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

(৮)

হেমের অনন্ত আশা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। প্রেমের কুহক, সুখের আশ্বাস, সৌন্দর্য্যের মরীচিকা ফুৎকারে সকলই যখন তিরোহিত হইল, তখন

হেম ভাবিলেন "এ প্রতিহত জীবনের প্রয়োজন? এ আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমে কেন পড়িয়া থাকিব?"

প্রয়োজন নাইবা থাকুক, জীবন যায় কেমন করিয়া?

এখন হেম মনে করিতেছেন, যদি তিনি তাহার মানসিক ভাব নলিনীকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতে দিতেন, তবে হয়ত তাঁহাকে আজ নিরাশার এ তীব্র দাহন সহ্য করিতে হইত না। নলিনী অবশ্য প্রাণপণে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর উদ্দেশ করিতে পারিত।

হেম জানিতেন, হেমের জন্য নলিনী তাহার শত স্বার্থ বলিদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই হেম, নলিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা জীবনের নিষ্প্রয়োজনতাই সমধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছেন।

হেম অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও যখন দেখিলেন সে পাপ বাসনা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তখন তিনি সেই ক্ষুদ্রাধিকারে উৎকট ঔষধী প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন।

হেম অবিচলিত চিত্তে বুঝিয়া ফেলিলেন, হেম নলিনী দু'য়ে জগতের একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এ জগৎ হইতে এক জনের অবশ্যই বিদায় লইতে হইবে।

এ নৃশংস কথা হেমের বিকার প্রাপ্ত হৃদয়ে সহসা জাগরিত করিয়া দিতে সে সময়ে তাহার আরও কতকগুলি সহায় অবলম্বন জুটিয়াছিল। হেম মধুপুরের শৈল শেখরে চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত করিতে যাইয়া ফটীক-জলের সাহায্য লইয়াছিলেন। তাই অবলীলা ক্রমে এ পাশবিক প্রবৃত্তি উদ্বেলিত হইয়া তাহার মনুষ্যত্ব ভাসাইয়া দিল।

মদিরার অনন্ত প্রভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমি কিসের জন্য এ জীবন ত্যাগ করিব? নলিনী আমার পথের কণ্টক, তাহাকে সরাইলেই ত সে রত্ন আমার হস্তগত হইবে। আমি যে নলিনী নই তা' কে জানিবে? মা? টাকা হইলে কাহাকে না বশ করা যায়? বিশেষ আমার মা কি আমার বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিবেন? তাঁহার হেম ত রহিলই, বিশেষ হেম নলিনী এক হইল। তারপর খুড়ি মা? তাঁহার পক্ষে নলিনীও যা আমিও তা'। পোষ্য পুত্রের আবার একটা ইতর বিশেষ কি? বিশেষ আমি ত পোষ্য বলিয়াই পরিচিত থাকিব। তারপর সরযূ? সে বালিকা কি বুঝিবে? এই ক'দিনে আর সে নলিনীকে এমন কি বিশেষভাবে চিনিয়াছে? হয়ত বালিকা

ছুটি চক্ষু চাহিয়াও নলিনীকে একবার দেখে নাই। নয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ কয়েকদিন পরেই হইবে।

হেম উৎসাহে বিকট হাস্য করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তারপর এক পাত্র, তারপর আর এক পাত্র উদরস্থ করিয়া বংশ নাশের অমোঘ অস্ত্র নির্ম্মাণে কৃত সংকল্প হইলেন। সব ঠিক হইয়া গেল।

নলিনীকে শীঘ্র মধুপুর আসিতে টেলিগ্রাম দেওয়া হইল। টেলিগ্রামে লেখা হইল—"হেম সাংঘাতিকরূপে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, অনতিবিলম্বে পঁহুছিবে।"

মন্ত্রণা ঠিক হইয়া রহিল। কি ঠিক হইল? সে পাশবিক কল্পনা হৃদয়ে স্থান পায় না। প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

রূপ তুই মোহের জন্যই বটে! কিন্তু এই কি সেই মোহ? যদি তাই হয়, সরযূ! এ রূপ লইয়া দড়ি কলসী সংযোগে সে নীল জলেই তাহার অবসান করিলে না কেন? নিরাপরাধ নলিনী এ রূপের আঁচড়ে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে কেন?

(৯)

নলিনী নব প্রণয়িণীর প্রেম প্রস্রবণে সুখে সন্তরণ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ যাইয়া হেমের সে ভীষণ টেলিগ্রাম তাহার সে সুখস্পৃহা ভাঙ্গিয়া দিল। আকুল প্রাণে নলিনী মধুপুরে ছুটিলেন।

যথা সময়ে মধুপুরে আসিয়া ট্রেণ থামিল। নলিনী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া হেমের ভাড়াটিয়া বাড়ী বাহির করিলেন। বাড়ী বাহির করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। দরজার তালা বাহির হইতে বন্ধ।

নলিনীর মনে অনন্ত আশঙ্কা। দরজা বন্ধ দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চক্ষু হইতে অবিরল ধারে জল পড়িতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে কাহাকেও ডাকিতে প্যরিতেছেন না। বুঝিলেন ভাই তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে। আজ ভাই ব্যতীত নলিনীর এ মৌন আশঙ্কার কারণ নির্দ্দেশ অন্যের পক্ষে সুকঠিন।

"ভাই তাহার ইহ জগতে নাই" একথা তাহার হৃদয়ে স্থান দিতে তিনি কোন প্রতিবন্ধক দেখিলেন না। তাই নলিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

সেই দারুণ ভ্রাতৃশোক-বিহ্বল হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহের শান্তি ভঙ্গ করিল।

ধীরে ধীরে একটি যুবক সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। নলিনী রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় বলিতে পারেন এ বাড়ীর লোক কোথায় ?"

যুবক সহসা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন "আপনি কা'কে চাচ্ছেন ?"

নলিনী—"হেমনাথ রায়।"

যুবক—"আমার সঙ্গে আসুন।"

নলিনীর ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি লজ্জিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে মৌন হৃদয়ে তিনি যে আশঙ্কা জপিতে ছিলেন, সহসা এ যুবকের কথায় তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার আশা হইল তিনি হেমকে দেখিতে পাইবেন, হেম তাঁহাকে দেখিয়া কত সুখী হইবে।

যুবক নলিনীকে লইয়া আপন প্রকোষ্ঠে যাইয়া বসিলেন। নলিনী বলিলেন—"হেম কোথায় ?"

যুবক ম্লান মুখে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তার কে হন ?"

নলিনী শিহরিয়া উঠিলেন। যুবকের কথার ভাবে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। নলিনী হতাশে যুবকের পা দু'খানি ধরিয়া ফেলিলেন। যুবক নলিনীকে শক্ত করিয়া ধরিলেন। তার পর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "গত কল্য তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন !"

নলিনী যুবকের কঠিন বাহুবেষ্টনের মধ্যে সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িলেন।

*　　*　　*　　*

নলিনী বাড়ী পঁহুছিয়া হেমের চিঠি পাইলেন। সে চিঠি হেম মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাকে দিয়াছিলেন। নলিনী তাহা খুলিয়া পড়িলেন—

মধুপুর।
১৭ই চৈত্র।

ভাই নলিনি,

আমি কেন আত্মহত্যা করিলাম ? ইহা তুমি ভাবিয়া পাইবেনা নিশ্চয়। একদিন একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গ হৃদয়ের এক কোণে অতি অলক্ষিতে পড়িয়াছিল তাহা তুমি জান। তখন বুঝিতে পারিয়া ছিলাম না যে, কালে সে স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড দাবানল রূপে আমার সমস্ত হৃদয় ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইবে ; এবং সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে এ অমূল্য জীবন আহুতি প্রদান করিতে হইবে।

সরযুর প্রথম দৃষ্টি যেদিন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল, সে দিন বুঝিয়া ছিলাম না যে, সে ক্ষুদ্র রোগের জন্য এ কঠিন ব্যবস্থা আমার করিতে

হইবে। লজ্জায় তখন সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। তুমি তাহা জানিতে চাহিতে, আমি "ও কিছু নয়" বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। তখনও আমার এ অধঃপতনের কোন কারণ ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সরযুর জন্য আমি অনেক করিয়াছি তাহা তুমি জান। সে সব যাক্।

তোমার পত্র পাইয়া আমি সরযুকে ভুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অনল তখন প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-ভাস্কর তেজে প্রজ্বলিত। তাই সুদূর মধুপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। সরযূ তোমার হইল।

তার পর আমি পাষণ্ড, ক্ষমা করিও, নির্জ্জন মধুপুরে আসিয়া প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখিয়াও তাহা ভুলিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, কুৎসিত সুরার আশ্রয় লইয়া মন পরিবর্ত্তনের সুবিধা দেখিব, কার্য্যত তাহাই করিলাম। সকলই বৃথা হইল। তখন সুরার প্রসাদে মনে করিলাম এ সংসারে হেমনলিনী দু'য়ের স্থান নাই। একজনকে অবশ্যই অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্রণা ঠিক হইল। তোমার নিকট মিথ্যা টেলিগ্রাম করিলাম। তুমি আসিলেই * * * *

ভাই, পর দিন মদিরার ঝোঁক ছুটিল। বুঝিলাম যেখানেই যাই আমার এ প্রতিহত নিস্ফল জীবনের কোন মূল্য নাই। পাপে নিমগ্ন হইয়াছি, চরিত্র স্খলিত হইয়াছে। যদি বাঁচিয়া থাকি, আজীবন বিবেকের অসহ্য দংশন ভোগ করিতে হইবে। তাই এ অসহ্য জীবনভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি মহাপাপী আমাকে ক্ষমা করিও। ইতি"—

কম্পিত হস্তে নলিনী সে লিপি অগ্নিমুখে প্রদান করিলেন। দাউ দাউ করিয়া অনল তাহা গ্রাস করিল। হেমের শেষ স্মৃতি ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

সমাপ্ত।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

উচ্ছ্বাস।

[পূর্ব্বানুবৃত্ত।]

(১০১)

সুখ্যাতি কি কুখ্যাতির কেহ নাহি জানিত সুধারা ;
উৎসব কি শোক দুঃখ বর্ণনায় ছিল শক্তিহারা !
শিক্ষা, ধর্ম্ম, শাসন কি দণ্ড নীতি সুপরিচালনে
ছিল সবে অনভিজ্ঞ ; কেহ নাহি কারো কথা মানে !
বিশ্বজয়ী বক্তৃতা কি লেখনীর শকতি-রতন
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গুপ্ত ছিল মণির মতন !
আরবীর প্রসাদাৎ বাক্‌শক্তি লভিল সকলে,
বক্তৃতা, লেখনী পুনঃ প্রাণ পেল এ মহী মণ্ডলে !

(১০২)

ইউনানী হেকিমী-শাস্ত্র প্রচারিল আরব-তনয়,—
যার গুণে উপকৃত জগতের প্রতি সম্প্রদায়।
শুধু কি পূরব রাজ্যে তাহাদের ছিল খ্যাতি মান ?
পাশ্চাত্যেও যশঃরবি দীপ্ত তেজে ছিল শোভমান।
সালরমুঁতে * ছিলা যেই মহাবিজ্ঞ ভিষক্ প্রবর,
পশ্চিমে আরবী তাঁরি গন্ধদ্রব্য নিত নিরন্তর!

(১০৩)

কোথায় ভিষক্-বর খ্যাতনামা হোসেন এব্নে-ছানা, †
কোথা আবুবকর্ রাজি কীর্ত্তিমান বিদিত-সংসার, ‡

---

* হমবরলট্ সাহেব বলেন,—ইহা ইটালীর একটি বিখ্যাত নগর। এই স্থানে মুসলমানগণের একটি প্রধান মাদ্রাসা ছিল এবং তাহাতে যথাবিহিত হেকিমী শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। সমগ্র ইউরোপ হইতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই স্থানে হেকিমী শিক্ষার জন্য আগমন করিত।

† ইঁহার সংগৃহীত আইন কত শত বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের মাদ্রাসা সমূহে পাঠ্য ছিল। ইনি নানা বিষয়ে ৪০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ৪৪৮ হিজরীতে ৫৮ বৎসর বয়সে হামদান নগরে দেহত্যাগ করেন।

‡ ইঁহার প্রণীত ১১৩ খানা গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই হেকিমী বিষয়ে লিখিত। প্রথমে

কোথা কুশাগ্রধী সুধী হোনায়ন এব্‌নে-এস্‌হাক, *
কোথা আলী-বেন্‌-ইসা †, তত্ত্বদর্শী জিয়াবেল বেতার ‡ ?
পূর্ব্বদেশে ইঁহাদেরি গৌরবের জয়গান ছিল ;
পশ্চিমেও কত তরী অবহেলে সিন্ধু তরে' গেল !

(১০৪)

অধ্যাত্ম-সাধনা কিম্বা সত্যদীপ্ত একত্ব-নিশান,
আলজেব্রা, হেকিমী আর সুকঠিন গণিত বিজ্ঞান,
জ্যামিতি, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, বাণিজ্য, ভ্রমণ,
কিম্বা রাজ্য, প্রজাকুল পুত্রসম শাসন-পালন,—
যেখানে দেখিছ হেন শুভঙ্কর ফলপ্রদ স্মৃতি,
ভাবিও হয়েছে সেথা ধর্ম্মপ্রাণ আরবীর গতি !

(১০৫)

দলিত মথিত বটে আরবের সেই ফুলবন,
সংসার করিছে তবু তাহাদের গুণের কীর্ত্তন । §
আরবের বারিধারা সঞ্জীবিত করিল ভুবন ;
কৃতজ্ঞ রহিবে বিশ্ব তাহাদের গুণে আজীবন।
যে সকল জাতি আজি হেরিতেছ জগতের নেতা,
মুক্তকণ্ঠে স্বীকারিবে আরবের লোক-হিতৈষিতা ! (ক্রমশঃ।)

রয় প্রদেশে ও পরে বোগ্দাদ নগরে বহুদিন যাবৎ চিকিৎসা করিয়া শেষে অন্ধ হন এবং ৭০২ হিজরীতে লোকান্তর গমন করেন।

* ইনি একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত হেকিম। ইনি খোলাফায় আব্বাসিয়ার দ্বারা প্রতিপালিত এবং খলিফা মতওয়াক্কেলের সময়ে নকলনবীশের কার্য্য করিতেন। নিবাস—এরাকে আরব। সুতরাং ইঁহাকেও মুসলমান হেকিমগণের মধ্যে গণনা করা হয়।

† ইনি একজন বিখ্যাত মুসলমান হেকিম ছিলেন।

‡ ইনি স্পেনের অধিবাসী। দ্রব্যগুণ ও পদার্থ বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দ্রব্যের গুণ পরীক্ষার্থে ইনি বহু দূরদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বহুল গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মিশরের তাবৎ হেকিম ইঁহাকে আপনাদের আদর্শ অগ্রণী বিবেচনা করেন। তিনি ৬৪৬ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

§ ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এড্‌ওয়ার্ড গিন, হেনরি লুইস, ডাক্তার হিলি, সিড্‌লু, ফ্রান্সিস্‌, আলেকজেণ্ডার হেমলট্‌ প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির আদি কারণ আরব হইতেই সমুদ্ভূত।